চেতনার অন্বেষণে

বিশেষ আইনি সংখ্যা, মার্চ ২০২২

গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ভীতি

কর্নাটকে চালু হল কুসংস্কার বিরোধী আইন

যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্মনিরপেক্ষতা

প্রকাশ্যে ধর্মাচরণের বিতর্ক উঠল বিধানসভায়

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের মাসিক পত্রিকা **'চেতনার অন্বেষণে'** আইনি সংখ্যা, মার্চ ২০২২।

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদকমন্ডলী- **যুক্তিবাদীরা**।

যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

মূল্য- নাই
ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

'চেতনার অন্বেষণে'

একটি মুক্তচিন্তক পত্রিকা।

বিশেষ আইনি সংখ্যা

পড়ুন ও পড়ান

সূচি-

“Constitution is not a mere lawyers document, it is a vehicle of Life, and its spirit is always the spirit of Age.”

- Dr B.R. Ambedkar





সম্পাদকীয়

২৩-মার্চ 'আন্তর্জাতিক নাস্তিকতা দিবস' পালিত হল। সমস্ত মুক্তচিন্তক বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাই। এবারের সংখ্যাটিতে আমরা আইনি সেই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করেছি যা মুক্তচিন্তক তো বটেই প্রতিটি মানুষের জানা একান্ত কর্তব্য। সংখ্যাটিকে বিশিষ্টজনেরা সমৃদ্ধ করেছেন, মতামত দিয়েছেন। পত্রিকাটি প্রকাশ করতে সপ্তাহ দুয়েক দেরি হয়ে গেলো। আইনি সংখ্যাটি কেমন লাগল অবশ্যই জানাবেন। মতামতগুলি পরের সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। আর একটা কথা, সবাই লেখাপত্র পাঠান। আরও পড়ুন এবং পড়ান।

"নাস্তিক হওয়া সহজ নয়। এ এক অনন্য শক্তিধর অভিব্যক্তি। কেননা বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনোবল না থাকলে নাস্তিক হওয়া যায় না। আশৈশব লালিত বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচারন, রীতিণীতি পরিহার করা সাধারনের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল আসামান্য নৈতিক শক্তিধর যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই তা সহজ।"

- আহমদ শরীফ

গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ভীতি

- পৃথ্বীশ ঘোষ

গ্রেপ্তার কথাটা শুনলেই কেমন যেন বুকের ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে যায় তাই না। যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বিলক্ষণ জানেন। সেটা যদি হয় আবার মাঝরাতে ভুক্তভোগী মাত্রই এর স্বাদ বুঝেছেন। ধরুন আপনি সামাজিক মাধ্যমে কিছু লিখলেন যার সূত্র ধরে রাতে আপনাকে পুলিশ তুলতে এল তখন অসহায় হয়ে সাহায্য প্রার্থনা ছাড়া কি বা করার আছে বলুন। আমরা অনেকেই আইনের মারপ্যাচ বুঝি না। যেহেতু আমরা আইন বিরুদ্ধ কাজ করি না তাই আইন বোঝার চেষ্টাও করি না। তবুও আমাদের অনেক সময় নানান চক্রান্তে পুলিশি হেনস্থার শিকার হতে হয়। সাধারণত আমরা জানি পুলিশ সন্দেহের বসে যেকোনও মানুষকে গ্রেফতার করে থানার লকআপে তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে পারে এবং করেও থাকে। কিন্তু বাস্তবটা অন্যরকম। পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে না 41CRPC নোটিশ না দিয়ে।

আমি নিজে ভুক্তভোগী আমাকেও এরকম তুলে নিয়ে গিয়ে পোস্ট ডিলিট করার জন্য চাপ দিয়েছিল আমার লোকাল থানার পুলিশ। রাজনীতি না করা স্বত্তেও একটা স্ট্রং রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করি। তাই কিছু শত্রু সবসময় সমস্যা তৈরি করে গেছে তাদেরই কেউ উস্কে ছিল আমি নাকি ফেসবুকে দাঙ্গা ছড়াচ্ছি। আদতে ছিল দাঙ্গা রোধ করা নিয়ে পোস্ট একটু খুঁটিয়ে পড়লেই ব্যাটারা বুঝতে পারত। মূল বিষয়ে আসি যদি আপনার সঙ্গে বা পরিচিত কারুর সঙ্গে এরকম কিছু হলে কি করবেন দেখেনিন চট করে।

হঠাৎ গ্রেফতার হলে করণীয়:

অনেক রাত! হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খোলার সাথে সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে সাদা পোশাকে অথবা পোশাকে (সিভিক ও হতে পারে) একদল লোক আপনাকে বা আপনার পরিবারের কাউকে গ্রেফতার করে তাদের হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে-

কে গ্রেফতার করতে পারে?

একমাত্র পুলিশ অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা যার হাতে গ্রেফতার করার ওয়ারেন্ট আছে।

ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতার:

কোনও সাধারণ ব্যক্তিকে পুলিশ একমাত্র তখনই গ্রেফতার করতে পারে যখন সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিটি কোনও জামিন অযোগ্য অপরাধ করে থাকে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট (এক্সিকিউটিভ অথবা জুডিশিয়াল) কোন এরেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়াই কাউকে গ্রেফতার করতে পারেন। কোনও অপরাধী সজ্ঞানে কোন অপরাধ করলে এরেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়াই অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারে।

বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিনা ওয়ারেন্টে কাউকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। তবে, ওয়ারেন্ট বা বিনা ওয়ারেন্টে, কাউকে গ্রেপ্তার করতে গেলে অভিযুক্তকে অবশ্যই অ্যারেস্ট মেমো দিতে হবে। সেই অ্যারেস্ট মেমোতে দুই নিরপেক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক মানসিক ভারসাম্যযুক্ত নাগরিকের সই থাকতে হবে। অভিযুক্তকে বা যাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তাকে যে অ্যারেস্ট মেমো দেওয়া হচ্ছে তাতে কী কারণের জন্য গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তার কারণ ও ভারতীয় আইনের ধারা বা সেকশন অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তার মেডিকেল চেকআপ করাতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতারের পর পুলিশি জেরায় সময় চুপ থাকতে পারে। এই আইনি অধিকার তার আছে Section 20(3) পুলিশ সরকারি কাজের প্রয়োজনে বা কোন কিছু অনুসন্ধানে যে কোন ব্যক্তিকে থানায় ডেকে পাঠাতেই পারে। তবে ডেকে পাঠানোর ক্ষেত্রে যাকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে তাকে লিখিত কল মেমো দিতে হবে পুলিশকে, সেখানে ডেকে পাঠানোর কারণ লিখতে হবে বিশদ বিবরণ সহ। কল মেমো বা কোন উপযুক্ত কারন ছাড়াই যদি মাঝরাতে ডাকতে আসে আপনি যেতে বাধ্য নন। পরদিন সকালে অবশ্যই থানায় খোঁজ নেবেন।

কীভাবে গ্রেফতার করা হয়?

পুলিশ যদি কোনও অপরাধীকে ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে গ্রেফতার করতে আসে তাহলে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতে হট করে হাতকড়া পড়াতে পারবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অনুমতি নিতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি গ্রেফতারের সময় কোনো সহযোগিতা না করে তাহলে পুলিশ যেন-তেন প্রকারেণ সেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারে।

এমন পরিস্থিতির শিকার হলে করনীয়:

একজন নাগরিক হিসেবে প্রথমেই আপনার জানার অধিকার রয়েছে কেন, কী কারণে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তাই প্রথমেই জানতে চাইতে হবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগটি কী? আর তাদের সাথে গ্রেফতার সংক্রান্ত কোনো পরোয়ানা আছে কি না? মনে রাখবেন গ্রেফতারের কারন জানাতে আর প্রয়োজনে পরোয়ানা (যদি থাকে) দেখাতে পুলিশ বাধ্য। যদি তারা আপনাকে পরোয়ানা দেখাতে সক্ষম না হয় তাহলে বুঝতে হবে তারা আপনাকে বিনা পরোয়ানায় আটক করতে আসছে (ধারা ৫৪)। এই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে তাদের পরিচয় জানতে চাইবেন এবং তাদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইবেন।কোনও অভিযুক্তকে তখনই গ্রেপ্তার করা হয় যখন সেই অভিযুক্ত কোন অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত এবং উক্ত ব্যক্তির বিচারে উপস্থিতি প্রয়োজন। যতক্ষণ না আদালতে অপরাধীর দোষ প্রমাণ হচ্ছে ততক্ষণ অপরাধী র প্রতি কোনো খারাপ অমানবিক ব্যবহার করা চলবে না। অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টে অফিসারের সই থাকবে দেখে নিতে হবে কোর্টের সিল ও স্ট্যাম্প ডেট। যদি এগুলি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট সঠিক নয়।একা একা কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিন। প্রয়োজনে আশপাশের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের খবর দিন এবং যত পারা যায় লোকজন জড়ো করার চেষ্টা করুন। অবশ্যই উকিলকে খবর দিন রাত হলেও।

পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে আপনি একা তাদের সঙ্গে যাবেন না বলে তাদের জানিয়ে দিন এবং পরিবারের দু-একজনকে সঙ্গে নেবেন বলে তাদের জানান। প্রয়োজনে নিকটস্থ থানায় ফোন করে আপনার গ্রেপ্তারের বিষয়টি কনফার্ম করুন কেননা আজকাল পুলিশের ড্রেস পরে আততায়ী পর্যন্ত আসে। এবং থানা এ সম্পর্কে অবগত অছে কি না, তা জানার চেষ্টা করুন।

গ্রেফতার পরবর্তী পদক্ষেপ:

গ্রেফতার পরবর্তী আপনার আপনজনের প্রথম কাজ হল আইনি সহায়তার জন্য কোনো আইনজীবীর শরণাপন্ন হওয়া।কারন একজন আইনজীবীই এই ক্ষেত্রে আপনাকে সব থেকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন।গ্রেপ্তার হলে গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চালান দেবেন। এই সময় আইনজীবী আটক কৃত ব্যক্তির পক্ষে জামিনের আবেদন করবেন।কোনো কারণে নিম্ন আদালতে জামিন না হলে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। তাই সব সময় আইনজীবীর ফোন নাম্বারটি বাড়িতে জানাবেন।

বর্তমানে সব থেকে চিন্তার বিষয় হল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে সাদা পোশাকে অপহরন এবং খুন।প্রথমেই বলে দি, সাদা পোশাকে ৫৪ ধারায় কাউকে আটক করা যাবে না। এ বিষয়ে ২০১৬ সালের ২৪ মে আপিল বিভাগ রায় দিয়েছেন এবং কিছু গাইডলাইন দিয়েছেন, যা ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে পূর্ণাঙ্গ রায় হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাই আটককারী তার পরিচয়পত্র দেখাতে অস্বীকার করলে এক্ষেত্রে আপনি আত্নরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিনামূল্যে একজন উকিলবাবুর পরামর্শ পাবার অধিকার আছে।

জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে থানাতেই জামিনের ব্যাবস্থা সুনিশ্চিত করা আপনার অধিকার।

কোন ব্যক্তি নিখোঁজ থাকলে কি করবেন:

কোন ব্যক্তি নিখোঁজ থাকলে পার্শ্ববর্তী থানায় প্রথমে খোঁজ করতে হবে। যদি কোন সংবাদ পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে উচ্চ আদালত অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগে জরুরী ভিত্তিতে রীট করতে পারে। অবৈধ আটকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ হচ্ছে "হেবিয়াস কর্পাস" রীট করা। হেবিয়াস কর্পাসের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "সশরীরে হাজির করা"।

যখনই আদালতে নিখোঁজ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আবেদন করা হয় যাকে সর্বশেষ পুলিশের হেফাজতে দেখা গেছে তখন আদালত পুলিশকে আটকৃত ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করার জন্য সমন জারি করে। এমনকি আটকাদেশ যদি অবৈধ প্রমাণিত হয় তাহলে ভিকটিমকে ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও নির্দেশ দিতে পারে উচ্চ আদালত।

সার্চ ওয়ারেন্ট:

আমরা অনেকেই কমবেশি জানি সার্চ ওয়ারেন্ট এর ব্যাপারে কিন্তু হঠাৎ করে আপনার বাড়ি, দোকান তল্লাশি বা সার্চ করতে চাইলে সেক্ষেত্রে সার্চ ওয়ারেন্ট দেখাতে হবে পুলিশকে অবশ্যই এবং যে ব্যক্তির বাড়ি, দোকান ঘর, গুদাম বা অফিস ইত্যাদি তল্লাশি বা সার্চ করা হচ্ছে, তাকে সার্চ ওয়ারেন্টের একটি কপি অবশ্যই দিতে হবে। এখানেও সিল স্ট্যাম্প ডেট সিগনেচার ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

সার্চ ওয়ারেন্টের সময়সীমা:

এখানে উল্লেখ্য যে সময়টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে কেউ সার্চ ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারে না, তা করবে আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সার্চ ওয়ারেন্ট যখন থেকে ইস্যু করা হবে সেই সময় ও দিন থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তল্লাশি অভিযান বা সার্চ অপারেশন শুরু করতে হবে পুলিশকে। ৪৮ ঘন্টা হয়ে গেলে, সেই পুরানো সার্চ ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে কোনো তল্লাশি অভিযান বা সার্চ অপারেশন করতে পারে না পুলিশ।

ডকুমেন্ট:

নথি সংগ্রহ করা একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য। গ্রেফতারের সময় আপনাকে কোন কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে, গ্রেফতারকারী অফিসারের নাম, গ্রেফতারের সময় সম্পর্কিত লিখিত মেমো পুলিশ আপনাকে দিতে বাধ্য। মামলা আদালতে যদি বিষয় গড়ায় তবে মামলার ক্ষেত্রে এটির গুরুত্ব অপরিসীম।

থানার লকআপে হেনস্থা:

আপনাকে গ্রেফতার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে যে থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে সেই থানার অন্তর্গত বিচারাধীন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে বাধ্য। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া আর একদিনও আপনাকে অতিরিক্ত আটকে রাখতে পারে না থানার লকআপে। যদি কোনও কারনে আদালতের কাজকর্ম বন্ধ থাকে বা ছুটি থাকে,তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বা বিচারকের সরকারি ঠিকানা বা বাড়িতে আপনাকে হাজির করাতে হবে।

মহিলা পুলিশ:

মহিলা পুলিশ ছাড়া কোনওভাবেই কোনও মহিলাকে গ্রেফতার বা তল্লাশী চালানো যায় না।এক্ষেত্রে আপনি মহিলা হলে অবশ্যই মহিলা পুলিশ দিয়ে আপনাকে গ্রেফতার বা তল্লাশি করাতে হবে।একজন মহিলাকে শুধুমাত্র মহিলা পুলিশই আটকাতে অথবা অ্যারেস্ট করতে পারেন, কোনো পুরুষ পুলিশ সেই কাজ করলে দণ্ডনীয় অপরাধ। CRPC ৫১(২) ধারা অনুসারে ধৃত মহিলার দেহ তল্লাশি করার অধিকারও নেই পুরুষ পুলিশের। এই কাজটি একমাত্র মহিলা পুলিশরাই করতে পারেন এবং সেটা যেন শোভনীয়তার মাত্রা না ছড়ায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে মহিলা পুলিশকে।

According to Section 46(4) of the Criminal Procedure Code, 1973 which governs the arrest of women, It is specifically mentioned that “Save in exceptional circumstances, no woman can be arrested after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the Judicial Magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made.

আইন অনুযায়ী যতক্ষণ আপনি পুলিশ লকআপে থাকবেন,ততক্ষণ পুলিশ আপনাকে কোনওপ্রকার শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার করতে পারে না। এমনকি চড় মারতেও পারে না গালাগালি তো দূরে থাক।

পুলিশ হয়রানি করলে কী করবেন?

সাধারণত সরকার বিরোধী কোনও মতামত পোষণ করলে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে না। কারণ বাক স্বাধীনতার অধিকার আমাদের সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু পুলিশ মামলা দায়ের করে অন্য ধারায়। আপনি পুলিশী হয়রানির শিকার হতে পারেন যদি আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিম্নলিখিত অপরাধ করে থাকেন। আপনি যদি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোষ্টে অশ্লীল কোনও শব্দ ব্যবহার করেন যার ফলে অন্য কোন ব্যক্তি অপমানিত হয়েছেন বলে অভিযোগ করে।

- প্রমাণ ছাড়া ভিত্তিহীন ভাবে কোনও ব্যক্তিকে অপমান বা তার অসম্মান করার চেষ্টা করলে।
- কোনও ব্যক্তির চরিত্রহনন করে অসম্মানজনক কিছু লিখে বা ছবি পোস্ট করলে।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে এইরকম কিছু পোস্ট করলে।
- ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করে এমন কিছু পোস্ট করলে।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় পর্ণগ্রাফি কিছু পোস্ট করলে আপনি গ্রেফতার হতে পারেন।

তাই এই সমস্ত বিষয়গুলি এড়িয়ে চলুন একজন দায়িত্ববান সচেতন নাগরিক হিসাবে। আপনার নির্বুদ্ধিতামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে অস্ত্র তুলে দেবেন না। অবশ্যই কোনও উকিল বন্ধু বা স্থানীয় কোন মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী এবং মিডিয়ার ফোন নাম্বার রাখুন এবং প্রয়োজনে তাদের ফোন করুন।বাড়ির লোককেও নাম্বারগুলি দিয়ে বলে রাখুন আপনাকে পুলিশ তুলে দিয়ে গেলে এই নাম্বারগুলিতে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করতে।

CPDR এর কেন্দ্রীয় অফিস
Committee for the Protection of Democratic Rights
Contact Address: Adv Suresh Rajeshwar,
4th Floor, Poddar Chambers,
S. A. Brelvi Marg, Fort,
Mumbai – 400 001
Fax: +9193224045911
Email: cpdr2014@gmail.com

এবং

NHRC / National Human Rights Commission-এর পূর্বভারতীয় শাখার Special Rapporteur:
Shri Damodar Sarangi, IPS (Retd)
(M) 9777579400, 9040079404
sprep2.nhrc@nic.in
dssarangi@yahoo.com

অথবা

Head Office:
National Human Rights Commission, Manav Adhikar Bhawan Block-C, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023
For Complaints: Tel. No. 24651330, 24663333. Fax No. 24651332

কোনও ব্যক্তি পুলিশি হয়রানির শিকার হচ্ছেন জানতে পারা মাত্র তার পাশে দাঁড়ান। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে খবরটি ছড়িয়ে দিন।

মনে রাখবেন, আপনি যদি অন্যের পাশে না দাঁড়ান তাহলে আপনার বিপদে আপনার পাশেও কেউ দাঁড়াবে না।

সূত্র-

১- https://www.ainbisharod.com/

২-আইনি পরিষেবা ও আপনার অধিকার

৩-পুলিশের কর্তব্য

ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রসঙ্গে

-শুভাশিস লাহা (সংবিধান বিশেষজ্ঞ)

ভারতীয় সংবিধান হচ্ছে পৃথিবীর সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান যা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই কার্যকরী হয়। ভারতীয় সংবিধানে মোট ২৪টি অংশে ৪৪৮টি ধারা, ১২টি তফসিল এবং ১১৩টি সংশোধনী বিদ্যমান। ভারতের সংবিধানের ইংরেজি সংস্করণে মোট শব্দসংখ্যা ১১৭,৩৬৯।

১৯৭৬ সালে ১১ নভেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট অনুমোদিত এবং ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' (কোনোরকম সংজ্ঞা ছাড়াই) শব্দদুটি যুক্ত করা হয়। এরপরে সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদে 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) শব্দটি ব্যবহার করার পরে যেখানে লেখা হয়েছে -

"We The People Of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens;"(অর্থাৎ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হল সংবিধানের মৌলিক নীতি)।

ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) বা ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) শব্দটির উৎপত্তি ইউরোপে যার অভিধানিক অর্থ হচ্ছে- "An ism does not related with religion and non-entity to any supernatural existence"। অর্থাৎ, ধর্ম এবং অলৌকিকতার সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্কিত নয় এমন একটি মতবাদ হল ধর্মনিরপেক্ষতা। অন্যদিকে, নিরপেক্ষ শব্দটির অর্থ, কোনো অথবা কারোর পক্ষেই অবস্থান নয়। ধর্মনিরপেক্ষ মানে সর্বধর্মসমন্বয়ও নয়। এর অর্থ রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পক্ষেই থাকবেনা বরং সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই থাকবে নিরপেক্ষ বা সম্পর্ক বর্জিত। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার বা রাষ্ট্র কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানও করবে না। জনগণকে ধর্ম পালনে বাধ্য করাও হবে না। সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে।

এইপ্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে- "The separation of religion and state is the foundation of secularism. It ensures religious groups don't interfere in affairs of state, and the state doesn't interfere in religious affairs."

ভারতীয় সংবিধান আমজনতাকে দিয়েছে ছয়টি (৬) মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of Indian Constitution) যার মধ্যে একটি ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার যা সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারায় উল্লেখিত রয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে-

(১) ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা:

সংবিধানের ২৫(১) নং ধারায় লেখা হয়েছে, বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা সব নাগরিকের রয়েছে। তবে জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা বা সামাজিক নীতিবোধ এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র এই অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ ছাড়া কোনো বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান কোনো ধর্মের অঙ্গ কি না তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে বলে সুপ্রিমকোর্ট ১৯৮৮ সালে হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য মামলায় রায় দেন।

২৫(২) (ক) নং ধারায় লেখা হয়েছে, ধর্মাচরণের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। তা ছাড়া সামাজিক কল্যাণসাধন ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনমতো আইন প্রণয়ন করে ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

২৫(২) (খ) নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সব হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত রাখতে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারবে। সংবিধানে হিন্দু শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতা:

সংবিধানের ২৬ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে কয়েকটি অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল-

(ক) ধর্ম বা দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ,
(খ) নিজেদের ধর্মীয় কার্যকলাপ নিজেরাই পরিচালনা করা,
(গ) স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ভোগদখল করা এবং
(ঘ) আইন অনুযায়ী নিজস্ব সম্পত্তি পরিচালনা করা।

তবে রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা রক্ষার জন্য যে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর এই অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(৩) কর আদায় সংক্রান্ত বিধিনিষেধ:

সংবিধানের ২৭ নং ধারায় লেখা হয়েছে, ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষপাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না।

(৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার বিধিনিষেধ:

সংবিধানের ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুরোপুরি সরকারি সাহায্যে পরিচালিত হয় সেখানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে না। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা আংশিকভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। সম্পূর্ণ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবশ্য ধর্মশিক্ষা নিষেধ করা হয়নি। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হলেও কোনো দাতা বা অছির উইলে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা উল্লিখিত থাকলে, সেখানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত জানাই, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। যেমন- সংবিধানের ২৮(১) ধারায় লেখা হয়েছে যে, 'No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.'অর্থাৎ, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনোরকম ধর্মীয় নির্দেশ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা যাবেনা। আবার, ২৮(২) নং ধারায় লেখা হয়েছে- 'Nothing in clause 28(1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.' ফলে কনভেন্ট স্কুল বা মিশনারি স্কুল কিংবা বৈদিক বিদ্যালয় অথবা মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এই স্ববিরোধীতা সংশোধনের বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করেন যুক্তিমনস্ক মানুষেরা।

ঋণ স্বীকার: আমাদের সংবিধান, সুভাষ সি কাশ্যপ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

হিন্দু কোড বিল কাকে বলে?

-পার্থপ্রতিম পাল

ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাদের আগ্রহ আছে, তারা নিশ্চয়ই ভারতের "হিন্দু কোড বিল" বিষয়ে পড়েছেন। ভারত স্বাধীন হবার পরে পণ্ডিত নেহেরুর কেবিনেট এই বিলের মাধ্যমে হিন্দুসমাজ সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন। বিয়ে, তালাক, নারী অধিকার, পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের মতো সংবেদনশীল বিষয় ছিলো এই বিলে। বিগত সময় ধরে চলে আসা সনাতনী কুসংস্কার, ধর্মের নামে অনাচার ও অধিকারহরণ বন্ধ করাই ছিলো এই বিলের উদ্দেশ্য। যুগোপযোগী এবং বাস্তবিক সিদ্ধান্তই ছিল এই বিলের সারকথা।

বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা পাওয়া, ইতিহাস ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ড. বি আর আম্বেদকার ওই কেবিনেটের আইনমন্ত্রী ছিলেন। তিনিই এই বিলের প্রণেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সমর্থনেই তিনি বিলটি প্রস্তুত করে সংসদে উত্থাপন করেন।

যথারীতি মৌলবাদী হিন্দুরা এর বিরোধিতায় রাস্তায় নেমে আসে। তারা বিভিন্ন শ্লোক দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, এটা হিন্দুধর্মের প্রতি সরাসরি আক্রমণ। তাই ধর্মরক্ষায় এই বিল বন্ধ করতে হবে। একজন হিন্দু হিসেবে, এই বিল বন্ধ করা ধর্মীয় দায়িত্ব। দীর্ঘদিন ধরে একে-অন্যকে-গালি-দেয়া হিন্দুবাদী সংগঠনগুলোও এই ইস্যুতে এক হয়ে যায়। তারা বলে, আমাদের ধর্ম ও সামাজিক আইন সৃষ্টিকর্তাপ্রদত্ত বেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো মানুষের এই বিষয়ে আইন করার অধিকার নেই।

ড. আম্বেদকার উত্তর দেন, হিন্দুধর্মের সাথে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা আছে ভিন্ন জনের ভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে। বিভিন্ন হিন্দুবাদীরা তাদের সুবিধামতো শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সামাজিক কুকর্মের বৈধতা দেয়। তাই একটি স্পষ্ট আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ না করলে, অনাচার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

এতে মৌলবাদীরা আরও ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে এবং তাঁর সরকারকে নাস্তিক আখ্যা দেয়। সরকার সেকুলারাইটিস রোগে আক্রান্ত বলে প্রচার করা হয়। ধর্মান্ধদের এরকম উন্মত্ততা দেখে কংগ্রেসের দুর্বল মানসিকতার লোকজন ঘাবড়ে যায়। তারাও আম্বেদকার ও নেহেরুকে বিলটি পাশ না করে ফেরত নেবার জন্য অনুরোধ করতে থাকে।

আম্বেদকার তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুও নৈতিকতার দায় থেকে সমর্থন উঠিয়ে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি ঘোষণা দেন, এই বিলটি ফেরত নিলে তিনি ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার হারাবেন। তাই কোনোভাবেই তিনি বিল ফেরত নিতে চান না, বরং পুনরায় পাশ করার চেষ্টা করতে চান।

যারা সরাসরি মৌলবাদী হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জা পেতেন, কিন্তু মনে মনে মৌলবাদী, তারা এই বিলের একটু অন্যভাবে সমালোচনা করেন। তারা বলেন, শুধু এক ধর্মের জন্য আইন বানানো কতোটুকু উচিত? একাধিক বিয়ে করা যদি হিন্দুদের জন্য নাজায়েজ হয়, তবে মুসলমানদের জন্য জায়েজ কেন? যাদের ভোটে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে আইন বানানো হলে, মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুদের জন্য আইন বানানো হচ্ছে না কেন? সরকার কি মুসলিমদের ভয় পায়?

বিল পাশ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন নেহেরু। সরকারের সময়ও শেষ হয়ে আসছিলো। এসময় আম্বেদকার নেহেরুকে আবেদন করেন যে তাঁর শরীর খারাপ হচ্ছে। তিনি বিল পাস হবার পরেই নিজেকে ডাক্তারের হাতে ছাড়তে চান, তার আগে না। নেহেরু আবার চেষ্টা করেন। আরও ভয়াবহ বিরোধিতা আসে।

বছরখানেকের মধ্যেই ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার জন্য সময় দরকার ছিলো। তাই সব দিক বিবেচনা করে, পণ্ডিত নেহেরু বিল ফেরত নেবার সিদ্ধান্ত নেন। তবে ঘোষণা দেন, কংগ্রেস যদি পুনরায় ক্ষমতায় আসে, তখন এই বিল পুনরায় উত্থাপন হবে। ওই সেশনে বিল পাশ না হওয়ায় ড. আম্বেদকার অভিমানে ইস্তফা দেন এবং চিরদিনের জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিলো সেই হিন্দু কোড বিল। এটাই মনে হচ্ছিলো জেতা-হারার ফ্যাক্টর। এটা ছিলো অনেকটা হিন্দু মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে নেহেরু আর কংগ্রেসের নৈতিক যুদ্ধ। হিন্দুবাদীরা শুধু আইনের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা নেহেরুর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী দেয় এবং নির্বাচিত হলে এই বিল চিরকালের জন্য আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এলাহাবাদের ফুলপুর আসনে নেহেরুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান সে সময়ের বিখ্যাত ধর্মনেতা প্রভুদেব ব্রহ্মচারী।

হিন্দুবাদী নেতার জনপ্রিয়তা এবং প্রতিটি বক্তৃতায় নেহেরুর হিন্দু কোড বিলের পক্ষে বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল, নেহেরুর হার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হিন্দুবাদীদের লম্ফঝম্প বেশি হলেও শেষ পর্যন্ত ভোটে জয়লাভ করেন নেহেরু। তাঁর দল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে ফিরে আসে। ফিরে এসেই তিনি পুনরায় সেই বিল তোলেন। ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৪টি আইনে ভাগ হয়ে বিলটি পাশ হয়।

অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আজ সেসব ইতিহাস। ভারত ড. আম্বেদকারকে ভারতরত্ন ঘোষণা দিয়েছে, সংবিধান নির্মাতার সম্মান দিয়েছে, দলিতের ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবাদপুরুষ আখ্যা দিয়েছে। এমনকি আজকের বিজেপিও তাঁর সংস্কারকে সম্মান দেখায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ড. আম্বেদকারকে মরতে হয়েছিলো নাস্তিক, দেশবিরোধী, ছুপা মুসলিমসহ আরও বহু গালিময় আখ্যা নিয়ে।

সমসাময়িক ইতিহাস নিয়ে রাজনীতিবিদদের শিক্ষা নেয়া দরকার। তবে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা নেয়া দরকার আমাদের সাধারণ জনগণের। মনে রাখতে হবে, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ বা অন্য যেকোনো নামে উন্মাদনা যতো বেশিই হোক, শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। উন্মাদনা দেখে ভুল পথে হাঁটলে হয়তো সাময়িক জয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পরাজয় হয়েই দেখা দেয়।

> “যারা তোমাকে দিয়ে অযৌক্তিক কিছু বিশ্বাস করায়, তারা তোমাকে দিয়ে একইসাথে মন্দ কিছুও করায়।”
>
> -ভলতেয়ার

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত কয়েকটি মৌলিক অধিকার

-বাবাই

অনেকেই, বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর কে ভারতীয় সংবিধানের জনক হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। উনি ছিলেন সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। সর্বপ্রথমে আম্বেদকর মহাশয় বেশকয়েকটি দেশের সংবিধানগ্রন্থ ও আইনি বইপত্র ভালোকরে পড়ে তারপর সেখান থেকে নির্যাস নিয়ে, দীর্ঘ আলোচনার পরে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে ২৮৪ জন সাক্ষর করলে এটি গৃহীত হয়। এই দিনটি "জাতীয় আইন দিবস" হিসেবে পরিচিত। গণপরিষদ সংবিধান রচনা করতে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন সময় নিয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে ১৬৬ দিন গণপরিষদের অধিবেশন বসে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই সংবিধান কার্যকরী হয়। উল্লেখ্য, ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার স্মৃতিতে ২৬ জানুয়ারি তারিখটি সংবিধান প্রবর্তনের জন্য গৃহীত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন কার্যকরী হয়। এই আইনবলে ব্রিটিশ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়। স্থির হয়, সংবিধান প্রবর্তন পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্র কমনওয়েলথ অফ নেশনসের দুটি অধিরাজ্যের মর্যাদা পাবে। এই আইনবলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারত ও পাকিস্তান সংক্রান্ত বিষয় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং উভয় রাষ্ট্রের উপর সংশ্লিষ্ট গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান প্রবর্তিত হলে পূর্বপ্রচলিত ১৯৩৫ সালের ভারতের শাসন আইনেরও অবসান ঘটে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন প্রত্যাহৃত হয়। এরপরে ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির অধিরাজ্যের বদলে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা অর্জন করে।

ভারতের সংবিধান, বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। এই সংবিধানে মোট ২৪টি অংশে ৪৪৮টি ধারা, ১২টি তফসিল এবং ১১৩টি সংশোধনী বিদ্যমান। ভারতের সংবিধানের ইংরেজি সংস্করণে মোট শব্দসংখ্যা ১১৭,৩৬৯। দেশের সর্বোচ্চ আইন হওয়ার দরুন, ভারত সরকার প্রবর্তিত প্রতিটি আইনকে সংবিধান-অনুসারী হতে হয়।

সময়ের সাথে যেমন বিভিন্ন বইপত্র সংশোধন,পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের প্রয়োজন হয় তেমনই ভারতীয় সংবিধানও হয়েছে। প্রথম সংশোধন হয়েছিল সংবিধান চালু হবার পরের বছরেই, অর্থাৎ ১৯৫১ সালে। প্রসঙ্গত জানাই, ভারতের সংবিধান সংশোধনের জন্য বিল একমাত্র সংসদেই উত্থাপন করা যায়। সংসদের যে-কোনও কক্ষেই এই বিল উত্থাপন করা যায়। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কোনও বিল উত্থাপন করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার বা সংসদের যে-কোনও কক্ষের যে-কোনও সাংসদ বিলের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন। সরকার যে বিল উত্থাপন করেন তা সরকারি বিল এবং কোনও সাংসদ ব্যক্তিগতভাবে যে বিল উত্থাপন করেন তা বেসরকারি বিল হিসাবে অভিহিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, ভারতের সংবিধানের সকল অংশকে একই পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না। গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন অংশের সংশোধনীর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

১১ আগষ্ট ২০২১ এ পার্লামেন্ট পাশ হয়েছে ১২৭ তম সংবিধান সংশোধনী বিল। এতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ মহাশয় স্বাক্ষর করায় সেটি পরিণত হয়েছে ১০৫ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে। ১৯৭৬ সালে ১১ নভেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট অনুমোদিত এবং ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' (কোনোরকম সংজ্ঞা ছাড়াই) শব্দদুটি যুক্ত করা হয়।

সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদে 'ধর্মনিরপেক্ষ ' (Secular) শব্দটি ব্যবহার করার পরে যেখানে লেখা হয়েছে -" We The People Of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens;"(অর্থাৎ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হল সংবিধানের মৌলিক নীতি)।

এবারে দেখে নেওয়া যাক সংবিধান আমজনতাকে কিধরনের মৌলিক অধিকার দান করেছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২-৩৫ নং ধারায় মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। এই মৌলিক অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রথমদিকে মুল সংবিধানে ৭ টি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ ছিল। সেগুলি হল-

১) সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ নং ধারা)

২) স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ নং ধারা)

৩) শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩-২৪ নং ধারা)

4. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫-২৮ নং ধারা)

৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (২৯-৩০ নং ধারা)

৬) সম্পত্তির অধিকার (৩১ নং ধারা)

৭) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (৩২ নং ধারা)

বর্তমানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা ৬ টি। (এইখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে, ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার কে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার ৩০০এ ধারায় সংযোযিত রয়েছে) যেমন-

১) সাম্যের অধিকার:

(ক) সংবিধানের ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সবাইকে সমানভাবে রক্ষা করবে।

(খ) সংবিধানের ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের সাথে ধর্ম, জাতি, বর্ন, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বেষম্যমুলক আচরন করতে পারবে না।

(গ) সংবিধানের ১৬ নং ধারা অনুসারে সরকারি চাকুরি তে সব নাগরিকদের সমান সুযোগসুবিধা থাকবে।

(ঘ) সংবিধানের ১৭ নং ধারা অনুসারে অস্পৃতাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষনা করা হয়েছে।

(ঙ) সংবিধানের ১৮ নং ধারার সামরিক শিক্ষাক্ষেত্র ছারা সমস্ত ক্ষেত্রে উপাধি গ্রহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২) স্বাধীনতার অধিকার:

সংবিধানের ১৯ নং ধারায় নাগরিকদের ৬ প্রকার স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন-

(ক) বাক স্বাধীনতার অধিকার

(খ) শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশ

(গ) সজ্ঘ ও সংবিধানের ২০ (১) ধারায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র সেই আইন অনুসারেই শাস্তি প্রদান করতে হবে।

সংবিধানের ২০(২) ধারায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

সংবিধানের ২০(৩) ধারায় বলা হয়েছে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ দিতে বাধ্য করা যাবে না।

সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

২০০২ সালের ৮৬ তম সংবিধান সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার আইনটি (২১এ ধারা) সংবিধানে সংযোযিত হয়েছে। এই ধারায় সকল শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

২২ নং ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তিকে যুক্তি সংগত কোন কারণ ছারা গ্রেফতার করা যাবেনা।

৩) শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার:

সংবিধানের ২৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, মানুষ নিয়ে ব্যবসা অর্থাৎ মানুষ ক্রয় বিক্রয়, বেগার খাটানো বা অনুরুপ ভাবে বলপূর্বক শ্রমদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সংবিধানের ২৪ নং ধারায় ১৪ বছেরর কম বয়সী শিশুদের খনি, কলকারখানা বা অন্য কোন বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার:

সংবিধানের ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেক এবং বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোন ধর্ম গ্রহন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন ও নিজ ধর্ম প্রচার করতে পারবে।

সংবিধানের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনা করতে পারবে।

সংবিধানের ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতির এবং রক্ষনাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যক্তিকে কর বা চাঁদা দিতে বাধ্য করা যাবে না।
সংবিধানের ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত সেগুলিতে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাবেনা।

৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার: সংবিধানের ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, ভারতীয় ভুখন্ডের যেকোন অংশে বসবাসকারী নাগরিক নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষনের অধিকার ভোগ করতে পারবে।
সংবিধানের ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সহ সকল সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৬) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার: সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার টি কে, ড. বি আর আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধানের হৃদয় ও আত্মা বলে আখ্যায়িত করেছেন।
সংবিধানের ৩২নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতীয় নাগরিকরা যদি মনে করেন যে তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে বা খর্ব করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হতে পারেন।

এছাড়া সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে, জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলে রাষ্ট্রপতি, ২০ এবং ২১ নং ধারা ব্যতীত সমস্ত মৌলিক অধিকার গুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে স্থগিতাদেশ দিতে পারেন।
সংবিধানের ৩২ নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট, ২২৬ নং ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট নাগরিকদের মৌলিক অধিকার গুলি রক্ষার জন্য পাঁচ ধরনের লেখ বা রিট জারি করতে পারেন। যেমন-
(ক) বন্দী প্রত্যক্ষীকরন (Habeas Corpus): এর অর্থ হল To have the body অর্থাৎ "সশরীরে হাজির করা"।
(খ) পরমাদেশ (Mandamus): এর অর্থ হল Command to.
(গ) প্রতিষেদ (Prohibition): এর অর্থ হল "নিষেধ করা"।
(ঘ) উৎপ্রেশন (Certiorari) এর অর্থ হল "বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া"।
(ঙ) অধিকার পৃচ্ছা (Quo Warranto) এর অর্থ হল "কোন অধিকারে"।

> ধর্মকে সাধারন মানুষ সত্য বলে জানে,জ্ঞানী জানে মিথ্যা আর শাসকরা অতি প্রয়োজনীয় বলে জানে।
>
> -এডোয়ার্ড গিব্বন

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও আইন

- মধুসূদন মাহাত

বাল্যবিবাহ কী:- পরিণত বয়সের আগেই বিবাহ করলে, তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। ভারতে কোন মেয়ে আঠারো বছরের নিচে এবং ছেলে একুশ বছরের নিচে বিয়ে করলে তাকে বাল্যবিবাহ হিসেবে ধরা হয়। বর্তমানে উভয়ের একুশের নিচে হলেই বাল্যবিবাহ বলে গণ্য হবে।

বাল্যবিবাহের পরিসংখ্যান:- বিশ্বে বাল্যবিবাহের হার যেখানে 29 শতাংশ, সেখানে ভারতে 58 শতাংশ। ইউনিসেফ -এর সমীক্ষা অনুযায়ী 43 শতাংশের বিয়েই 18 বছরের আগে হয়েছে। প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন - তপশিলী জাতি, জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসরদের ক্ষেত্রে 70% মেয়েদের বিয়ে হয় নাবালিকা বয়সেই। বাল্যবিবাহ যে দেশগুলিতে সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে 6 নম্বরে আছে ভারত।

বাল্যবিবাহের কারণ:- বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং বিজ্ঞান সচেতনতার অভাব। বেশী বয়স পর্যন্ত মেয়েকে বাড়িতে রাখলে, মেয়ে কোন অযাচিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারে বা অবিবাহিত বলেই তার উপর কোন আক্রমণ সংঘটিত হলে পারিবারিক বা সামাজিক সম্মাণ নষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কায় মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেওয়ার মানসিকতা তৈরা হয়ে রয়েছে। আবার, বেশী বয়সে বিয়ে হলে, বিয়ের খরচ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দ্রুত বিয়ে অনেক পরিবার। এছাড়াও রয়েছে ধর্মীয় রীতি মেনে দ্রুত বিয়ে দেওয়ার বিধি। ধর্মীয় রীতি মেনে চলতে ইসলামিক দেশগুলো বোধ হয় এগিয়ে। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে যে 5 টা দেশে বাল্যবিবাহের হার সর্বোচ্চ তা হল - নাইজার (75%), চাদ (72%), মালি (71%), বাংলাদেশ (64%), গিনি (63%)। এবং এই পাঁচটা দেশের প্রত্যেকটি ইসলাম প্রধান রাষ্ট্র। সর্বোপরি, কম বয়সে বিয়ে দিলে, বিশেষ করে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির এবং তার সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির যে সম্ভাবনা রয়েছে তা সম্বন্ধে অজ্ঞতাই বাল্যবিবাহের প্রধান কারণ।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন:- বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ভারতে প্রথম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন আনা হয় 1929 সালে - "Child Marriage Registry Act, 1929" বা "বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন - 1929"। এই আইন অনুসারে পাত্র পাত্রীর বিয়ের বয়স যথাক্রমে 21 এবং 18 করা হয়েছিল । এর থেকে কম বয়সে বিয়ে দিলে, যারা এই বিয়ের উদ্যোক্তা অর্থাত্ বাবা -মা ছাড়াও বিয়েতে উপস্থিত আত্মীয় স্বজন ও পুরোহিতের, এমনকি যারা এই বিয়েতে কোনভাবে সাহায্য বা আর্থিক সাহায্য করে থাকে, তাদের শাস্তির বিধান রয়েছে। 1929 সালের এই আইনে শাস্তির বিধান ছিল জরিমানাসহ তিনমাসের কারাবাস। পরে 2006 সালের " The Prohibition of Child Marriage Act, 2006" তে এই শাস্তি বাড়িয়ে 2 বছর কারাবাস অথবা একলক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরপর এই আইন আরও সংশোধন করে মেয়ের বিয়ের বয়স ন্যুনতম 21 বছর করা হয় - "The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Act, 2021 তে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কীভাবে করবেন:- বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আমাদের ও সরকারের সচেতনার কাজ সব সময় জারী রাখতে হবে। তবে এর বিরুদ্ধে কাজ করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। মনে রাখতে হবে এটি খুব স্পর্শকাতর বিষয়। কাজেই সাবধানতা খুব প্রয়োজন।

একজন নাবালিকা নিজে অভিযোগ করলে ভালো কথা এবং তা অন্যের কাজ করার বা তাকে সহযোগিতা করার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু, কোন প্রতিবেশী বা বাইরের কেউ কখনোই থানাতে এবং বিডিও অফিসে বিশেষ করে নিজের এলাকার বিডিও বা থানাকে জানাবেন না, কারণ এদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি, ফলে আপনার নাম ও ঠিকানা ফাঁস করে দিতে পারে। যারফলে অভিযুক্ত পরিবারের আক্রমণের শিকার হতে পারেন। অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি - জেলার সমাজ কল্যাণ আধিকারিক, মহকুমা শাসক এবং বর্তমানে চাইল্ড লাইন তথ্য গোপণ রেখে কাজ করে, তাই এদের জানানো বেশি নিরাপদ। এছাড়া আপনি যুক্তিবাদী সমিতিকে জানালেও তারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। যুক্তিবাদী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা কয়েক বছরে গোপণে ও প্রকাশ্যে দুশোরও বেশি বাল্যবিবাহ বন্ধ করে সমাজে কড়াবার্তা দিতে পেরেছে, ফলে অনেক পরিবারকে বাল্যবিবাহ দিতে গিয়ে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। তবে বাল্যবিবাহের কোন অভিযোগ থাকলে বিয়ের কিছুদিন আগেই জানান, তাতে করে পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষতিটা এড়ানো যাবে এবং সফলতার হারটাও বেশি হবে।

পকসো আইন

শিশুদের প্রতি যাতে কোনও ধরণের যৌন অপরাধ না হয়, তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে আইন, তাকেই "পকসো" (POCSO) বলা হয়। পুরো নাম, "দ্য প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট ২০১২"। শুধু নিরাপত্তা দেওয়া নয়, কোনও শিশুর প্রতি কোনওপ্রকার যৌন অপরাধ ঘটলে কীভাবে বা কি পদ্ধতিতে তার বিচার হবে, কোন আদালতে তার বিচার হবে, কোন পদ্ধতিতে শিশুটির সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে, কোন পদ্ধতিতে তদন্ত হবে, শিশুটির চিকিৎসা কীভাবে হবে-ইত্যাদি বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে এই আইনে।

পকসো আইনে ১৮ বছরের নিচে বাচ্চাদেরই শুধু শিশু বলে গণ্য করা হবে। এখন দেখা যাক এই আইনে কী কী শাস্তির বিধান আছে।

1. যৌন নির্যাতন বা ধর্ষণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ থেকে ১০ বছরের জেল ও জরিমানা। সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও জরিমানা।
2. যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সাজা ৩ থেকে ৫ বছরের কারাবাস। সর্বোচ্চ সাজা ৫ থেকে ৭ বছরের কারাবাস ও জরিমানা।
3. অশ্লীল কাজের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫ বছর জেল ও জরিমানা। সর্বোচ্চ ৭ বছর জেল ও জরিমানা। এছাড়াও আইনে বলা হয়েছে
4. যৌন হয়রানির শিকার শিশুর জবানবন্দী নিতে হবে তার বাড়ি বা পছন্দমত স্থানে। এই মামলায় প্রাধান্য দিতে হবে মহিলা পুলিশ আধিকারিককে।
5. রাতে শিশুকে থানায় আনা যাবে না।
6. জবানবন্দির সময় পুলিশ ইউনিফর্ম পরে থাকা চলবে না।
7. শিশুর কথা শুনে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে হবে। শিশুর কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ নেওয়া যাবে না।
8. প্রয়োজনে জবানবন্দির সময় শিশুটির জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
9. শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুর জবানবন্দি নেওয়ার সময় পরিবারের লোকের সাহায্য নিতে হবে।
10. মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় শিশুর মা-বাবা কিংবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপস্থিতি দরকার।
11. নির্যাতিতা মহিলা হলে, মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় মহিলা চিকিৎসক থাকতে হবে।
12. বিচার চলাকালীন শিশুর বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে হবে।
13. কোনও উত্তেজনামূলক প্রশ্ন শিশুকে করা যাবে না।
14. নির্যাতিতা শিশুর নাম বিচারের সময় গোপন রাখতে হবে।
15. বিশেষ আদালতের নির্দেশ ছাড়া এই খবর প্রকাশ করা যাবে না।
16. বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ দল ২৪ ঘণ্টার ভিতরে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে পুরো ঘটনা জানাতে হবে।
17. শিশুটির গুরুতর আঘাত বা ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।
18. অপরাধের ৩০ দিনের মধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শিশুর কাছে যা প্রমাণ আছে, তা আদালতে নথিভুক্ত করতে হবে। সম্প্রতি এই আইনের বিশেষ সংশোধনী আনা হয়েছে। একটি সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পকসো আইনের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ধারা সংশোধন করা হচ্ছে। নৃশংসতায় দোষীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। পাশাপাশি, চাইল্ড পর্নোগ্রাফি রুখতেও পকসো আইনে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সাইবার অপরাধ বা সাইবার ক্রাইম-এর আওতায় কী কী পড়ে?

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয়রানি, ফেসবুক এখন সবার হাতের নাগালে। খুব কম খরচে ফেসবুক ব্যবহার করা যায় আমাদের দেশে এখন। প্রযুক্তির এই ছোঁয়ায় আমাদের দেশ বদলেছে অনেক। কিন্তু এই ফেসবুকের মাধ্যমে করা ক্রাইম এখন বেড়েই চলেছে। সহজলভ্য হয়ে পড়ায় ফেসবুকে সাইবার ক্রাইম এখন আমাদের দেশে অনেক বড় একটি সমস্যা। দ্রুত ছড়িয়ে

পড়ছে এই সাইবার ক্রাইম আমাদের দেশে। আমাদের অজান্তেই আমরা সাইবার ক্রাইমেরর শিকার হয়ে যাচ্ছি। অনেকেই মুখ বুঝে সহ্য করেই যাচ্ছেন, কিন্তু জানেন না যে কিভাবে কি করতে হবে। আজকে আমি আসলে আপনাদের সাথে কথা বলবো কখন আর কিভাবে বুঝবেন যে আপনি ফেসবুকে বা সামাজিক গণমাধ্যমে সাইবার ক্রাইমের শিকার হচ্ছেন বা কখন আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

১. সাইবার বুলিং-

কেউ যদি অনলাইনে আপনাকে অহেতুক জ্বালাতন করে এবং আপনার সম্মানহানি করার চেষ্টা করে অথবা অনলাইনে যেকোনো উপায়েই হোক কেউ যদি আপনাকে উত্যক্ত করে তাহলে তা সাইবার বুলিং হিসেবে স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে তা যদি অনলাইনে হয় তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

২. আইডি হ্যাক-

আপনার ফেসবুক আইডি কেউ যদি হ্যাক করে থাকে আর আপনার ব্যক্তিগত ছবি আর কথোপকথন অনলাইনে ছেড়ে দেবে বলে যদি হুমকি প্রদান করে, পাশাপাশি তা ঠেকানোর জন্য তার বিনিময়ে যদি সে আপনার কাছে অর্থ দাবি করে সেক্ষেত্রে আপনি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৩. সেক্সুয়ালি এবিউজ-

কেউ যদি অনলাইনে আপনার ছবি দিয়ে কোনো অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আইডি খুলে, আপনার ছবি ব্যবহার করে কোনো পোস্ট প্রদান করে। আপনার ছবির সাথে অন্য ছবি জোড়া লাগিয়ে বিতর্কিত কিছু বানোয়াট খবর প্রকাশ করে, আপনার ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও অনলাইনে প্রকাশ করে, পাশাপাশি তা ঠেকানোর জন্য তার বিনিময়ে যদি সে আপনার কাছে অর্থ দাবি করে সেক্ষেত্রে আপনি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৪.হ্যাকিং-

অনলাইনে ডাটা বা তথ্য অনুমতিবিহীন চুরি, ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় হ্যাকিং। এতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য চুরি হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম ক্ষুন্ন হয়।

এ রকম আরো অনেক কিছুই রয়েছে। তবে এখন নাগাদ এই সমস্যাগুলোই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে ফেসবুকে সাইবার ক্রাইমের শিকার হওয়ার সংখ্যাই অনেক বেশি। এর বাইরেও অনেক রকমের সাইবার ক্রাইম রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে অনলাইন বা ইন্টারনেটে অনেক রকমের হয়রানি। নিচে অনলাইনের হয়রানির ধরনগুলো দেওয়া হলো:

- সামাজিক মাধ্যমে ফেক আইডি খুলে জ্বালাতন
- সামাজিক মাধ্যমের আইডি, ইমেইল অথবা ওয়েব সাইট হ্যাক
- সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন ট্রল গ্রুপ বা পেজে ব্যক্তিগত ছবি ছড়িয়ে দেওয়া
- বিভিন্ন পর্নো ওয়েবসাইটে ব্যক্তিগত মুহূর্তের ধারণ করা ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া
- সামাজিক মাধ্যমের আইডি হ্যাক করে অর্থ দাবি
- ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি প্রদান ও হয়রানি
- কাউকে মারধর করে তার ভিডিও ধারণ করে তা অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া
- কোনো কিশোরী বা যুবতী বা নারীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে তার ভিডিও ধারণ করে তা অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া
- অনলাইনে ইকমার্সের নামে ভুয়া পেজ খুলে খারাপ পণ্য বিক্রির নামে হয়রানি
- অনলাইনে পরিচিত হয়ে অনলাইন কারেন্সি ট্রাঞ্জেকশন করতে গিয়ে ফ্রডের শিকার
- ভুয়া বিকাশ নম্বর থেকে ফোন করে লটারির কথা বলে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ

- ভুয়া বিকাশের এসএমএস দিয়ে গ্রাহককে দিয়েই অভিনব কায়দায় প্রতারণা
- অনলাইনে ব্যাংক একাউন্ট আর এটিএম কার্ডের ডিটেইলস চুরি করে অর্থ চুরি
- অনলাইনে স্প্যামিং এবং গণ রিপোর্ট
- অনলাইনে স্ক্যামিং
- অনলাইনে বিভিন্ন সেলেব্রেটি বা মানুষের নামে ভুয়া তথ্য ছড়ানো বা খবর প্রচার

কোনও ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে ফেইসবুকের একটি অশ্লীল বিবৃতি পোস্ট করলে সেটি কি একটি অপরাধ হতে পারে?
-হ্যাঁ, অবশ্যই হতে পারে যদি সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ বিবৃতি হতাশা সৃষ্টি করে, সম্মান হানি ঘটায় এবং বিবৃতিটি যদি।ব্যক্তির বা সরকারের ক্ষতির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় তবে এটি সাইবার মানহানির আওতায় পড়ে এবং এটি IPC ধারা 499 এব্ তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000 এর ধারা 4 এর অধীনে দন্ডযোগ্য অপরাধ।

যদি একজন ব্যক্তি ফেসবুক, ইমেল বা অন্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির হয়রানির উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তিকে অনুসরণ করে তবে তা কি অপরাধমূলক অপরাধ হতে পারে?
-হ্যাঁ, যদি ব্যক্তিটি হয়রানির উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকে অনুসরণকরে বা অপ্রত্যাশিত ফ্যাশনে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে তবে এটি সাইবার স্টকিংয়ের নামক একটি অপরাধ এবং সেকশন 503 আইপিসি অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
যদি কোন ব্যক্তিকে সোশ্যাল সাইট এর মাধ্যমে ধমকি, অশ্লীল কথাবার্তা, হ্যাকিং, এটিএম কার্ড জালিয়াতির শিকার হতে হয় তবে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে?
-যদি কোন ব্যক্তি কে সোশ্যাল সাইট এর প্রকোপে পড়ে তবে তিনি জেলার সাইবার ক্রাইম থানায় জানাতে পারেন অথবা তিনি স্থানীয় পুলিশ অফিসে গিয়ে পুলিশ কর্তা কে লিখিত অভিযোগ দিতে পারেন।

Some General Legal Information regarding Cyber crime or Computer Crime:---
New technologies create new criminal opportunities but few new types of crime. The information and Communication technologies revolutionized with the invention of the computer and computer has been a boon to the human community, but the same computer is an instrument to aid criminals. Therefore, certain well known crimes like unauthorized access to information, damage to property, distribution of obscene and indecent material etc. have assumed different dimensions with the emergence of Internet. Most cybercrime is an attack on information about individuals, corporations, or governments. Although the attacks do not take place on a physical body, they do take place on the personal or corporate virtual body, which is the set of informational attributes that define people and institutions on the Internet. In other words, in the digital age our virtual identities are essential elements of everyday life: we are a bundle of numbers and identifiers in multiple computer databases owned by governments and corporations. Cybercrime highlights the centrality of networked computers in our lives, as well as the fragility of such seemingly solid facts as individual identity.

What is Cyber Crime or Computer Crime?
Cyber crime is an act of creating, distributing, altering, stealing, misusing and destroying information through the computer manipulation of cyberspace without the use of physical force against the will

or the interests of the victim. Cyber crime include variety of criminal offences and unlawful activities related to or having connection to computer or a traditional crime which has been transformed by the use of a computer related crimes such as criminal threats, internet auction, hacking of bank accounts, cloning of ATM card, cyber stalking, cyber defamation, email spoofing, morphing, phishing etc.

Whether posting a statement in facebook against any person or against the government is a crminal offence?

If the particular statement against the government is causing defamation and the statement is made with the intention of causing harm to the reputation of such person or government then it amounts to cyber defamation and it's a punishable offence under Section 499 of the Indian Penal Code read with section 4 of the Information Technology Act,2000.

If a person is following another person through facebook, email, or other social media with the intention of harassing the other person in unsolicited fashion then is it a criminal offence?

Yes, if the person is following te other person via internet with the intention of harassment or to contact another in an unsolicited fashion then it's a crime called as Cyber Stalking and is punishable under section 503 IPC

সাইবার অপরাধ বা কম্পিউটার অপরাধ সংক্রান্ত কিছু সাধারণ আইনি তথ্য:

-Sabnam & Associates Law Firm

বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। বিজ্ঞানের অবদানে এসেছে নানা নতুন প্রযুক্তি। আর এই প্রযুক্তিই নতুন অপরাধমূলক কার্যকলাপের ধারক ও বাহক। কম্পিউটার ও বিভিন্ন সোশ্যাল সাইট গুলো আবিষ্কারের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপুল বিপ্লব ঘটিয়েছে। মানব সম্প্রদায়ের জন্য এটি যেমন আশীর্বাদ স্বরূপ ঠিক তেমনই কিন্তু এই কম্পিউটার অপরাধীদের সহায়তা করার জন্য একটি যন্ত্রও বটে। কম্পিউটার আবিষ্কারের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটেছে মানব সম্প্রদায়ের জন্য একটি আশীর্বাদ স্বরূপ, কিন্তু একই কম্পিউটার অপরাধীদের সহায়তা করার জন্য একটি যন্ত্রও বটে। অতএব, নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য অননুমোদিত অ্যাক্সেস, সম্পত্তি ক্ষতি, অশ্লীল মেসেজ, ছবি বিতরণ ইত্যাদি সুপরিচিত অপরাধ ইন্টারনেটের উত্থানের সাথে বিভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করেছে। সর্বাধিক সাইবারক্রাইম ব্যক্তি, কর্পোরেশন, বা সরকার সম্পর্কে তথ্যর উপর একটি আক্রমণ যদিও কোনও শারীরিক শরীরের আক্রমণগুলি সংঘটিত হয় না, তবে এটি ব্যক্তিগত বা কর্পোরেট ভার্চুয়াল শরীরের উপর সঞ্চালিত হয়, যা তথ্যগত বৈশিষ্ট্যগুলির সেট যা ইন্টারনেটে মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে। অন্য কথায়, ডিজিটাল যুগে আমাদের ভার্চুয়াল পরিচয় দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য উপাদান: আমরা সরকার এবং কর্পোরেশনের মালিকানাধীন একাধিক কম্পিউটার ডেটাবেসে সংখ্যা এবং সনাক্তকারীর একটি বান্ডিল। সাইবারক্রাইম আমাদের জীবনে নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের কেন্দ্রিকতা তুলে ধরে, সেইসাথে স্বতন্ত্র পরিচয় হিসাবে যেমন আপাতদৃষ্টিতে কঠিন তথ্যগুলির তার বাস্তব রুপ।

সাইবার ক্রাইম বা কম্পিউটার অপরাধ কি?

সাইবার অপরাধটি মূলত শারীরিক শক্তির ব্যবহার না করে সাইবার স্পেসের সাহায্যে কম্পিউটার ম্যানিপুলেশন দ্বারা তথ্য তৈরি, বিতরণ, পরিবর্তন, চুরি, অপব্যবহার এবং ধ্বংসাত্মক মূলক কাজ। সাইবার অপরাধ বিভিন্ন ধরণের কম্পিউটারের সাথে সম্পর্কযুক্ত

যেমন ইন্টারনেট নিলাম, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হ্যাকিং, এটিএম কার্ড ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে রূপান্তরিতকরণ, সাইবার স্টকিং, সাইবার ডিফাম্যামটেশন, ইমেইল স্পুফিং, মর্ফিং, ফাউজিং ইত্যাদি।

পণপ্রথা বিরোধী আইন নিয়ে কিছু আলোচনা।

পণ, যৌতুক অথবা দান যাই বলুন সবই এক। বিয়েতে পাত্রীর অভিভাবকের তরফে পাত্রকে যৌতুক দেওয়ার আচার বা রীতি বহুযুগ পুরোনো একটি প্রথা। আমার ওকালতির জীবনে বেশকয়েকটি বধূহত্যা এবং বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা চাক্ষুষ করেছি এবং আইনি লড়াইও লড়েছি যার প্রধান কারন, পাত্রপক্ষর দাবী বা ইচ্ছানুযায়ী পণ না দেওয়ার জন্যে পাত্রী বা বধূর ওপরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে- "যৌতুক বা পণ হল কন্যার বিবাহে পিতামাতার সম্পত্তির হস্তান্তর প্রক্রিয়া। 'যু' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'যুত' শব্দের অর্থ যুক্ত; বুৎপত্তিগত অর্থ হলো, পাত্র-পাত্রীর যুক্ত হওয়ার সময়ে অর্থাৎ বিয়ের সময় পাত্রীর জন্য যা কিছু মূল্যবান সামগ্রী দেয়া হয়, তা যৌতুক।"

উইকিপিডিয়া আরো জানাচ্ছে- "পণ মৃত্যু বলতে বোঝায়, যৌতুক বা পণ নিয়ে বিবাদের ফলে বিবাহিত মহিলার, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির ক্রমাগত হয়রানি ও অত্যাচারের স্বীকার হয়ে অথবা আত্মহত্যায় প্ররোচিত হয়ে মৃত্যু। ২০১০ সালে ভারতে সর্বোচ্চ ৮,৩৯১ টি পণ মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল, অর্থাৎ প্রতি ১০০,০০০ মহিলার মধ্যে ১.৪ জনের মৃত্যু। ভারতে প্রতি বছর নারী হত্যার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই পণ মৃত্যুর ঘটনা, যা ১৯৯৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল প্রবণতা হিসেবে দৃশ্যমান।"

'দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর' তথ্য অনুযায়ী, ভারতে পণ মৃত্যুর সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০১২ সালে সমগ্র ভারতে ১৮,২৩৩ টি পণ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। এর অর্থ প্রত্যেক ৯০ মিনিটে একজন বধূকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

ভারতীয় দণ্ডবিধির সেকশন ৩০৪বি এবং ৪৯৮এ ধারায় পণপ্রথাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রয়োজনে জেলও হতে পারে। তাই কোনও বিবাহিত মহিলা যদি মনে করেন তার শ্বশুরবাড়ি অকারণে পণ নিচ্ছেন বা পণের জন্য তাঁকে কোনওরকম শারীরিক কিংবা মানসিক অত্যাচার করছেন তাহলে তিনি নির্দ্বিধায় মামলা করতে পারেন।

তবে জেনে রাখা ভালো, পণপ্রথা বিরোধী আইনের (The Dowry Prohibition Act, 1961) অপব্যবহার হচ্ছে। এমনও বেশকয়েকটি ঘটনা আমার জীবনে চাক্ষুষ হয়েছে যেখানে উচ্চবিত্ত পাত্রপক্ষ বধূহত্যা করেও শুধু টাকার জোরে আইনকে পকেটবন্দি করে বুকফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং প্রত্যন্ত গ্রামের কিংবা শহরের শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত অসংখ্য মহিলারা উক্ত আইনের বিষয়ে অজ্ঞতার কারনে এবং আইনি পক্রিয়া চালানোর খরচের অভাবে নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করে বেঁচে থেকেছে। আবার এমনও অনেক পাত্র আছেন যারা বিয়েতে যৌতুক বা পণ নেওয়াকে তাচ্ছিল্যভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে নয়তো মাত্র এক টাকা কয়েন নিয়েছে দান হিসেবে। এটি কু নাকি সু-প্রথা সেই নিয়ে বিতর্ক আজও অব্যাহত। দুঃখ লাগে যখন দেখা যায় উচ্চবিত্ত পরিবারের কোনো উচ্চশিক্ষিত পুত্র সন্তান নিজের বিয়েতে নির্লজ্জভাবে হাত পেতে মোটা অঙ্কের অর্থ থেকে দানসামগ্রী, যৌতুক হিসেবে নেয়।

পরিশেষে, এটাই বলতে চাই নারীদের উচিৎ নিজেকে অবলা, দুর্বল না ভেবে নিজেদের চেনা এবং জানা। তাদের উচিৎ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা বিদ্যাসাগর, রামমোহনদের। এই দুজন অসামান্য ব্যক্তিত্বরা বাল্যবিবাহ, সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বিধবাবিবাহ প্রচলনের কারনে আজও বহু মহিলারা ডিভোর্সি তকমা ঘুচিয়ে ফের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্মানের সাথে সংসার করছেন।

জেনে রাখুন কিছু আইন-

১) ভারতীয় রেলওয়ে আইন ১৯৮৯ অনুযায়ী, ১৩৭ ধারা- বৈধ নথিপত্র বা পাস ছাড়া রেলভ্রমণ, ১৪১ ধারা- বিনা কারণে চেন টানা, ১৪৪ ধারা- পণ্য ফেরি করা, ১৪৫ ধারা- অশালীন আচরণ করা, ১৪৭ ধারা- অনধিকার প্রবেশ এবং তা থেকে বিরত থাকতে ব্যর্থ হওয়া, ১৫৭ ধারা- টিকিট বা রেলের পাস বিকৃত বা অবৈধ সংশোধন করা, ১৫৯ ধারা- রেলের এলাকায় চালকদের নির্দেশ অমান্য করা, ১৬২ ধারা- মহিলা কামরায় অবৈধ ভ্রমণ, ১৬৬ ধারা- আবর্জনা সৃষ্টি করা এবং ১৬৭ ধারা- যাত্রী এলাকায় ধূমপান করা ইত্যাদি রেলওয়ে আইনের মোট ১৬টি ধারা সংশোধনের পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। এছাড়া, বিনাটিকিটে রেলভ্রমণে শাস্তির তালিকা থেকে হাজতবাস তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা এবং তার বদলে শুধুমাত্র আর্থিক জরিমানা ধার্য করার রীতি চালু করতে উদ্যোগ নিতে চলেছে ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।
সূত্র- ১৭ জুন ২০২০, হিন্দুস্থান টাইমস বাংলা অনলাইন।

২) বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪৪ নং অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং ধারা ৪৫ অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। উক্ত দুই ধারা অনুযায়ী বুজরুক জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, গুণিন, ওঝা ইত্যাদিদের জেল অবধারিত। কারন, প্রথমত বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা জনগণকে প্রলুব্ধ এবং বিভ্রান্ত করে প্রতারণা করেন এবং বিষাক্ত সাপের কামড়ের পরে নিজদের কেরামতি দেখানোর নামে অসংখ্য মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

৩) ২২ জুন ২০০৩ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে - রেইকি বা স্পর্শ চিকিৎসা যাঁরা করেন, তাঁরা নিজের নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটা কোনো ভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এই চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রক স্পষ্ট করে এটাও জানিয়েছে যে, রেইকি সহ জেম থেরাপি, কালার থেরাপি, ম্যাগনেটোথেরাপি,আরোমা থেরাপি, মিউজিক থেরাপি ইত্যাদি তথাকথিত প্রতিটি চিকিৎসা পদ্ধতিই বে-আইনি এবং এইসব পদ্ধতি শেখানো কিংবা প্রয়োগকারী ব্যাক্তি কোনো ভাবেই নিজের নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারবেন না। ভারতে দুটো জোরালো আইন আছে বুজরুকি চিকিৎসার বিরুদ্ধে। আইন দুটি হল " (1) The Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954
এবং (2) The Drugs And Cosmetics Act (Amendment) 1940।" The Drugs And Cosmetics Act 1940, Amendment GSR 884 (E) এই মর্মে ১৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে ভারতের প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ জারি করেছে কেন্দ্রের 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর'। এবার থেকে শাস্তির পরিমান আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা।

৪) সাপের কামড়ে কোনও রোগীর যদি মৃত্যু ঘটে –মৃত ব্যক্তির পরিবার এককালীন ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। কোন রোগী মারা গেলে সরকারী হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার "মৃত্যুর কারণ যে সাপের কামড়" এই মর্মে শংসাপত্র প্রদান করবেন কারণ সাপে কামড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রাপ্য ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নয় এই শংসাপত্রই চলবে।(সরকারী অর্ডার নং- ১৫৬১(১৯)F.R/8P-৩/০৪ date ১৯.৮.২০০৮)।

৫) কোনো মহিলাকে যদি তার স্বামী অকারণে মারধর, গালিগালাজ করেন, শ্বশুরবাড়িতেও প্রতিনিয়ত অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয় তবে অবশ্যই হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টের ১৩ নং ধারা অনুযায়ী মামলা করতে পারেন অত্যাচারিত মহিলা। সেই সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ নং ধারা অনুযায়ী মেয়েরা নিজের জন্য এবং সন্তানের জন্য খোরপোশ (financial maintenance) দাবি করতেই পারেন (স্বামীর রোজগার অনুযায়ী খোরপোশ নির্ধারণ করা হয়)। যদি একান্তই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে থাকে তাহলে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ১৪ নং ধারা এবং হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টের ২৭ নং ধারা অনুযায়ী স্ত্রী, ডিভোর্সের পর নিজের যাবতীয় জিনিস ফেরত পাবেন

তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে। গয়না, আসবাব, ফ্রিজ, টিভি-সহ যা কিছু তাঁর অভিভাবক যৌতুক হিসেব দিয়েছেন বিয়েতে সবেতেই অধিকার একমাত্র স্ত্রীর। এছাড়াও নিজের জিনিস ফেরত পেতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট- এ মামলা করতে পারবেন।

৬) এই একুশ শতকে শুধু ভারতেই নয় পৃথিবীর বহু দেশে কন্যার জন্মকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। তাই আজও ভারতে কন্যাভ্রুণ (Female feticide) হত্যার ঘটনা যথেষ্ট পরিমাণে শোনা যায়। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল বা ইউএনএফপিএর জুন মাসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ৫০ বছরে ভারতে প্রায় ৪ কোটি ৬০ লাখ মেয়ে 'নিখোঁজ' হয়ে গেছে। প্রতি বছর দেশটিতে গর্ভপাত ঘটিয়ে ৪৬ লাখ কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলা হয় এবং জন্মের পর কন্যা শিশুদের ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করার কারণে জন্মের পর কন্যা শিশুমৃত্যুর হার খুবই বেশি।

১৯৭৪ সালে দিল্লিতে যন্ত্রের সাহায্যে গর্ভাবস্থায় মাতৃগর্ভে কন্যা না পুত্রভ্রুণ আছে তা জেনে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এবং ৮-এর দশকের প্রথম দিকে কিছু পরীক্ষাগারে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করে কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হতে থাকে। ২০০৩ সালে PCPNDT Act (The Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act) চালু করা হয়। এতে বলা হল, বিশেষ কিছু ব্যাপারে ছাড়া কখনই গর্ভাবস্থায় USG করা ও শিশুর লিঙ্গ প্রকাশ করা যাবে না। এইভাবেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে কন্যাভ্রুণ হত্যা বন্ধ করার। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো, যদি কোনও নারী গর্ভপাত করাতে চান সেক্ষেত্রে তার জীবনসঙ্গী এবং শ্বশুরবাড়ির অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 অনুযায়ী ২৪ সপ্তাহের মধ্যে যে কোনও নারী স্ব-ইচ্ছায় গর্ভপাত করাতেই পারেন। তবে বিশেষ কোনও কারণ থাকলে ভারতে ২৪ সপ্তাহের পরও গর্ভপাতের অধিকার দিয়েছে আদালত। একদিকে নারীকে দেবীশক্তিরুপে পুজো, অন্যদিকে ধর্ষণ কিংবা কন্যাভ্রুণ হত্য। এই নাটক কতদিন চলবে জানা নেই।
৭) লিঙ্গ বৈষম্য নিরোধক আইন-
দেব-দেবীর মন্দিরে নারীদের প্রবেশাধিকার না থাকায়, তার বিরুদ্ধে নারীবাদী সংগঠনগুলি সোচ্চার সর্বদাই। কিন্তু মন্দির কর্তৃপক্ষের মন এতে টলেনি। ধর্মগুরুদের মতে, প্রাচীনকাল থেকেই মাসিকের সময় মেয়েদের ‘অশুচি’ বলে গণ্য করা হয়। তাই তাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এ নিয়ে আন্দোলনকারীরা আদালতের দ্বারস্থ হলে মুম্বই হাইকোর্ট মন্দির প্রবেশাধিকার আইন ১৯৪৭ অনুসারে রায় দেয় যে, মন্দিরে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করা যাবে না।

৮) জাতিভেদ প্রথা অপরাধযোগ্য-
জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আইনের ১৭নং ধারায় এই আইন লঙ্ঘনে ছ'মাসের জেল ও জরিমানার কথা বলা হয়েছে। কারণ মানুষের ব্যক্তি অধিকার মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। সামাজিক মেলামেশা, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, ধর্মীয় স্থানে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে নীচু জাত আর উঁচু জাতের মধ্যে বিভেদ করা অবৈধ। ১৯৭১ সালে আইনটি সংশোধন করে তার নাম দেওয়া হয় নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন।

৯) লিঙ্গ বৈষম্য নিরোধক আইন-
দেব-দেবীর মন্দিরে নারীদের প্রবেশাধিকার না থাকায়, তার বিরুদ্ধে নারীবাদী সংগঠনগুলি সোচ্চার সর্বদাই। কিন্তু মন্দির কর্তৃপক্ষের মন এতে টলেনি। ধর্মগুরুদের মতে, প্রাচীনকাল থেকেই মাসিকের সময় মেয়েদের ‘অশুচি’ বলে গণ্য করা হয়। তাই তাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এ নিয়ে আন্দোলনকারীরা আদালতের দ্বারস্থ হলে মুম্বই হাইকোর্ট মন্দির প্রবেশাধিকার আইন ১৯৪৭ অনুসারে রায় দেয় যে, মন্দিরে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করা যাবে না।
১০) সম্পূর্ণ আইনটির নাম- Essential Services Maintenance Act 1968 সংক্ষেপ ESMA Act যা, ১৯৬৮ সালে তৈরী এবং ১৯৮১ সালে সংশোধন করা হয়। এই আইন লঙ্ঘন করলে ৬ মাসের জেল এবং কাজে বাঁধা সৃষ্টি করলে অথবা উৎসাহিত করলে শাস্তির পরিমাণ দ্বিগুণ হতে পারে। চিকিৎসা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো জরুরি পরিষেবা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে

বা বিপর্যস্ত বলে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কর্মবিরতি, ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং প্রয়োজনে কর্মচারীদের ওভারটাইম করতে বাধ্য করতে পারে প্রশাসন। এমনই বলছে এসমা আইন।

প্রসঙ্গত জানাই, Medical Council of India (Regulation 2002) এর 2 নং ধারা অনুযায়ী কোনো অবস্থাতেই কোনো মুমূর্ষু রোগীকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্মনিরপেক্ষতা

-অভিষেক দে

ধর্মনিরপেক্ষতা' বা Secularism শব্দটা নিয়ে রয়েছে প্রচুর বিভ্রান্তি, সঙ্গে হয়েছে বিকৃতিও। এই শব্দটির উৎপত্তি ইউরোপে। 'Secularism' এর আভিধানিক অর্থ - "An ism does not related with religion and non-entity to any supernatural existence"। অর্থাৎ ধর্মের এবং অলৌকিকতার সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্কিত নয় এমন একটি মতবাদ হল ধর্মনিরপেক্ষতা। নিরপেক্ষ অর্থাৎ কোনো অথবা কারোর পক্ষেই নয়। ধর্মনিরপেক্ষ মানে সর্বধর্মসমন্বয় নয়, এর অর্থ রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পক্ষেই থাকবেনা, বরং সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই থাকবে নিরপেক্ষ বা সম্পর্ক বর্জিত। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না। কাউকে ধর্ম পালনে বাধ্য করা হবে না। সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। আবার উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে- "The separation of religion and state is the foundation of secularism. It ensures religious groups don't interfere in affairs of state, and the state doesn't interfere in religious affairs."

ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি থেকে চালু হয় যার মূলে ছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর মহাশয়। ১৯৭৬-সালের ১১ নভেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট অনুমোদিত এবং ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে 'Secular' শব্দটা যুক্ত করা হয় কোনোরকম সংজ্ঞা ছাড়াই। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি- "With the Forty-second Amendment of the Constitution of India enacted in 1976, the Preamble to the Constitution asserted that India is a secular nation. However, the Supreme Court of India in the 1994 case S. R. Bommai v. Union of India established the fact that India was secular since the formation of the republic."

ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদে ' ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) শব্দটি ব্যবহার করে সে খানে লেখা হয়েছে -

"We The People Of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens; "। অর্থাৎ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হল সংবিধানের মৌলিক নীতি। আবার, প্রতিটি নাগরিকদের কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ রয়েছে, বিজ্ঞানমনস্কতা, মনুষ্যত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সাধনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো। "It shall be duty of every citizen of India to develop the scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform.{Article 51A(h)"।

ভারত রাষ্টের সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part- iii) ১২-৩৫ নং ধারায় মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। এই মৌলিক অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। সংবিধানে নাগরিকদের ছয়টি (৬) মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of Indian Constitution)
দেওয়া হয়েছে। যেমন -

(১) সাম্যের অধিকার,

(২) স্বাধীনতার অধিকার,

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার,

(৪) ধর্মীয় অধিকার,

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার,

(৬) শাষনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

আমজনতার বৃহৎ অংশ 'ধর্ম' বলতে উপাসনা / প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ বলতে উপাসনাধর্ম বিষয়ক বই-পত্র কেই বোঝেন। অভিধানে 'ধর্ম' বা 'রিলিজিয়ন' (Religion) শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে –

(১) ধর্ম মানে - সাম্প্রদায়িক, ঈশ্বর উপাসনা, রীতি-নীতি, ঈশ্বর এবং পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস। যেমন -হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম ইত্যাদি ৪২০০ প্রকার।

(২) Religion [রিলি'জন]n. ধর্ম: human recognition of a personal God entitled to obedience.. আবার।

(৩) ধর্ম মানে - গুণ (Property) বৈশিষ্ট (Characteristic)। যেমন - আগুনের ধর্ম বা গুণ দহন, জলের ধর্ম বা গুণ তরলতা, তরোয়াল এর ধর্ম বা গুণ তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি। ধর্মবিশ্বাস; any system of faith and worship বোঝায়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট ভাবে লেখা রয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি হবে সম্পূর্ণ ধর্ম বর্জিত। রাষ্ট্রনায়কগণ কোনভাবেই প্রকাশ্যে ধর্ম-আচরণ করতে পারবেন না। অনেকেই অনেকেই হয়তো জানেন না, এই শর্তকে লঙ্ঘন করলে অর্থাৎ রাজনীতি বা ভোটব্যঙ্কের স্বার্থে কোনো নেতামন্ত্রীরা প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ করে অ-ধর্মনিরপেক্ষ কাজকর্মের সাথে জড়িয়ে থাকলে সংবিধানের "দ্য রিপ্রেজেন্টেসন অফ পিপলস অ্যাক্ট ১৯৫১" (অ্যামেন্ডমেন্ট ১৯৮৯) এর ২৯ক ধারায় ঐ নেতামন্ত্রী কিংবা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দলটির স্বীকৃতি খারিজ করার বিধান রয়েছে নির্বাচন কমিশনের হাতে। অন্যদিকে, ৩রা জানুয়ারি, ২০১৭ সালে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে ভোট চাওয়া বা ভোট না দিতে প্ররোচিত করাকে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ বলেই রায় দিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির বেঞ্চে চার জন বিচারপতি এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, কেবল প্রার্থী নয়, ভোটারদের ধর্ম-বর্ণের ধুয়ো তুলেও প্রচার করা যাবে না। এছাড়া, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৩(৩) ধারায় ধর্ম, জাতি, ভাষা, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া অবশ্য এমনিতেই নিষিদ্ধ। শীর্ষ আদালত বলেছে— কেবল প্রার্থী নয়, প্রচারে আনা যাবে না ভোটারদের ধর্ম, জাতি, ভাষার কথাও। এমনকী প্রার্থীর এজেন্টের সামাজিক পরিচয়ের জোরেও ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা যাবে না।

ভারতীয় যেহেতু প্রতিটি মানুষকেই ধর্মীয় অধিকার দিয়েছে (২৫-২৮ ধারায়) তাই কেউ যেমন ব্যক্তিগত ধর্মচারণ করতে পারেন, তেমনই কেউ ধর্মহীন ভাবে জীবনে এগিয়ে চলতে পারেন (২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তে বোম্বে হাইকোর্ট একটি রায় এ স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে, "State can compel none to declare or specify his/her religion. Citizens have Constitutional Right to belong to 'No Religion." অর্থাৎ, রাষ্ট্র কাউকে তার ধর্ম জানাতে বাধ্য করতে পারবে না। তিনি কোনও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নন বা কোনও ধর্ম পালন করেন না -- এই দাবী করার সাংবিধানিক অধিকার আছে প্রত্যেক নাগরিকের)।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সাধারন মানুষ থেকে রাষ্ট্রনায়কগণ প্রকাশ্যে নয়, তবে ব্যাক্তিগত ভাবে ভাবে ধর্মাচরণ করতে পারেন। সংবিধানের এই কথাটা কে গ্রাহ্য করেন না কোনো রাষ্ট্রনেতাই। তাই তো,

ভোটনির্ভর বা গোদীলোভী রাজনৈতিক দল কেউই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার আসল চেহারাটা প্রকাশ করেন না নিজেদের রাজনীতির স্বার্থেই। ওরা ধর্মেও আছে, জিরাফেও আছে। ঝোলে- ঝালে- অম্বলে সবেতেই আছে। আসলে ভোটব্যাঙ্ক এর স্বার্থে কেউই আমজনতার তথাকথিত "ধর্মবিশ্বাস" কে আঘাত করতে চান না। ধর্ম শুধুমাত্র ঠিকে আছে শাষকগোষ্ঠি এবং তাঁদের চালিকাশক্তি পুঁজিপতিদের জন্যেই। শোষিত, বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকারের দাবীর জন্য সংগ্রাম কিংবা ক্ষোভের আগুনে জল ঢ্যালাতে আজ তাই "ধর্ম" হচ্ছে এক সুন্দর কার্যকর অস্ত্র। কারণ রাষ্ট্রশক্তি ভালো করেই জানেন ধর্ম নামক মারাত্মক আফিমের নেশায় ডুবে থাকা জনগণ কোনো প্রশ্নই তোলেন না, উলটে যুক্তি-বুদ্ধি সব বাক্সবন্দি করে রাষ্ট্রশক্তির হ্যাঁ তে 'হ্যাঁ' এবং না তে 'না' মেলায় শেখানো তোঁতাপাখির মতন। এইমূহূর্তে সেই গল্পটা মনে পরছে যেখানে পথচলতি একজন ব্যাক্তিকে একজন মাতাল প্রশ্ন করছে, "দাদা

একটু ধর্ম হবে, বিড়ি জ্বালাবো? ব্যাক্তিটির অবাক হয়ে পালটা প্রশ্নের উত্তরে মাতাল টি জানায়, আরে দাদা ধর্ম দিয়ে তো দেশ জ্বলছে আর সামান্য একটা বিড়ি জ্বলবে না।" এটাই কিন্তু বাস্তব চিত্র।

এক শ্রেণীর ধান্দাবাজ রাজনৈতিক ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মগজধোলাই এর কল্যাণে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষবা Secular শব্দটির অর্থ - ধর্মের ক্ষেত্রে এক খাবলা নিরপেক্ষতা, দু-খাবলা পক্ষপাতিত্ব মিলিয়ে এক বিচিত্র স্ববিরোধীতার খিঁচুড়ি এবং সংবিধান রাস্তার পরে ধুলোয় খায় লুটোপুটি।

একটি রাষ্ট্রকে প্রকৃতঅর্থে ধর্মনিরপেক্ষ বা Secular গড়ে তোলা খুব সহজও নয় আবার খুব যে কঠিন তেমনও নয়। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা। ভারতীয় জনতা পার্টির দাবী, পৃথিবীতে যদি ৫৫ টি মুসলিম রাষ্ট্র থাকতে পারে তাহলে ভারত কেন ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে? তাই, সংবিধানে সংশোধনী বিল এনে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটিকে বাতিল করে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাতেই হবে। যারা এমন দাবী তোলেন তাঁরা এটা হয়তো ভুলে থাকতে চায়, একটি রাষ্ট্র, হিন্দু, ইসলাম কিংবা খ্রিষ্টান যাই হোক, সেখানে আমজনতা কি দারুন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছেন? বেকারত্ব কি মুছে গেছে কিংবা জাত-পাত বিভেদ কিংবা ধনী- গরিবের বিভেদ কি আদৌ দূর হয়েছে?

পাকিস্তানের কথাই ভাবুন। সেখানকার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। শেখানে একশ্রেণীর মানুষ স্বাচ্ছন্দে থাকলেও একটা বড় অংশের মানুষই গরিব। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে আজপর্যন্ত কোনো নেতা-মন্ত্রী পারেন নি পাকিস্তান কে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিনত করতে এবং দেশের চিত্রটাকে আমূল বদলে দিতে। ১৯৭১ এর পর থেকে বাংলাদেশ কে ইসলামিক রাষ্ট্রে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে কৌশলে। সরকারেরও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় রয়েছে এই কাজে। খোঁজ নিলেই দেখা যাবে ওপার বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে খুবই দুর্বল এবং বেকারত্বের হারও উর্ধমুখি।

আজ থেকে বহুবছর আগে শ্রদ্ধেয় কবিগুরু তাঁর লেখার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন - "দেশ মাটিতে নয়, মানুষে গড়ে ওঠে। দেশপ্রেম মানে দেশের মাটিকে ছুঁয়ে শপথ নেওয়া কিংবা একটা মানচিত্র কে ভালোবাসাও নয়। দেশপ্রেমের অর্থ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, নিরন্ন, বিপন্ন মানুষের প্রতি প্রেম।"

মোরা তোমাদেরই লোক, গরিবি হটাও ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে এইসব গরিবগুর্ব মানুষের প্রতি মিথ্যে প্রেম দেখিয়ে রাষ্ট্র কে ধর্মের মোড়কে মুড়ে ফেললেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? না, কোনদিনই হবে না, হতে পারেও না। একটি রাষ্ট্র কে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ গড়ে তুলতে গেলে যা করতে হবে তার একটা রুপরেখা তুলে ধরলাম।

১- রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি, রাজনীতি ধর্মবর্জিত করতে হবে। সরকারি কিংবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় নেতার জীবনী পাঠ, ধর্মীয় শ্লোগান, পঠন-পাঠনে ধর্মীয় নেতাদের জীবনী এবং প্রতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনা বৃদ্ধিকারী বিষয় অন্তর্ভুক্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।
সংবিধানের ২৮ নং ধারায় ভারত রাষ্ট্রের "ধর্মনিরপেক্ষ" চরিত্রের প্রতিফলন আছে। এতে বলা হয়েছে-

ক) সম্পূর্ণভাবে সরকারী অর্থে পরিচালিত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া চলবে না।

খ) ১ নং উপধারায় বর্ণিত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোন ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্থাপিত হয়েও যদি সরকার দ্বারা পরিচালিত বা প্রশাসিত হয় তবে নিজস্ব মতে ধর্মশিক্ষা দিতে পারবে না।

গ) নিজের ইচ্ছা না থাকলে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে কোন শিক্ষাপ্রার্থীকে সরকারী অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা বা নির্দেশনামা গ্রহনে বাধ্য করা যাবে না।

২- আমজনতার দেওয়া করের টাকায় হজ যাত্রা,ইমাম কিংবা পুরোহিত ভাতা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

৩- যেহেতু, সংবিধানগতভাবে শুধু পদাধিকারী নন, কোনও দলও প্রকাশ্যে ধর্মীয় আচরণ করতে পারেন না সেইজন্য এ-বিষয়ে কঠোর ভাবে নজর রাখতে হবে।
৪- Secularism শব্দটার বিকৃত নয়, বরং প্রকত অর্থ টা ঠিক কি সেটা আমজনতাকে বোঝাতে সর্বধর্মসমন্বয়ের গালগল্প ছেড়ে বাস্তব সংজ্ঞাটাকে গ্রহণ করতে হবে।

৫- উৎসবের অযুহাত দেখিয়ে কোনো নেতা-মন্ত্রীর প্রকাশ্যে কোনো পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন, ইফতার পার্টি কিংবা অন্যকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ায় কঠোর হতে হবে।
৬- ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরিহ পশুদের হত্যা নিষিদ্ধ করতে হবে। কেউ প্রকাশ্যে পশুবলি বা কুরবানি দিচ্ছে জানতে পারলে সেই ব্যাক্তিকে "দ্য ক্রুয়েলটি টু এনিম্যাল অ্যাক্ট ১৯৬৯" অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে কিংবা এই বিষয়ে সচেতন করতে কোনো পন্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭- সরকারি অর্থ অর্থাৎ আমজনতার দেওয়া Tax এর টাকায়, সমস্ত প্রকার ধর্মীয় অনুষ্টান বন্ধ করতে হবে এবং পুলিশ লাইনে কোন উপাসনালয় তৈরী হওয়া আটকাতে হবে। দুরদর্শনের মতন সরকারি প্রচার মাধ্যমে ধর্মীয় প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।
৮- সরকারি অথবা বে-সরকারি আবেদনপত্রে কোনও ব্যাক্তির Religion এবং Cast জানতে চাওয়া চলবে না। যারা নাস্তিক অথবা ধর্মহীন তারা যেমন সরকারি বা বে-সরকারি ফর্মের Religion কলামে HUMANISM, ATHEISM ইত্যাদি লেখেন তেমন লিখতে পারার অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, এপ্রিল ২০২১ এ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে -"১৮ বছরের বেশি বয়সী যে কোনো ভারতীয় নাগরিক তার ইচ্ছামতো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে বলে সংবিধানে অধিকার দেয়া রয়েছে"।
৯- কোনো রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক কাজের সাথে জড়িত থাকলে অথবা সাম্প্রদায়িক, বিদ্বেষমূলক, উস্কানিমূলক বক্তব্যে রাখলে ১৯৫১ সালের রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল (এমেন্ডমেন্ট ১৯৮৯) অ্যাক্ট এর ২৯ (এ) ধারা মতে সেই রাজনৈতিক নেতার কিংবা পুরো দলের স্বীকৃতি খারিজ করতে হবে।
১০- বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন এর যায়গায়, বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে, স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্তপ্রকার ধর্মীয় আলোচনা, ধর্মগুরুদের জীবনীপাঠ এবং অবৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রচার কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। সংবিধান স্বীকৃত বিজ্ঞানমনষ্কতার প্রচার এবং প্রসারে রাষ্ট্র যদি ব্যার্থ হয়,তাহলে কোনো ব্যাক্তি কিংবা সংগঠনের এই কাজে কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না রাষ্ট্র সেদিকে নজর দিতে হবে।
প্রিয় পাঠক, একবার গভীরভাবে ভাবুন তো, ওপরের ১০ টি পয়েন্ট কি খুবই কঠিন নাকি খুবই সহজ? অপ্রিয় সত্যি এটাই যে, রাষ্ট্রশক্তি চাইলে আমজনতাকে মুক্তমনা, বিজ্ঞানমনষ্ক গড়ে তুলতেই পারে। কিন্তু কেন করেনা জানেন, কারণ রাষ্ট্র বেশ ভালো মতই জানে যারা অন্ধবিশ্বাস, ভাববাদ, ঈশ্বরবাদ ইত্যাদিকে আকঁড়ে ধরে থাকেন তাঁরা কোনদিনই শোষণমুক্তির কথা চিন্তাতেই আনে না। সেবা দিয়ে যেমন শোষণমুক্তি ঘটানো সম্ভব নয়, তেমনই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ, নেতৃত্বহীন জনগণ কোন প্রশ্নই তোলে না। আর এভাবেই শাষণ -শোষণ- তোষণের রাজনীতি করে, আমজনতাকে ধর্মের নেশায় ডুবিয়ে রেখে বিদেশের সুইসব্যাঙ্ক ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। আমজনতার বৃহত্তর অংশ যদি নিজেদের ন্যায্য অধিকারের দাবীতে সরব হয় তাহলে শোষণ প্রক্রিয়াটাই ব্যাহত হয়।
ধর্মনিরপেক্ষতা মানে মন্দির-মসজিদ-গীর্জা - গুরুদ্বার -গুম্ফায় গিয়ে প্রকাশ্যে ধর্মচারণ এবং প্রচারমাধ্যমে সেসব ফলাও করে প্রচার করা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে প্রকাশ্য রাজপথে বিফ খেয়ে কতটা ধর্ম -নিরপেক্ষ প্রমাণ করাও নয়, এটা তখনই ভালো যখন দুই ধর্মের মানুষকে নিয়ে বিফ এবং পর্ক দুটোই একসাথে খাওয়া অথবা কে বিফ খেলো, কে পর্ক খেলো সেসব না দেখে, কে সারাদিন অভুক্ত রইলো সেদিকে বেশি নজর দেওয়া। সর্বধর্মসমন্বয়ের গল্পো শুনিয়ে ধর্মের নামে বিদ্বেষ,হিংসা টাও ভণ্ডামি, তাই ধর্মনিরপেক্ষ মানে দুদুও খাবো আবার তামুকও খাবো, কিংবা ধর্মে ও জিরাফে একত্রে সহাবস্থানও নয়। ধূলো জমে থাকা ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রয়োগ করতে আন্তরিক হলে ভণ্ডামো ছেড়ে এই শব্দটাকে সংবিধানের পাতা থেকে তুলে এনে বাস্তবের মাটিতে প্রয়োগ করতেই

হবে, এর কোনও বিকল্প নেই। Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষর প্রকৃত সংজ্ঞাটা এসে যদি বিকৃত হওয়া সংজ্ঞাটা তার চরিত্র হারায় এবং কেউ আন্তরিকভাবে এর প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন তাহলেই এই লেখা স্বার্থক।

ডিভোর্স ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

-সৌরাষ্ট্র দাশ

(প্রথমেই বলতে চাই আমার এই লেখা বিবাহ-বিচ্ছেদ এর পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। এই লেখার মাধ্যমে এটাই বোঝার চেষ্টা করবো যে Divorce-এর আইনি পদ্ধতি এবং ডিভোর্স পদ্ধতি নিয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করেছি। এই লেখার মাধ্যমে কোনো ধর্ম-কে অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। লেখাটি সম্পূর্ণ তথ্য অনলাইন আইনগত ওয়েবসাইট তথা সংবাদ পত্রিকা ও YouTube থেকে প্রাপ্ত।)

বিবাহ-বিচ্ছেদ যে'কোনো দম্পতির জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। এর সাথে যোগ করার জন্য, বিবাহবিচ্ছেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে এটি ভারতে দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার হতে পারে। এমনকি যে দম্পতিরা পারস্পরিকভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হন, তাদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে আদালত তাদের আবেদন বিবেচনা করার আগে তারা এক বছরের জন্য আলাদা ছিল। এই বিষয় নিশ্চয়ই আপনারা অবগত।

ভারতে, বেশিরভাগ ব্যক্তিগত বিষয়গুলির মতো, বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মগুলি ধর্মের সাথে যুক্ত। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ এবং জৈনদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু বিবাহ আইন, 1955 দ্বারা, মুসলমানদের মুসলিম বিবাহ আইন, 1939 দ্বারা, পার্সি বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন, 1936 দ্বারা এবং খ্রিস্টানদের ভারতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন, 1869 দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত নাগরিক এবং আন্তঃ-সম্প্রদায়িক বিবাহ বিশেষ বিবাহ আইন, 1956 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিবাহবিচ্ছেদ আইন কিছু শর্তের সাথে কাজ করে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে নয়। [1]

একজন পত্নী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ করার আগে অন্য পত্নীকে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আইনি নোটিশ দিতে শুরু করতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনের ধরন রয়েছে এবং আপনি এতদ্বারা, ভারতে কীভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পাবেন তার পদ্ধতিগুলি বুঝতে পারবেন। ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া, ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম এবং ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনগুলি একটু জটিল। আপনি প্রয়োজন হলে উকিল বা আইন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন।

Divorce পিটিশনের ধরন

একটি দম্পতি পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ পেতে পারে, অথবা স্বামী/স্ত্রী উভয়ের সম্মতি ছাড়াই বিবাহবিচ্ছেদের জন্য ফাইল করতে পারে।

পারস্পরিক সম্মতিতে Divorce: [2]

যখন স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হন, তখন আদালত পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ বিবেচনা করবে। আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য, তবে, দম্পতিকে এক বা দুই বছরের বেশি সময় ধরে আলাদা থাকতে হবে (প্রাসঙ্গিক আইন অনুসারে) এবং তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন যে তারা একসাথে থাকতে পারেনি। প্রায়ই, এমনকি যখন স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই অনিচ্ছুক হন, তবুও তারা এই ধরনের বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হন কারণ এটি তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো আঘাতমূলক নয়। শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্পত্তির অধিকারের মতো বিষয়গুলি পারস্পরিকভাবে সম্মত হতে পারে।

How Does Mutual Divorce Work? [3]

তিনটি দিক আছে যেগুলো নিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হয়। একটি হল ভরণপোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা। আইন অনুসারে, সমর্থনের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ সীমা নেই। এটি যে কোনও চিত্র বা কোনও চিত্র হতে পারে। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হল সন্তানের হেফাজত। এটি অবশ্যই পক্ষগুলির মধ্যে কাজ করা উচিত, কারণ এটি অবশ্যম্ভাবীভাবে পারস্পরিক সম্মতি ছাড়াই বিবাহ-বিচ্ছেদে সর্বাধিক সময়ের প্রয়োজন। পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদে সন্তানের হেফাজতও স্বামীদের বোঝাপড়ার

উপর নির্ভর করে ভাগ বা যৌথ বা একচেটিয়া হতে পারে। তৃতীয়টি হল সম্পত্তি। স্বামী-স্ত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কে সম্পত্তির কোন অংশ পাবে। এর মধ্যে স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডানদিকে, সবকিছু ভাগ করা আবশ্যক। এটি ন্যায্য হওয়ার জন্য এটি প্রয়োজনীয় নয়, যতক্ষণ না এটি উভয় পক্ষের দ্বারা সম্মত হয়।

ধারা কী বলে?

আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে! পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের সময়কাল 6 থেকে 18 মাসের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। সাধারণত, আদালত পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ শীঘ্রই শেষ করতে পছন্দ করে, বরং পরে। হিন্দু বিবাহ আইন, 1955 এর 13 বি এবং বিশেষ বিবাহ আইন, 1954 এর ধারা 28 অনুসারে, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করার আগে দম্পতিকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য আলাদাভাবে বসবাস করতে হবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন, 1869-এর 10এ ধারায় অবশ্য দম্পতিকে কমপক্ষে দুই বছরের জন্য আলাদা থাকতে হবে। মনে রাখবেন যে আলাদাভাবে বসবাস করার অর্থ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করা আবশ্যক নয়, দম্পতি শুধুমাত্র এই সময়ের মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছেন না যে প্রদান করতে হবে। মুম্বাই [4] এবং কলকাতা [5] পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ কীভাবে করা যায় তা জানুন।

পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ:

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে যার ভিত্তিতে আবেদন করা যেতে পারে। এটা এমন নয় যে একজন স্বামী বা স্ত্রী কোনো কারণ ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কারণগুলো নিম্নরূপ, যদিও কিছু

1. নিষ্ঠুরতা

নিষ্ঠুরতা শারীরিক বা মানসিক নিষ্ঠুরতা হতে পারে। ভারতের হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইন অনুসারে, যদি একজন পত্নীর মনে যুক্তিসঙ্গত আশংকা থাকে যে অন্য পত্নীর আচরণ ক্ষতিকারক বা ক্ষতিকারক হতে পারে, তাহলে স্বামী/স্ত্রীর দ্বারা নিষ্ঠুরতার কারণে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়ার পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

2. Adultery

ভারতে, একজন পুরুষ যে Adultery করে! (অর্থাৎ বিবাহের বাইরে সম্মতিক্রমে যৌন মিলন করেছে) তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে অভিযোগ আনা যেতে পারে না। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত যে ভারতে পরকীয়া অপরাধ নয়। [6] তবে স্ত্রী অবশ্যই দেওয়ানী প্রতিকার হিসেবে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে। অন্যদিকে, যদি একজন স্ত্রী Adultery করে, তবে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা যাবে না, এই আইন আগের থেকে ছিল। যেটা এখন দুইপক্ষ মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে।

3. পরিত্যাগ

একজন পত্নী যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অন্যকে ত্যাগ করা (উদাহরণস্বরূপ নিষ্ঠুরতা) বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি কারণ। তবে, যে পত্নী অপরকে পরিত্যাগ করবে তার মরুভূমিতে যেতে হবে এবং তার প্রমাণ থাকতে হবে। হিন্দু আইন অনুসারে, ত্যাগ কমপক্ষে দুই বছর স্থায়ী হওয়া উচিত ছিল। খ্রিস্টানরা অবশ্য শুধুমাত্র এই কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে না।

4. রূপান্তর

একজন স্বামী/স্ত্রী অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। এই কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ দায়ের করার আগে কোন সময় অতিবাহিত করার প্রয়োজন হয় না।

এই বিষয় পশ্চিমবঙ্গের গায়ক কবীর সুমনের ব্যক্তিগত জীবনের উপর নজর দিতে পারেন। তবে এই বার বার ধর্ম পরিবর্তন করে বিয়ে করা অপরাধ না হলেও শিক্ষিত তথা সভ্য সমাজের জন্য অসম্মান জনক" এবং এর ফলে যদি তাদের সন্তান থেকে তাকে তাহলে স্বামী/স্ত্রীর ভূমিকা কি? এটা নিয়েও প্রশ্ন হতে পারে। [7]

5. মানসিক ব্যাধি

যদি স্বামী/স্ত্রী মানসিক অসুস্থতার কারণে বিবাহে প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহলে বিবাহবিচ্ছেদ চাওয়া যেতে পারে। মানসিক অসুস্থতা এতটাই বেড়ে যায় যে বিবাহিত জীবনের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা যায় না।

6. সংক্রামক রোগ

যদি পত্নী একটি সংক্রামক রোগে ভোগেন, যেমন এইচআইভি/এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া বা কুষ্ঠ রোগের একটি মারাত্মক এবং দুরারোগ্য রূপ, ভারতে হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন বলে যে অন্য পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ পেতে পারে। স্বামীর জন্য কোনো নিয়ম নেই।

7. বিশ্বের ত্যাগ / বা সন্ন্যাস

যদি পত্নী তার বিবাহিত জীবন ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহলে সংক্ষুব্ধ পত্নী বিবাহবিচ্ছেদ পেতে পারেন।

8. মৃত্যুর অনুমান

যদি স্বামী/স্ত্রীকে কমপক্ষে সাত বছর ধরে জীবিত থাকার কথা শোনা না হয়, এমন ব্যক্তিদের দ্বারা যারা এই ধরনের পত্নীর সম্পর্কে শুনেছেন, যদি তিনি বা তিনি বেঁচে থাকেন, তাহলে যে পত্নী জীবিত আছেন তিনি একটি বিচারিক ডিক্রি পেতে পারেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ

আপনি ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদের ধরন [8] ভারতে বিবাহবিচ্ছেদের আইন, ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম, ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদের নতুন নিয়ম [9] ভারতে মুসলিম বিবাহ আইন, [10] দিল্লি এবং কলকাতায় [11] পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ [12] এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারেন।

বিবাহবিচ্ছেদের বিজ্ঞপ্তি:

কিছু করার আগে, আপনার পত্নীকে বিবাহ-বিচ্ছেদের নোটিশ দিতে আপনার সচেতন হওয়া উচিত। এটি আবেগগুলিকে স্পষ্ট করতে এবং সম্পর্কটি বন্ধ করার বিষয়ে আপনার চিন্তাভাবনা শুরু করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য একটি আইনি নোটিশ অন্য পত্নীকে ভবিষ্যতের সম্পর্কের বিষয়ে স্পষ্টতা এনে দেবে যা আপনি রাখতে চান।

একজন পত্নী বিবাহের সম্পর্ককে কভার করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তার/তার অভিপ্রায় জানাতে অন্য পত্নীকে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য একটি আইনি নোটিশ পাঠাতে পারেন। এটি একটি আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ যা 'স্বামী এবং স্ত্রী' সংযোগ ভাঙার প্রথম পদক্ষেপ।

যে উপাদানগুলি ভরণপোষণের সময়কাল এবং পরিমাণকে প্রভাবিত করে:

একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, ভরণপোষণ, তার পরিমাণ এবং মেয়াদ, বিবাহের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। বিবাহের এক দশক পরে বিবাহবিচ্ছেদ স্বামী/স্ত্রীকে আজীবন ভরণপোষণের অধিকারী করে। অন্যান্য অপরিহার্য কারণ হল:

1. পত্নীর বয়স (অথবা যে ব্যক্তিকে ভরণপোষণ পাওয়া উচিত)
2. অর্থনৈতিক অবস্থা বা যে ব্যক্তিকে ভরণপোষণ প্রদান করতে হবে তার উপার্জন
3. উভয় পত্নীর স্বাস্থ্য (ব্যর্থ স্বাস্থ্য বা চিকিৎসার অবস্থা স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে একজন যে ভরণপোষণ পেতে চলেছেন তারা তার পক্ষে কাজ করতে পারেন। তারা তাদের স্বাস্থ্যহীনতার ভিত্তিতে একটি বড় ভরণপোষণ দাবি করতে পারেন)।
4. যে পত্নী সন্তানের হেফাজতে রাখে সে হয় কম ভোক্তা প্রদান করবে বা শিশুটি নাবালক থাকাকালীন একটি বড় পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় কিভাবে নিষ্পত্তি করবেন?

আপনি বা আপনার পত্নী সম্পত্তির মালিক কিনা তা খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন - বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন দায়ের করা হয়েছে তা নির্বিশেষে - আপনার সম্পত্তি দখল করার অধিকার রয়েছে। আপনি যদি বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন তবে মামলাটি আরও শক্তিশালী। যদিও সম্পত্তিটি বিবাহ-বিচ্ছেদের নিষ্পত্তিতে একজন বা অন্য পত্নীকে মঞ্জুর করা যেতে পারে, যতক্ষণ না এটি করা হয়, উভয় পত্নীর সম্পত্তিতে থাকার অধিকার রয়েছে।

সন্তানের হেফাজত সম্পর্কে কি?

অনেকে ধরে নেন যে মা সবসময় তার সন্তানদের হেফাজত পান। এই ক্ষেত্রে না হয়. যদিও আদালত সাধারণত পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পিতামাতার সিদ্ধান্তে সম্মত হন, আদালত সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থের দিকে নজর দেবে। একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, আদালত সন্তানের পিতা বা মাতা হওয়ার ক্ষমতা পরীক্ষা করবে, উদাহরণস্বরূপ। আপনি বিবেচনায় টাকা নিতে পারবেন না. সাধারণত, আদালত তাদের সন্তানদের হেফাজত করে অ-কর্মজীবী মায়েদের কাছে, তবে পিতারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন বলে আশা করা হয়।

বিবাহবিচ্ছেদ পেতে কত খরচ হয়?

বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আদালতের ফি কম, খরচ প্রধানত ফি আপনি আপনার আইনজীবী প্রদান! আদালতে হাজিরা এবং অন্য কোনো কাজ করার জন্য আইনজীবীদের ফি নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এটি কতটা নিবিড়ভাবে কাজ করে তার উপর নির্ভর করে, তাই এটির দাম কম হতে পারে দশ হাজার থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত।

তথ্যসূত্রঃ

1 || https://indiankanoon.org/search/?formInput=Marriage+and+Divorce
2 || https://youtu.be/Y6vIXZ-WpEs
3 || https://indiankanoon.org/search/?formInput=How+Does+Mutual+Divorce+Work%3F
4|| https://indiankanoon.org/search/?formInput=How+To+Get+A+Mutual+Consent+Divorce+In+Mumbai%3F
5 || https://indiankanoon.org/search/?formInput=How+To+Get+A+Mutual+Consent+Divorce+In+Kolkata+
6 || https://www.bbc.com/bengali/news-45667250
7 || https://bangla.asianetnews.com/west-bengal/how-many-times-kabir-suman-changed-religion-does-islam-accept-his-actions-r6h2ta
8 || https://www.legalserviceindia.com/article/l393-Divorce-under-Muslim-Law.html#:~:text=Under%20Muslim%20law%20the%20divorce,to%20the%20status%20of%20marriage.
9 || https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/6-581-5985?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)#:~:text=The%20only%20requirement%20for%20divorce,a%20period%20of%20one%20year.
10 || https://indiankanoon.org/search/?formInput=Muslim+Marriage+Law+In+India%3A+Formalities%2C+Polygamy%2C+Divorce%2C+Remarriage
11 || https://lawrato.com/divorce-legal-advice/divorce-by-mutual-consent-in-kolkata-119765
12 || https://indiankanoon.org/search/?formInput=Divorce+Without+Mutual+Consent+In+Delhi

"অযোগ্য শাসনকর্তার মতো দেশ ও জাতির বড় ক্ষতি আর কেউ করতে পারে না।"

-এরিস্টটল

ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের সেকাল ও একাল

-দ্বৈপায়ণ ঘোষ

Wildlife (Protection) Act, 1972 বা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ তর্কাতীত ভাবে এই পৃথিবীর এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণ আইন। এই নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ নামক ভৌগলিক ভূখণ্ডের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা শুরু করলে প্রেক্ষিত বুঝতে খানিকটা সুবিধা হবে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, আর্যদের আগমন ইত্যাদির সময়ের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্য নিদর্শনে বন্যপ্রাণ ও গৃহপালিত প্রাণীদের সাথে মানুষের সম্পর্কের ও সহাবস্থানের প্রমাণ পাই। কিন্তু সেগুলোকে আইনের প্রামাণ্য দলিল বলা যায় না। আমরা প্রথম এই ধরণের নথিবদ্ধ আইন পাই মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়। এই সংরক্ষণের মূল কারণ অবশ্যই আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক। মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় থেকেই ভারত ভূখণ্ডের একটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। সাথে সাথে তার সৈন্য বাহিনীও শক্তিশালী হতে থাকে। ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্রের সাথে সাথে এই সময় থেকে যুদ্ধে হাতির ব্যবহার জনপ্রিয় হতে থাকে। হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই হাতিকে গৃহপালিত করার ব্যবস্থা চালু থাকলেও মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় থেকেই যুদ্ধে হাতির ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। আর সেই বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তাই সাম্রাজ্যের জন্য হাতির নিরন্তর যোগান অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই যোগান অক্ষুণ্ণ রাখতেই অশোকের শাসনকালে হাতি ও হাতির জন্য সংরক্ষণের আইন প্রণীত হয়, যেখানে মৌর্য সাম্রাজ্যে আটটা সংরক্ষিত ও চিহ্নিত হস্তি-বন বা আধুনিক পরিভাষায় Elephant Sanctuaryর উল্লেখ ছিল। বন্য হাতির ক্ষতি করলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। এমনকি প্রাকৃতিক কারণে মৃত হাতিদের দাঁত সরকারের কাছে সমর্পণ করার আইনও ছিল, যা আধুনিক WPA, 1972 এরও বিধান। পরবর্তীতে মুঘল সাম্রাজ্যের কালে বন্যপ্রাণ নিয়ে মিশ্র সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময় শিকারকে বাদশাহি আদব কায়দার অংশ হিসেবে অনেক সময় প্রাধান্য দেওয়া হলেও বিশেষ বিশেষ সময় বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে শিকার নিষিদ্ধ করা হত।



মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথা ধরেই ব্রিটিশ ভারতের শুরুর থেকেই ব্রিটিশ ও দেশীয় শাসকদের মধ্যেও শিকার ছিল আভিজাত্যের আবশ্যিক প্রতীক। আজ ভারতের অনেক সংরক্ষিত বনাঞ্চলই সেই সময়ের কোনো না কোনো দেশীয় শাসকের ব্যক্তিগত শিকার খেলার জায়গা, বান্ধবগড়ের জঙ্গল যেমন ছিল রেবার রাজপরিবারের শিকার ভূমি, গিরের জঙ্গল সেই রকমই জুনাগড়ের নবাবদের খেলার জায়গা। শিকার সেই সময় শাসক ও অভিজাতদের মধ্যে কতটা জনপ্রিয়তা লাভ করে, তা বুঝতে আমাদের কয়েকটা তথ্যই যথেষ্ট। বিংশ শতকের গোরায় ভারতের জঙ্গলে আনুমানিক এক লাখ বাঘ ছিল, ১৯৭৩ সালে প্রজেক্ট টাইগার শুরু হওয়ার সময়ের গণনায় তা কমে দাঁড়িয়েছিল তিন হাজারের মত। শিকারের ব্যাপকতা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫, এই ৫০ বছরে শুধুমাত্র ভারতবর্ষে কম করে ৮০ হাজার বাঘ শিকার করা হয়। ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ দশ দিনে ৩৯টি বাঘ শিকার করেন। কর্নেল জফ্রে নাইটিঙ্গল ভারতবর্ষে প্রায় ৩০০ বাঘ শিকার করেছিলেন। দেশীয় রাজ-পরিবারগুলোও বিদেশী শাসকদের থেকে এই প্রশ্নে পিছিয়ে ছিলনা। রেবার রাজা নিজে মধ্য ভারতে ১০৯টা বাঘ শিকারের নজির রেখেছেন। শুধু বাঘ নয়, শিকারের ফলে আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে শেষ টিকে থাকা সিংহের সংখ্যাও কমতে কমতে গিরের জঙ্গলে ২০টায় এসে দাঁড়ায়। সরকারি হিসেবে ১৮২০ থেকে ১৮৭০ এর মধ্যে গুজরাটে ১৫০০ এর বেশি সিংহ শিকার করা হয়। সেই অবস্থায় ভারতের শাসক ও অভিজাতদের একাংশ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে চিন্তিত হয়। ১৮৭৯ সালের ১০ই মে জুনাগড়ের নবাব মহব্বত খানজি দ্বিতীয় গিরের জঙ্গলে সিংহের শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়, যা ছিল আধুনিক ভারতের প্রথম বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন। এর আগেও ১৮৫৫ সালের ভারীয় ফরেস্ট চার্টার, ১৮৬৫ সালের ভারতীয় বন আইন, ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বন আইনও কখনোই সেই অর্থে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের কথা বলা হয়নি। এরপর ১৯২৭ সালে ভারতীয় বন আইন প্রণীত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টায়, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম বন-নীতি আসে। পর্যায়ক্রমে ১৯৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সংরক্ষণের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইন, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ প্রণীত হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল:

১) ভারতীয় সব রকম বন্যপ্রাণের শিকার ও তা নিয়ে ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়। এই ধরনের অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হয়।

২) ভারতের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভাগ, সংরক্ষণের স্তর, সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ফলে ভারতের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের নতুন দিশা আসে, কয়েক'শ বছর ধরে ধ্বংস হতে থাকা ভারতের বন ও বন্যপ্রাণ আবার একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। এর পরপর ১৯৮০ সালের বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ভারতের সংরক্ষণকে আরো শক্তিশালী করে।

কিন্তু এই আইনগুলোর কথা বললেই সবটা বলা হয়না। আইনগুলোর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। ঠিক যেখান থেকে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম, সেখান থেকেই এই সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। সংরক্ষণ আইনগুলো Wildlife First নৈতিকতায় ভর করে তৈরি হওয়ায় তা ভারতের জঙ্গলের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এখানের আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসী মানুষের জীবন ও সংরক্ষণে তাদের ভূমিকাকে কখনো গুরুত্ব দেয়নি। মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ের যে আইনের কথা আমরা শুরুতে আলোচনা করছিলাম, তাতেও বনবাসী উপজাতিদের সন্দেহজনক ও বন্যপ্রাণের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হত। ব্রিটিশ ও স্বাধীন ভারতের আইনগুলোও সেই পরম্পরা মেনে বারবার সংরক্ষণের নামে বনবাসী উপজাতিদের তাদের চিরাচরিত বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং করেই চলেছে। বহু ক্ষেত্রেই উচ্ছেদ করা মানুষদের প্রাপ্য পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। কখনো অভিজাতদের খেয়াল, কখনো পুঁজিবাদী দুনিয়ার মুনাফার লোভ পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণকে শত শত বছর ধরে ধ্বংস করে আসলেও আইনগুলো আদিবাসীদেরকে বারবার বন্যপ্রাণের ধ্বংসের জন্য দায়ী করে চলেছে। সংরক্ষণের নামে মানুষকে উচ্ছেদ করতে আইনগুলো যতটা আগ্রহী, ধ্বংসাত্মক উন্নয়নের হাত থেকে পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণকে রক্ষা করতে ততটা আগ্রহ দেখা যায়না।

"আমরা সনাতন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে গিয়ে মানবতার বৈশিষ্ট্য যে হারিয়ে ফেলেছি সে হুঁশ আমাদের নেই"

-বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো

খবরে প্রকাশ

আপনি কি ভাড়াটিয়া বা বাড়িওয়ালা? কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আইনের খুঁটিনাটি জানুন-

মডেল বাড়িভাড়া আইনে সবুজ সংকেত দিল কেন্দ্রীয় সরকার। পূর্ববর্তী আইনের বেশ কিছু ধারায় করা হয়েছে সংশোধন। এতে ভাড়াটিয়া ও বাড়িওয়ালা উভয়েরই সমান সুবিধা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। নয়া আইন অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়াটিয়া বাড়ি ছাড়তে না পারলে সেক্ষেত্রে প্রথম দুই মাসে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হবে। এরপরেও যদি ভাড়াটিয়া সেই ঘর ছাড়তে না পারেন, সেক্ষেত্রে প্রতিমাসে চারগুণ ভাড়া দিতে হবে।

নয়া আইন অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়াটিয়া বাড়ি ছাড়তে না পারলে সেক্ষেত্রে প্রথম দুই মাসে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হবে। মডেল বাড়িভাড়া আইনে সবুজ সংকেত দিল কেন্দ্রীয় সরকার। পূর্ববর্তী আইনের বেশ কিছু ধারায় করা হয়েছে সংশোধন। এতে ভাড়াটিয়া ও বাড়িওয়ালা উভয়েরই সমান সুবিধা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

নয়া আইন অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়াটিয়া বাড়ি ছাড়তে না পারলে সেক্ষেত্রে প্রথম দুই মাসে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হবে। এরপরেও যদি ভাড়াটিয়া সেই ঘর ছাড়তে না পারেন, সেক্ষেত্রে প্রতিমাসে চারগুণ ভাড়া দিতে হবে।

অন্যদিকে ভাড়াটিয়াদের জন্যও রয়েছে সুরক্ষার ব্যবস্থা। বাড়িওয়ালা যদি সময়ের মধ্যে সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা ফেরত দিতে অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে সুদ দিতে বাধ্য থাকবেন ভাড়াটিয়ার কাছে। বাড়িভাড়া সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে বাড়িওয়ালা কিংবা ভাড়াটিয়া রেন্ট অথোরিটির কাছে যেতে পারবেন। সেখানে আদেশকেও চ্যালেঞ্জ করে যাওয়া যাবে রেন্ট ট্রাইবুনালের কাছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন হাইকোর্টের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জেলার বিচারক বা অতিরিক্ত বিচারককে রেন্ট ট্রাইবুনালের তদারকির দায়িত্ব দেবে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত জেলাশাসক পর্যায়ের আধিকারিক রেন্ট কোর্টে নিয়োজিত হবেন।

নয়া আইনে ২ মাসের বাড়িভাড়ার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে জমা করতে হবে ভাড়াটিয়াকে।

কমার্শিয়াল কারণে ভাড়া হলে ৬ মাসের টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। তবে এই মডেল টেনান্সি অ্যাক্ট বর্তমানে চালু ভাড়ার ক্ষেত্রে চালু হবে না।

খবরটির লিংক- https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/are-you-a-homeowner-or-living-on-rent-stay-updated-on-this-model-law-31622730856927.html

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া' ২০১৯ সালের এক রিপোর্ট জানাচ্ছে, দেশে মেয়েদের প্রতি সংঘটিত অপরাধে উত্তরপ্রদেশের অবস্থান শীর্ষে। গড়ে দিনে ৮৭ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী সুরেশকুমার খন্না বলেছিলেন – "যোগী আদিত্যনাথের মুখ্যমন্ত্রীত্বের প্রথম ২ মাসে রাজ্যে ৮০৩ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।" অখিলেশ যাদবের মুখ্যমন্ত্রীত্বের শেষ পর্বে ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে ২,৯৪৩ টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। যোগী জমানায় প্রথম ১০ মাসেই (২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত) ২৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৭০৪ টি। ২০২০ সালের আগস্টে প্রকাশিত এনসিআরবি রিপোর্ট এটাও জানাচ্ছে, ২০১৯ সালে উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ৫৯,৮৫৩। যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। এর মধ্যে ধর্ষণের মামলার সংখ্যা ৩,০৬৫টি। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক প্রায় ১১ জন মহিলা ধর্ষিতা হন ওই রাজ্যে। রিপোর্ট বলছে, এঁদের মধ্যে ৩৪ জনকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে।

এনসিআরবি-র রিপোর্ট আরও জানাচ্ছে, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মোট সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৬,০১১ এবং ৫৯,৪৪৫। ২০১৭-র মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। সে বছর রাজ্যে ৪,৬৬৯টি ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম উন্নাও গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড। যে মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন বিজেপি-র বিধায়ক কুলদীপ সিংহ সেঙ্গার। ২০১৮ সালে ধর্ষণের সংখ্যা সামান্য কমে দাঁড়ায় ৪,৩২২। এর মধ্যেও ৪১টি ক্ষেত্রে ধর্ষিতাকে খুন করা হয়েছিল।

ভারতে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন: যা জানা প্রয়োজন।

-ঋত্বিকা জৈন

২০১৮ সালে থমসন রয়টর্স ফাউন্ডেশনের সমীক্ষায় ভারত মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ বলে বিবেচিত হয়।

২০১৮ সালে, থমসন রয়টর্স ফাউন্ডেশন (টিআরএফ) পরিচালিত এক সমীক্ষায় ভারতকে মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ বলে চিহ্নিত করেন মতদাতারা। মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌন হিংসার সম্ভাবনা এবং তাদের দাস শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করার প্রথা, এই দুই কারণ ভারতকে প্রথম স্থানে তুলে দেয়।

টিআরএফ-এর ২০১৮ সালের সমীক্ষায়, তাদেরই করা ২০১১ সালের সমীক্ষার ফলাফল আবারও ফুটে ওঠে। ২০১১ সালেও ভারত তালিকার প্রথম ১০টি দেশেরে মধ্যে ছিল। "ভারত মেয়েদের প্রতি চরম উপেক্ষা ও অবমাননা দেখিয়ে চলেছে...ধর্ষণ, দাম্পত্য ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ ও উৎপীড়ন এবং কন্যা ভ্রুণ হত্যা হয়েই চলেছে।" মঞ্জুনাথ গঙ্গাধর নামে কর্নাটকের এক সরকারি অধিকর্তার এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয় রিপোর্টে।

গঙ্গাধরের মন্তব্যকে সমর্থন করে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনআরসিবি)প রিসংখ্যান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ওই সংস্থা অপরাধের তথ্য সংগ্রহ করে ও সেগুলিকে বর্তমান আইনের আলোয় বিশ্লেষণ করে। সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন মহিলা ধর্ষিত হন ও প্রতিদিন ৮৮টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়। ২০১৯ সালে, ৩২,০৩৩ ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। তার মধ্যে ১১% ঘটনায় অপরাধের শিকার হন পিছিয়ে-থাকা দলিত সম্প্রদায়ের মহিলারা।

উত্তরপ্রদেশের হাথরসে একটি ১৯ বছরের দলিত মেয়েকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ দেশের বিবেককে নাড়া দিয়েছে (ময়না তদন্তে বলা হয়েছে মেয়েটির বয়স ২২)। ২০১২ সালে দিল্লি গণধর্ষণের ঘটনা, ২০১৫-য় মুম্বইয়ের গণধর্ষণ, উন্নাওয়ের ধর্ষণ, কাঠুয়া ধর্ষণ কাণ্ড এবং আরও পিছিয়ে গেলে, মথুরা ও ভাঁওরি দেবীর ধর্ষণ হল কয়েকটি মর্মান্তিক উদাহরণ।

ধর্ষণ কি?

আভিধানিক সংজ্ঞায় অবৈধ যৌন মিলন বা সম্মতি ছাড়া, বলপূর্বক বা বলোপ্রয়োগ ছাড়াই, আক্রান্তের যোনি, মলদ্বার বা মুখে যৌনাঙ্গ, শরীরের অন্য কোনও অঙ্গ বা বিজাতীয় বস্তুর প্রবেশকে ধর্ষণ বলা হয়েছে। কিন্তু আইনের ভাষায়, একই বেআইনি কাজের বিভিন্ন মানে আছে।

ধর্ষণ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (আইপিসি) ১৮৬০ বা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫–৩৭৭ ধারার আওতায় পড়ে। ওই ধারা অনুযায়ী, ধর্ষণ হয় তখনই যখন কোনও পুরুষ তার লিঙ্গ, মুখ, শরীরের অন্য কোনও অঙ্গ বা অন্য কোনও বস্তু কোনও মহিলার যোনি, মুখ, মলদ্বার বা মূত্রনালীতে প্রবেশ করায় অথবা কোনও মহিলাকে দিয়ে এগুলির মধ্যে যে কোনও একটি কাজ তার বা অন্য কারোর ওপর প্রয়োগ করায়। আর এ সব হতে হয় মহিলার ইচ্ছে ও সম্মতির বিরুদ্ধে; যখন কোনও মহিলা বা তাঁর প্রিয়জন শারীরিক আঘাত বা মৃত্যুর হুমকি অনুভব করেন; যখন কোনও পুরুষ মহিলাটির স্বামী সেজে তাঁর সম্মতি আদায় করে; মহিলা যদি মানসিক ভারসাম্যহীন হন বা যদি তিনি কোনও মাদক দ্রব্যের প্রভাবে থাকেন; যদি তাঁর বয়স ১৬ বছরের কম হয় (১৪ বছরের কম মণিপুরে); এবং স্ত্রীর বয়স ১৫ বছরের কম হয় (১৩ বছর মণিপুরে)।

আইপিসি অনুযায়ী, সম্মতি মানে হল মহিলাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ও স্বেচ্ছায়, কথায়, ইঙ্গিতে, ভাষায় বা ভাষাহীন কোনও ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে জানাতে হবে যে তিনি যৌন ক্রিয়ায় অংশ নিতে ইচ্ছুক।

ধর্ষণের শাস্তি:

আইপিসির ৩৭৬ নং ধারা অনুযায়ী, ধর্ষণের শাস্তি দু' ভাবে ভাগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত নন এমন কোনও ব্যক্তি যদি ধর্ষণ করে থাকে, তাহলে তার জেলে থাকার মেয়াদ ১০ বছরের কম হবে না। এবং সেই শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হতে পারে। সেই সঙ্গে হতে পারে জরিমানাও।

দ্বিতীয় বিভাগে যারা পড়বে, তাদের ন্যুনতম সাজা হবে ১০ বছর জেল, এবং তা সারা জীবনের জন্যও (যত দিন সেই অপরাধী বেঁচে থাকবে) হতে পারে তাদের। একই সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে তাদের। এই বিভাগে পড়বে যারা:

- একজন পুলিশ অফিসার যদি তাঁর পুলিশ স্টেশনের এলাকার মধ্যে ধর্ষণ করেন বা থানার মধ্যে, বা ধর্ষিত মহিলা যদি পুলিশ হাজতে থেকে থাকেন
- একজন সরকারি চাকুরে
- কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকার দ্বারা মোতায়েন করা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য।
- যে সব হোম বা কোনও জায়গা যেখানে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য পাঠানো হয়, সেই সব প্রতিষ্ঠানের ম্যানজমেন্টের সদস্য বা কোনও কর্মী।
- কোনও হাসপাতাল কর্মী যদি সে কোনও রোগীকে ধর্ষণ করে।
- কোনও আত্মীয়, অবিভাবক, শিক্ষক ও আস্থাভাজন বা কর্তৃত্বের জায়াগায় থাকা কোনও ব্যক্তি যদি তাদের তত্বাবধানে থাকা কাউকে ধর্ষণ করে।
- সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠী হিংসার সময় যদি কেউ ধর্ষণ করে।
- একজন গর্ভবতী মহিলাকে যে ধর্ষণ করবে
- কেউ যদি একই মহিলাকে বার বার ধর্ষণ করে।
- সম্মতি জানাতে অক্ষম এমন কোনও মহিলাকে যদি ধর্ষণ করে কোনও ব্যক্তি।
- ক্ষমতাবান কোনও ব্যক্তি যদি ধর্ষণ করে।
- মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন এমন কোনও মহিলার ধর্ষণকারী।
- ধর্ষণের সময় যদি ধর্ষণকারী মহিলার শারীরিক ক্ষতি করে বা তাঁকে পঙ্গু বা বিকৃত করে দেয় বা তাঁর জীবন সংশয় ঘটায়।

অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণের ব্যবহার:

যুদ্ধের সময় ধর্ষণকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ২০০৮ সলে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ লক্ষ্য করে যে, "মহিলা ও শিশুরা বিশেষ করে যৌন হিংসার শিকার হচ্ছে। এমনকি "যুদ্ধের কৌশল হিসেবেও তা করা হচ্ছে।" এর পরিপ্রেক্ষিতে, পরিষদে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়, যাতে বলা হয় "যুদ্ধরত সব দলকেই অসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সব রকম যৌন হিংসা বন্ধ করতে হবে।"

২৩ ফেব্রুয়ারি **১৯৯১** সালে, জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন সেখানকার অসামরিক নাগরিকরা ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ আনেন। তাঁরা বলেন, কাশ্মীরের প্রত্যন্ত কুপওয়ারা জেলার কুনান ও পোশপোরা গ্রামে সেনারা ৩০ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে। ভিত্তিহীন বলে ভারত সরকার অভিযোগটি উড়িয়ে দেয়। কিন্তু **২০১৮** সালে, সেনা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা যৌন নিগ্রহের ঘটনার স্বাধীন তদন্ত না করার অভিযোগ তুলে, রাষ্ট্রসংঘের হাইকমিশন ফর হিউম্যান রাইটস কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র নিন্দা করে।

কুনান-পোশপোরা সহ **১৩**টি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জম্মু ও কাশ্মীরে যৌন অপরাধের প্রতি "রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতা"র বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তাতে আরও বলা হয় যে, "ন্যায়-বিচার পাওয়ার সব চেষ্টা ও পথকে বিভিন্ন স্তরে আটকে দেওয়া হয়েছে।"

২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার একটি তদন্তে, সিটিজেনস ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস দেখে যে, "পরিকল্পিত ভাবে অল্প বয়সী মেয়ে ও মহিলাদের ওপর যৌন হিংসা চালানো হয়"। ওই তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়, "একটি সম্প্রদায়কে অপমান করতে ও বশে রাখতে ধর্ষণকে একটি অস্ত্র হিসেব ব্যবহার করা হয়।" তাতে আরও বলা হয়, "কয়েকটি বাদে, বেশিরভাগ ঘটনাতেই মহিলাদের উলঙ্গ করে হাঁটানো হয়। তারপর গণধর্ষণ করা হয় তাদের। এবং অবশেষে তাদের দেহ চার টুকরো করে এমন ভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয় যে কাউকে আর চেনা যায় না।"

ধর্ষণ আইনের সংস্কার:

১৬০ বছর আগেকার আইপিসি ঔপনিবেশিক আইনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। আইপিসি-র কিছু খুচর রদবদল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোনও সংস্কার হয়নি। ২০০০ সালে জাস্টিস মালিমাথ কমিটি অপরাধ বিচারের ধারা সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এর সুপারিশগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়।

এখন আরও একটি প্রচেষ্টা চলছে। পাঁচ সদস্যের 'কমিটি ফর ক্রিমিনাল রিফর্মস' গঠন করা হয়েছে যাতে কেবল পুরুষরাই রয়েছেন। কিন্তু মে মাসে গঠিত এই কমিটি ইতিমধ্যেই বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছে। কারণ, বলা হচ্ছে, সেটির গঠনে কোনও বৈচিত্র নেই; নির্দেশের শর্তগুলি জনসাধারণকে জানান হয়নি; কম সময় দেওয়া হয়েছে (ছ' মাসের মেয়াদ ধার্য করা হয়েছে, যা এ মাসেই শেষ হয়ে যা্বে); এবং পদ্ধতিগত ত্রুটি, যেমন সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশ্ন ঠিক করার বদলে কিছু পূর্বনির্ধারিত প্রশ্ন ছ'টি কিস্তিতে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১৯৭২ সালে মথুরা ধর্ষণ কাণ্ডের পর ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার ফলে, ধর্ষণ আইন প্রথম সংশোধন করা হয়। ২৬ মার্চ ১৯৭২ তারিখে, মহারাষ্ট্রের এক আদিবাসী মহিলা কয়েকজন পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ করেন। ট্রায়াল কোর্ট পুলিশদের নির্দোষ ঘোষণা করে এবং সেই রায় সুপ্রিম কোর্টও বহাল রাখে। কেবল মাত্র হাইকোর্টেই অভিযুক্ত পুলিশরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। পুলিশরা নিজেদের পক্ষে সওয়াল করার সময় বলে, ওই মহিলা 'লুজ' চরিত্রের। তাছাড়া তার সঙ্গে তার পুরুষ বন্ধু ছিল। তাই তাকে ধর্ষণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৭৮ সালে, উচ্চতম আদালত তার রায়ে বলে, "কোনও ক্ষত চিহ্ন না থাকাটা এটাই ইঙ্গিত করছে যে, অভিযোগে যে যৌন মিলনের কথা বলা হয়েছে, তা শান্তিতেই হয়েছিল।"
১৯৭৮-এর ওই রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিলে, আইনসভা 'ক্রিমিনাল ল (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৩' প্রণয়ন করে। তাতে বেশ কিছু নতুন ধারা সংযোজন করা হয়। তার মধ্যে একটিতে ধর্ষিতার নাম প্রকাশ করাটা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।
২০১২ সালে, দিল্লিতে নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ড, মহিলাদের অধিকার ও নিরাপত্তার আন্দোলনে একটি জলবিভাজিকার কাজ করে। তার ফলে 'ক্রিমিনাল ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৩, প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা যেমন আরও বিস্তৃত করা হয়, তেমনই শাস্তিও আরও কড়া করা হয়।

অপরাধ বিচার প্রণালীর সমালোচনা ও ফাঁক:

ভারতীয় ধর্ষণ আইনের বৈশিষ্ট্য হল তার লিঙ্গ নিরপেক্ষতার অভাব। আইপিসি অনুযায়ী একজন পুরুষ ধর্ষণের শিকার হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলাকে কেন্দ্র করে ভারতের আইন কমিশন যৌন মিলনের সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করার পরামর্শ দিয়েছে, যাতে তা আরও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হয়। ২০১৮ সালে, সম্মতির ভিত্তিতে সমকামীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে অপরাধ নয় বলে ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট। এখন, ধর্ষণকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ করে তোলাটাও জরুরি হয়ে পড়েছে।

অন্যান্য ধারায় ধর্ষণের শাস্তি:

a) Section Section - 376A

Offence - Causing death or resulting in a persistent vegetative state of the victim

Minimum Punishment - 20 years

Maximum punishment - Life term or Death Penalty Fine - No

b) Section Section - 376AB

Offence - Rape of a girl under 12 years

Minimum Punishment - 20 years

Maximum punishment- Life term or Death Penalty Fine - Yes. Fine paid directly to the victim will be just & reasonable to meet medical expenses & rehabilitation costs

c) Section Section - 376DA
Offence - Gangrape of a woman under 16 years
Minimum Punishment - Life Term
Maximum punishment- Life Term
Fine- Yes. Fine paid directly to the victim will be just & reasonable to meet medical expenses & rehabilitation costs.

d) Section Section - 376DB
Offence - Gangrape of a girl under 12 years
Minimum Punishment - Life Term
Maximum punishment - Death Penalty
Fine- Yes. Fine paid directly to the victim will be just & reasonable to meet medical expenses & rehabilitation costs
link- https://bangla.boomlive.in/law/rape-laws-in-india-all-you-need-to-know-10232

কর্নাটকে চালু হল কুসংস্কার বিরোধী আইন

কর্নাটকে কুসংস্কার বিরোধী আইন চালু হল গত ৪ জানুয়ারি ২০২০ থেকে। ওইদিন রাজ্যপাল ভজুভাই ভালা আইনে সিলমোহর দেন। মজার ব্যাপার হল, বরাবর যে বিলের কট্টর বিরোধী ছিল বিজেপি তথা গেরুয়া শিবির, সেই তাদেরই জমানায় বিলটি কর্নাটকে পাস হল, দেশের দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে!
কুসংস্কারবিরোধী আইনের হয়ে বহুদিন ধরেই প্রশ্ন করেছে কর্নাটক। রাজ্যের মানবাধিকার ও বিজ্ঞানকর্মীদের পক্ষ থেকে ২০১৬ সালে একটি খসড়া পেশ করা হয়েছিল রাজ্য বিধানসভায়। আলাপ-আলোচনার পরে সেই বিলটি ২০১৭ সালের ১৭ নভেম্বর বিধানসভায় পাস হয়। তখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার কংগ্রেস।

প্রত্যাশিতভাবে, এই বিলের বিরোধিতা করেছিল বিজেপি। চিকমাগালুরের বিজেপি বিধায়ক সিটি রবি বিধানসভায় বলেছিলেন, "এই আইন চালু হলে রাজ্যের হিন্দু জনসমাজের বহু প্রথা, আচরণবিধি আইন ও আচার-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, যা কখনো সরকারের করা উচিত নয়।" তাঁর বক্তব্য ছিল, এই আইন চালু হলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে এইসব যুক্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। যুক্তি, তথ্য, বিজ্ঞান ও মানবিক আবেদনের কাছে হার হয়েছে ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামির।

"কর্নাটক অমানবিক ও ক্ষতিকারক চর্চা ও কালা জাদু প্রতিরোধ আইন, ২০১৬"(The Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Bill 2016) শীর্ষক এই আইনে এখন থেকে কী কী নিষিদ্ধ একবার দেখে নেওয়া যাক।
মাডে স্নান বা উচ্চবর্ণের অভুক্ত উচ্ছিষ্টের ওপর নিম্নবর্ণের মানুষের গড়াগড়ি খাওয়ার মতো প্রথা ও এই সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, কালো জাদু প্রদর্শনী বা চর্চা, অমানবিক ও ক্ষতিকর যেকোনো ধরনের চর্চা, আচার অনুষ্ঠান, ধনসম্পত্তি আহরণ বা প্রাপ্তির কথা বলে

তন্ত্রচর্চা, শারীরিক মানসিক ও যৌন নিপীড়ন ইত্যাদি, অংগপ্রত্যংগ কাটা বা বলি দেওয়া, আগুনে হাঁটা...এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে। এছাড়া ধর্মের কারণে বা ধর্মের অজুহাত দিয়ে এখন থেকে আর কোনো মানুষকে নগ্ন করে ঘোরানো যাবে না। রোগ সারানোর নামে কারোর উপর কোনওরকম ভুতুড়ে, অপরীক্ষিত ও নির্যাতনমূলক ক্রিয়াকলাপ চালানো যাবে না। ধর্মের নামে মানুষকে ভুল তথ্য দেওয়া, ভূত বা অলৌকিক শক্তির কথা বলে এমন বলা বা করা যাবে না বা কাউকে প্ররোচিত করা যাবে না, যা মানুষ বা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক।

তবে এই আইনে পুজোপাঠ চর্চা, ধর্মানুষ্ঠান, পরিক্রমা, মিছিল, সমাবেশ, প্রাচীন ধর্মকথা, সাধুসন্ন্যাসীদের অলৌকিক গালগল্প, কান জিভ ফুটো করা, মাথা ন্যাড়া, জ্যোতিষ ও বাস্তুশাস্ত্রকে বর্জনীয় বলে মনে করা হয়নি। কেন করা হয়নি এটাই কোটিটাকার প্রশ্ন।

Karnataka's anti-superstition bill gets Governor's nod

The law came into effect on January 4, according to the government order.

NEWS POLICY WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020 - 17:28

TNM Staff Follow @thenewsminute

Karnataka Governor Vajubhai Vala has given his assent to the Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black magic Act 2017.

Popularly known as the Anti-Superstition Act, the law was enacted in 2017 during the Siddaramaiah-led Congress government's rule in Karnataka.

According to the government order issued earlier this month, the Act came into force from January 4, 2020. The Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Bill 2016 was passed in the state Assembly on November 17, 2017 amid opposition from BJP MLA from Chikkamagaluru, CT Ravi, who had argued that the state government could not curb certain practices of the Hindu community.

What is banned-

The act bans made snana, menstrual taboos, performing any black magic, inhumane act and evil practices in search of treasure or bounty, tantric acts which include physical and sexual assault.

Practices such as parading people naked, ostracising a person in the name of a ritual and encouraging inhumane acts during said rituals are also banned.

Rituals of exorcism, assaulting people under the pretext of exorcism, misinformation and creating a panic-like situation under the pretext of ghosts and black magic is also be banned. Other practices such as making claims of having healing power, propagating practices that involve self-mutilation and coercing people to perform fire-walking are banned.

The law also states that if any person is killed or injured due to superstitious practices, a case of murder or attempt to Murder can be registered by jurisdictional police. The law also mandates the appointment of one vigilance officer in every police station to keep tabs on such practices

What is not banned-

Any form of worship including pradakshine, yatra, parikrama at any religios shrine, harikatha, keerthana, pravachana, bhajans do not come under the purview of the act.

Providing knowledge of ancient arts and practices, speaking about miracles performed by deceased saints and literature on them offering prayers, upasana, religious rituals at places of worship or at people's homes, religious celebrations, festivals, processions, piercing of ears and nose, shaving of head, astrology and vaastu are considered acceptable under the act.

link- https://www.thenewsminute.com/article/karnatakas-anti-superstition-bill-gets-governors-nod-116608

বাংলায় কুসংস্কার বিরোধী আইনের প্রস্তাবনা

প্রথমেই স্মরণ করা যাক পুনে- মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা, ডাক্তার নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকরের (জন্ম ১৯৪৫ সালের ১ নভেম্বর)। ১৯৭০ সালে তিনি এমবিবিএস ডিগ্রি পান, তার পর থেকে ১৯৮২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একটি হাসপাতাল ও দু'টি ক্লিনিক চালাতেন। তার পর ১৯৮৩ সালে উনি হঠাৎই হাসপাতাল ও ক্লিনিক বন্ধ করে দিয়ে গড়ে তোলেন "অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি"র। শুধু মহারাষ্ট্রেই ২৩০টি শাখা বর্তমানে। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, কালাজাদু, কুসংস্কার, দৈব চিকিৎসা, অলৌকিক শক্তিধর, নিরিহ মহিলাদের ডাইনি বলে দেগে দেওয়া ইত্যাদি বুজরুকির বিরুদ্ধে দাভোলকর, একটি কঠোর আইন প্রণয়ণের জন্য কাজ করছিলেন। কিন্তু, ২০১৩ সালের ২০ অগস্ট ভোরবেলা পুনেতে তাঁর বাড়ির সামনেই প্রাতর্ভ্রমণের সময় দু'জন বন্দুকধারী আততায়ী পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে চার রাউন্ড গুলি চালায় নরেন্দ্র দাভোলকরের উপর। দু'টি গুলি মাথায় লাগে। রক্তাক্ত অবস্থাতেই লুটিয়ে পড়েন তিনি এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দাভোলকর যে আইনের জন্য কাজ করছিলেন সেই বিলটি বিধানসভার অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আলোচনার জন্য বিলটির কথা তোলাই হয়নি। দাভোলকর কিন্তু থামেননি। অধিবেশনে বিলটির প্রসঙ্গ এল সাত-সাত বার। এক বারও আলোচনার জন্য তোলা হল না। অবশেষে, জনগণের চাপে তাঁর হত্যার তিন দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৩ অগস্ট ২০১৩ বিলটি পাশ করানোর জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করেন মহারাষ্ট্র সরকার এবং শেষ পর্যন্ত ওই বছরই ১৮ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভায় পাশ হয়, " মহারাষ্ট্র প্রিভেনশন অ্যান্ড ইর্যাডিকেশন অব হিউম্যান স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড আদার ইনহিউম্যান ইভিল অ্যান্ড অঘোরী প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড ব্ল্যাক ম্যাজিক বিল-২০১৩ (The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013)।

দাভোলকরের মৃত্যুর পর "ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান র্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন" এর সভাপতি নরেন্দ্র নায়ক বলেছিলেন - "প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যদি মনে করে থাকে আমাদের এক জনকে গুলি চালিয়ে খুন করে আন্দোলনকে স্তব্ধ করবে, তবে তারা ভুল করছে। অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই কখনওই থামে না, ব্যাটনটা হাতবদল হয় শুধু।"

কয়েকজন মুক্তমনা, যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে, মহারাষ্ট্রের ধাঁচে একটা জোরালো বা কঠোর আইন প্রণয়ণের দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে সরব। গত ৪ঠা এপ্রিল ২০১৭, কুসংস্কারবিরোধী আইন প্রস্তাবনা উদ্যোগ এর পক্ষে এই রাজ্যে কুসংস্কারবিরোধী আইন লাগু করার জন্য একটা খসড়া প্রস্তাব জমা দিয়েছে, রাজ্য আইন কমিশন, রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের দফতর এবং অন্যান্য জায়গায়। এনারা যে আইনটি আনতে চান তার নাম "The West Bengal Prevention of Superstition and Black Magic Practices Bill 2016"। আপাতত এই আইনটি লাল ফিঁতের ফাঁসে আটকে রয়েছে সরকারের উদাসিনতার কারনে।

সেই খসড়া প্রস্তাবটির সিডিউল ৩টে তেরোটা আইন মোতাবেক আদালত গ্রাহ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য কুসংস্কারচর্চার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। যেমন-

১) ভূত অশুভ আত্মা প্রেতাত্মা বা ওই ধরনের কিছু তাড়ানোর অজুহাতে কোনো ব্যক্তিকে দড়ি শেকল ইত্যাদি দিয়ে বাঁধা ঝুলিয়ে রাখা, তাকে লাঠি জুতো ঝাঁটা চাবুক বা ওই ধরনের কোনো বস্তু দিয়ে মারা চুল ছিড়ে নেওয়া বা কেটে দেওয়া, গরম লোহার শিক বা ওই ধরনের কিছু দিয়ে ছেঁকা দেওয়া, যে কোনোভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা, শুকনো লঙ্কা জাতীয় জিনিস পুড়িয়ে তার গন্ধ শোকানো, অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে নোংরা জল প্রস্রাব বিষ্ঠা বা ওই জাতীয় কোনো অখাদ্য কুখাদ্য খেতে বাধ্য করা, জুতো মুখে নিয়ে দৌড়ে যাওয়া, ওই জাতীয় সামাজিক

মর্যাদা হানিকর কোনো কাজ করতে বাধ্য করা, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্য যৌন হেনস্থা হয়রানি করা, অন্য যে কোনো মানসিক বা দৈহিকভাবে অস্বাস্থ্যকর কাজ করতে বাধ্য করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। কাউকে ভূতে ধরেছে বা অশুভ আত্মা বা অশুভ শক্তি ভর করেছে বলে প্রচার করাটাও এই আইনের আওতায় আসবে।

২) তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে এবং / অথবা প্রচার করে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ জমি বাড়ি অলংকার সম্পত্তি ইত্যাদি আদায় /উপার্জন করা, ভয় দেখানো সন্ত্রস্ত করা প্রতারিত করা, শারীরিক /মানসিকভাবে ক্ষতিকর কোনো ক্রিয়া কলাপ করা এবং / অথবা অন্যকে প্ররোচিত করা অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৩) অলৌকিক শক্তি বা ক্ষমতার অধিকারী হতে গিয়ে বা ওই ধরনের অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির আশীর্বাদধন্য হওয়ার / করার বাসনায় এমন কিছু করার বা অন্যকে প্ররোচিত করা যাতে ব্যক্তির শারীরিক / মানসিক ক্ষতি বা জীবনহানির আশঙ্কা থাকে, অপরাধ হবে এসব কাজ ও।

৪) জলের গোপন উৎস, গুপ্তধন, সোনাদানা, হীরে, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি অনুসন্ধানের নামে কোনো অমানবিক এবং / অথবা বৈজ্ঞানিকভাবে অপরীক্ষীত এবং / অথবা অস্বীকৃত কোনো কাজ / যাদু - করা বা কাউকে সেই ধরনের কাজ করতে প্ররোচিত / প্রলুব্ধ করা এবং সেই ধরনের কাজের প্রচার করা, যাতে কোনো ব্যক্তির শারীরিক /মানসিক ক্ষতি কিংবা অঙ্গ/ জীবনহানি হয় বা তার আশঙ্কা থাকে।

৫) কোনো ব্যক্তির অলৌকিক বা দৈবশক্তি আছে বা ওই ধরনের কোনো শক্তি ভর করেছে বলে প্রচার করে জনসাধারণকে ভীত - সন্ত্রস্ত করে তোলা, এমন প্রচারের দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করে অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি আদায় করা বা তার চেষ্টা করা এই তথাকথিত দৈবশক্তির প্রতি আনুগত্য না দেখালে বা ঘোষিত বিধান না মানলে সমূহ ক্ষতি হওয়া বা ক্ষতি করার ভয় দেখানো দণ্ডনীয় অপরাধ বলে আইনের আওতায় আনতে হবে।

৬) কোনো ব্যক্তি তথাকথিত ভূত নামানো প্রেত চর্চা ডাকিনিবিদ্যা চর্চা করে বা তার মাধ্যমে সে অশুভ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কুনজর কুদৃষ্টি দিয়ে বান মেরে মন্ত্রতন্ত্র বা অন্য কোনো ক্রিযকলাপের মাধ্যমে গবাদিপশুর মড়ক লাগানো, দুগ্ধবতী দুধ নিঃসরণ বন্ধ করা, অসুখবিসুখ ঘটনো থেকে শুরু করে নানাবিধ দুর্ভাগ্য ডেকে আনা এবং যেকোনো ক্ষতিসাধন করার অশুভ ক্ষমতা আছে বলে প্রচার করা, এবং ওই ব্যক্তিকে ডাইন বা ডাইনি শয়তানের অনুচর /দূত ইত্যাদি তকমা দিয়ে প্রচার করা, তার ওপর শারীরিক /মানসিক অত্যাচার চালানো, তাকে একঘরে করা, অর্থ জমি ইত্যাদি আদায় করা বা দখল করা, তাকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করা, তার ওপর হামলা এবং /অথবা তাকে হত্যার চেষ্টা।

৭) কোনো ব্যক্তিকে ডাইন বা ডাইনি বলে দেগে দিয়ে তাকে প্রকাশ্যে /অপ্রকাশ্যে নগ্ন করে হাঁকানো এবং তার ওপর যে কোনো ধরনের শারীরিক / মানসিক নির্যাতন চালানো।

৮) নখদর্পণ, থালা - বাটি চালা, কঞ্চি চালা, আটার গুলি ইত্যাদির সাহায্যে চোর ধরা, অপরাধী শনাক্ত করা বা করার চেষ্টা বা ওই ধরনের দাবি / বিজ্ঞাপন দেওয়া বা সেই সূত্রে কোনো ব্যক্তির ওপর শারীরিক /মানসিক নির্যাতন করা বা তার প্ররোচনা দেওয়া।

৯) সাস, কুকুর, বিছে বা যে কোনো প্রাণীর কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি এড়িয়ে, রোগীকে তা নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত / সাহায্য না করে /নেওয়ার ব্যাপারে বাধা দিয়ে ওঝাগুনিন,

তান্ত্রিক প্রমুখের দ্বারস্থ হওয়ার প্ররোচনা দেওয়া এবং / অথবা ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র তন্ত্র, বিষপাথর দিয়ে বিষ তোলা, ক্ষতস্থানে মুরগির পায়ু ঘষা, শেকড় বাকর ইত্যাদি দিয়ে /খাইয়ে বিষ নামানোর চেষ্টা ইত্যাদি।

১০) আঙুল বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে 'রক্তপাতহীন' অস্ত্রোপচার, গর্ভবতী মহিলার যৌনাঙ্গে হাত / আঙ্গুল ব্যবহার করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ /পরিবর্তন করার দাবি করা।

১১) সন্তানধারণে ইচ্ছুক মহিলাকে ডিম, কলা বা অন্য কোনো বস্তু খাইয়ে, তন্ত্রমন্ত্র- এর সাহায্যে বা অন্য কোনো অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং / অথবা তথাকথিত অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিয়ে " সন্তানবতী" করার দাবি করা / চেষ্টা করা।
আলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে কোনো মহিলাকে সন্তানবতী করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে প্রতারণা করা, যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা, যৌন নির্যাতন চালানো। তুকতাক ঝাড়ফুঁক মন্ত্রপূত জলপড়া তেলপড়া তাবিজ কবজ মাদুলি আংটি, তামা বা ওই জাতীয় ধাতু, পাথর, শিকড় বাকড়, মাটি মন্ত্র তন্ত্র, বিশ্বাস, প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে শারীরিক /মানসিক চিকিৎসা করা /করার চেষ্টা করা / দাবি করা।

১২) কোনো ব্যক্তির শারীরিক / মানসিক বিকার, কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর ব্যতিক্রমী জৈব রূপ, সত্তা বা বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশকে দৈব ঘটনা, ঈশ্বরের আবির্ভাব ইত্যাদি বলে প্রচার করা কিংবা সেই ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে " দৈবশক্তি সম্পন্ন বলে প্রচার করা এবং তার মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা, অর্থ আদায় করা, সেই ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর প্রতি আনুগত্য আদায় করা, তার ঘোষিত বা তার নামে ঘোষিত বিধিবিধান, আদেশ, উপদেশ জনসাধারণকে মেনে চলতে প্ররোচিত করা বা বাধ্য করা।

১৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, জমিজমা, চাকরি, ব্যবসা, প্রেম, বিয়ে, দাম্পত্য কলহ, শত্রুদমন জাতীয় ব্যক্তিগত /পারিবারিক সমস্যার নিষ্পত্তি করতে তন্ত্রমন্ত্র, বশীকরণ, মুঠিকরণ, বানমারা, তুকতাক বা ওই ধরনের যে কোনো অবৈজ্ঞানিক (অপরীক্ষিত ও অপ্রমাণিত) পদ্ধতির সাহায্য দেওয়া, দাবি ও প্রচার করা, বিজ্ঞাপন দেওয়া।

অতিরিক্ত সংযোজন:-
(ক) ২৮ নভেম্বর ২০০১ সালে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি.সি. প্যাটেল এবং বিচারপতি এ.কে. সিকরি র ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকার কে নোটিশ পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, অলৌকিক ক্ষমতা বলে অসুখ বা কোনো সমস্যা সমাধানের প্রলোভন দেখালে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন প্রকাশক প্রচার মাধ্যমের বিরুদ্ধে যেন "The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954" অনুসারে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়। সে খবরের সংক্ষেপসার ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

(খ) ২২ জুন ২০০৩ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে - রেইকি বা স্পর্শ চিকিৎসা যাঁরা করেন, তাঁরা নিজের নামের আগে ' ডাক্তার ' শব্দটা কোনো ভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এই চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রক স্পষ্ট করে এটাও জানিয়েছে যে, রেইকি সহ জেম থেরাপি, কালার থেরাপি, ম্যাগনেটোথেরাপি,আরোমা থেরাপি, মিউজিক থেরাপি ইত্যাদি তথাকথিত প্রতিটি চিকিৎসা পদ্ধতিই বে-আইনি এবং এইসব পদ্ধতি শেখানো কিংবা প্রয়োগকারী ব্যক্তি কোনো ভাবেই নিজের নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারবেন না। রইলো একটি খবরও।

State anti-superstition laws not enough. India needs a central law, focus on victim not crime

Cases of witch-hunting and human-sacrifices are part of systems of oppression that have been culturally and religiously legitimised for centuries.

ASTHA MADAN GROVER and SUSHOVAN PATNAIK

9 December, 2020 03:38 pm IST

India's multi-ethnic identity makes it a nation of many superstitions. On November 15, a newspaper story reported how police rescued four minor boys in Assam suspected to be sacrificed in a ritual. Further, the National Crime Record Bureau (NCRB) data for 2019 revealed an overall rise in witch-hunting cases, with Chhattisgarh witnessing 22-witch-hunt related deaths in the past year.

In yet another instance in Odisha, in August 2020, a woman was killed after being impaled with a Trisul or a trident, a divine symbol in Hindusim, during a medical treatment by a self-proclaimed supernatural doctor. As a result in this case – JituMurumu @ SukulMurmu&Anr. v. State of Odisha – the Odisha High Court observed that existing state laws were inadequate to address the issue and emphasised on the urgent need for a central law instead.

Witch-hunting and broader superstition related crimes violate basic fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, and 21 of the Indian Constitution. Such acts also violate several provisions of various International legislations to which India is a signatory, such as the 'Universal Declaration of Human Rights, 1948', 'International Covenant on Civil and Political Rights, 1966', and 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979'.

Yet, despite constitutionally guaranteed fundamental rights and provisions in international legislations, the reality on the ground remains starkly different. A primary reason for this is the lacunae that exist in the Indian Penal Code (IPC).

For instance, the IPC only takes cognisance of human sacrifice after a murder is committed, and the physical torture that alleged 'witches' are subjected to is categorised as merely 'simple hurt'. The accompanying mental trauma is completely ignored. Victims, therefore, find it hard to get justice and often withdraw their complaints due to societal pressure – letting perpetrators off the hook.

Given this context, several Indian states have recognised the need for special anti-witch-hunt laws since 1999. Yet, only a few have enacted them and the ones that have are wanting in implementation. This blog analyses the existing state laws and builds the case for a central law that takes reasons for the failure of implementation of state laws into account. It argues that for a central legislation to be effective, it must be grounded in the larger socio-cultural context, with adequate restorative measures for victims.

News Link- https://theprint.in/opinion/state-anti-superstition-laws-not-enough-india-needs-a-central-law-focus-on-victim-not-crime/563439/

মহিলাদের যা জানতেই হবে

পিতার মৃত্যুর পরে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের খবর প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায় ৪ নভেম্বর ২০১৫ সালে। সম্পূর্ণ খবরটি তুলে ধরা হলো।

সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়, সংশোধন এবং পরিমার্জন হয়েছে ২০ জানুয়ারি ২০২২ সালে। রইলো সেই খবরটিরও বিস্তারিত।

২০০৫ সালের আগে বাবার মৃত্যু হলে সম্পত্তির ভাগ পাবে না মেয়েরা ২০০৫ সালের আগে বাবার মৃত্যু হলে সম্পত্তি পাবেন না মেয়েরা।

Updated: Nov 03, 2015, 06:29 PM IST

ওয়েব ডেস্ক: ২০০৫ সালের আগে বাবার মৃত্যু হলে সম্পত্তি পাবেন না মেয়েরা। হিন্দু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায় এই চাঞ্চল্যকর রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৫-এ হিন্দু উত্তরাধিকার সংশোধনী আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু আজ শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, ২০০৫ সালের আগে বাবার মৃত্যু হলে মেয়েরা আর সম্পত্তির ভাগ পাবে না।

পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার। হিন্দু পরিবারের বরাবরই এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলেছে। একসময় এদেশের পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনও অধিকারই ছিল না।

প্রাচীন মিতাক্ষরা বিধি অনুযায়ী, হিন্দু যৌথ পরিবারে মেয়েদের খোরপোশের কথা বলা থাকলেও তাঁরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন না।

স্বাধীনতার পরও সেই পরিস্থিতি বদলায়নি। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনেও পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত ছিল না।

এই পরিস্থিতিটাই বদলে দেয় ২০০৫-এ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ঐতিহাসিক সংশোধনী। প্রথমবার সেই আইনেই পরিষ্কার বলা হয়, ছেলেদের মতোই, মেয়েদেরও পৈতৃক সম্পত্তিতে জন্মগত অধিকারের রয়েছে।

কিন্তু সেই অধিকারই এবার খর্ব হল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। বিচারপতি অনিল দাভে এবং বিচারপতি আদর্শ গোয়েলের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হিন্দু উত্তরাধিকার আইন কার্যকর হওয়ার আগে যদি বাবা মারা গিয়ে থাকেন, সেক্ষত্রে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পাবেন না মেয়েরা।

বহুক্ষেত্রে বাবার মৃত্যু ২০০৫ বা তারও আগে হলেও এখনও সম্পত্তি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভাগ করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে রায়ের ফলে আপাতত সেই সব ক্ষেত্রে হঠাৎই পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার হারালো মেয়েরা।

খবরটির লিংক- https://zeenews.india.com/bengali/nation/girls-will-not-get-fathers-property-before-2005_133026.htm

মেয়েরাও বাবার সম্পত্তির ভাগ পাবে, উইল করা না থাকলেও! ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের-

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বাবার সম্পত্তিতে সমান অধিকার থাকবে মেয়েরও। বাবা যদি মৃত্যুর আগে উইল করে সম্পত্তির ভাগ মেয়েকে দিয়ে নাও যেতে পারেন, তা সত্ত্বেও বাবার সম্পত্তিতে ছেলেদের সমানই অধিকার পাবেন মেয়েরাও। বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে এমনই ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট।

গতকাল হিন্দু মহিলা ও বিধবাদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মামলাটি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেই বিচারপতি আবদুল নাজির এবং কৃষ্ণ মুরারির বেঞ্চ রায় দেয়, "কোনও হিন্দু ব্যক্তির কন্যা সন্তানরাও, তাঁর বাবার স্ব-অর্জিত বা অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে বাবার মৃত্যুর পরে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় কন্যা সন্তানদের দাবি বরং বেশি।" অর্থাৎ, যদি একজন হিন্দু পুরুষ কোনও উইল ছাড়াই মারা যান, তাঁর সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র বা কন্যা পাবেনই। সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির ভাইয়ের ছেলে বা মেয়ে থাকলেও, তাঁরা সেই সম্পত্তির কোনও ভাগ পাবে না। বরং সবার আগে ওই সম্পত্তির ভাগ পাবেন ওই মৃত ব্যক্তির কন্যা।

১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার দেওয়া হয়নি। এর প্রায় ৫০ বছর পরে, ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সেই আইন সংশোধন করা হয় এবং
ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে পৈতৃক সম্পত্তিতে সমানাধিকারের কথা বলা হয়। কিন্তু সেই সংশোধনী ঘোষণার আগের সময়কালেও সংশোধনীর নিয়ম কার্যকর হবে কি না, তা স্পষ্ট হচ্ছিল না। শেষমেশ ২০২০ সালে অগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ রায় দেয়, "অবিভক্ত যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে মেয়েদের সারা জীবন সমান অধিকার রয়েছে।" ২০০৫ সালের আগেও কারও বাবা মারা গিয়ে থাকলে তাঁর সম্পত্তিতে তাঁর ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ছবিটা প্রায়ই অন্য হয়। সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে কেবল ছেলেরাই
প্রাধান্য পায়, ব্রাত্য রয়ে যায় পরিবারের মেয়েরা। উইল করে সম্পত্তি ভাগ করা থাকলে আলাদা বিষয়, তা না হলে যেন অলিখিত নিয়মেই মেয়েদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয় বাবার সম্পত্তির ভাগ থেকে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস আবদুল নাজির এবং কৃষ্ণা মুরারীর বেঞ্চের সাম্প্রতিকতম রায় সেই বিষয়টিই স্পষ্ট করে দিল। প্রতিষ্ঠা করল বাবার সম্পত্তিতে মেয়েদের উত্তরাধিকার বিচারপতি মুরারি তাঁর ৫১ পাতার রায়ে এও জানিয়েছেন, উইল না করে মারা গিয়েছেন এমন কোনও মৃত হিন্দু ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী বা কন্যা যে মৃতের স্ব-অর্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পাবেন, এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হিন্দু মহিলারা যাতে পৈতৃক সম্পত্তি স্বচ্ছ ভাবে দাবি করতে পারেন।
খবরটির লিংক- https://thewall.in/news/daughters-to-inherit-fathers-self-acquired-property-if-no-will/

বুজরুকি, প্রতারণা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনস্বার্থে প্রচারিত

"ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি" ১৯৮৫ সাল থেকেই প্রশাসনের কাছে প্রবল দাবী জানিয়ে আসছে আইনকে মলাট বন্দি না রেখে, সর্বত্র তার প্রয়োগ হোক। কিছু ভারতীয় আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন, Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act 1954, Drug and Cosmetic Act 1940 (Amendment 2009), IPC 415, 420 (প্রতারণা), IPC 299 to 308 (অপরাধজনক নরহত্যা, অপরাধজনক নরহত্যা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ), IPC120 A&B (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র), IPC 319 to 338 (আঘাত, গুরুতর আঘাত), IPC 339 to 358 (অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ), IPC 268 (গন-উপদ্রপ), IPC 375 (ধর্ষণ), IPC 503 to 507 (অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন), IPC 508 (কোন ব্যক্তিকে সে দৈব আক্রোশ কবলিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য প্ররোচিত করিয়া কোন কার্য সম্পাদন করা), IPC 447 (অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ), IPC 354, 509 (শ্লীলতাহানি) এবং IPC 367 (ধর্ষণের চেষ্টা), IPC 425(অনিষ্ট) ইত্যাদি।
আইন অনুযায়ী যেকোনো অলৌকিক(?) কর্মকাণ্ড এর নামে ধান্ধাবাজি, বুজরুকী, ঝাড়ফুঁকের নামে অত্যাচার, ব্যভিচার, প্রতারণা করে তার যেকোনো রকম প্রাসার, প্রচার এবং প্রয়োগ নিষিদ্ধ এবং নূন্যতম শাস্তি ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন বা ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে। জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, বাবাজী, মাতাজী, ওঝা, গুণিন, জানগুরুদের বিভিন্ন বুজরুকী বা পরিকল্পিত হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ বহুবার জানানো হয়েছে।

"ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি"ই ভারতের একমাত্র সংগঠন, যারা ১৯৮৫ সাল (দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে) থেকেই উক্ত ভারতীয় আইনের প্রচার এবং তার প্রয়োগ করে চলেছে "জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, বাবাজী, মাতাজী, ওঝা, গুণিন, জানগুরুদের " বিরুদ্ধে যাদের অনেকেই আজ শ্রীঘরে। "জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, বাবাজী, মাতাজী, ওঝা, গুণিন, জানগুরুদের" উদ্দেশ্যে রইলো ভারতীয় বিজ্ঞান ও

যুক্তিবাদী সমিতির তরফে "৫০ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ", যে কেউ যেকোন রকম অলৌকিক (?) ঘটনা দেখাতে পারলেই উক্ত পুরস্কার সেই ব্যক্তির হাতে। এই চ্যালেঞ্জ এর সামনে আজপর্যন্ত ৭০০ ওপর অবতার, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক বুজরুকরা পরাজিত।
"ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি" র হাতে পরাজিতদের তালিকাটি বিশাল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন - তারাপীঠের তান্ত্রিক নির্মলানন্দ, গৌতম ভারতী, ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা, পুনের মিঠাইবাবা, সাইবাবা, সাইদাবাদী, আমেরিকার মরিস সেরুলো, ফকির এস পি আলি, সত্যানন্দ, বাবা রামদেব, অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলি, ক্লাইভ হ্যারিস, ভ্যাটিকানের পোপ (মাদার টেরিজার অলৌকিকতা!) প্রমুখ।
বুজরুক, অলৌকিক বাবাজী, মতাজী, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ঠগবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের আইন কি বলছে দেখা যাক:
"দ্যা ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবল অ্যাডভারটাইজমেন্টস) অ্যাক্ট, ১৯৫৪"-সংসদে প্রবর্তিত এই আইন ৩০ এপ্রিল ১৯৫৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং ১মে ১৯৫৪ তারিখে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি গেজেটের বিশেষ সংখ্যার দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ের ২৪ নং ক্রমে প্রকাশিত।

ড্রাগ সম্পর্কিত কিছু বিজ্ঞাপন এবং যাদু বা মন্ত্রবলে রোগ প্রতিকার হিসেবে বর্ণিত বিজ্ঞাপন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রবর্তিত। ১৯৬৩-তে আইনটি সংশোধন করা হয় এবং ৯(এ) ধারা সংযোজন করে বলা হল, এই আইন ভঙ্গকারীদের 'congnizable' অপরাধী হিসাবে গণ্য করা হবে।

জ্যোতিষ,তান্ত্রিক,ম্যাগনেটোথেরাপি,ফেংশুই সহ সমস্ত রকম বাবাজী মাতাজীদের শায়েস্তা করতে "দ্যা ড্রাগস অ্যান্ড কস্মেটিকস অ্যাক্ট ১৯৪০" আইনটি আরও কড়া হল l 19 মার্চ 2009 ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তর একটি নোটিশ জারি করে GSR 884 (E) The Drugs and Cosmetics Act (1940) Amendment. নোটিশে জানাল প্রতিটি ওষুধের ওজন, আয়তন, উপাদান সমূহের পরিমাণ ওষুধের লেবেলের গায়ে না সাঁটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে l ওষুধ সেবনের ফলে রোগীর মৃত্যু বা আশঙ্কাজনক ক্ষতি হলে ওষুধ প্রস্তুতকারকের শাস্তি আজীবন কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে ও দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও হতে পারে l [উক্ত আইনে "cosmetics" দ্রব্যাদিও পড়ছে এবং যা "ISI Standard" এর মান দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার পর বাজারে বিক্রি করা যাবে। তাহলে দেখাই যাচ্ছে "ধনলক্ষী যন্ত্র বা সৌভাগ্য জেমস" এর নামে কিভাবে এক দুর্নীতির চক্র চলছে আমাদের আশেপাশে!]

ওষুধ বা 'ড্রাগ' বলতে শরীরে যাহা কাজ করে বলে দাবি করা হবে যেমন তাবিজ, মাদুলি, কবজ, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই কিন্তু ড্রাগের মধ্যেই পরে
সাধারণ মানুষের কী করণীয় এই ভন্ডামীর বিরুদ্ধে:
আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গবাসী হন, এবং কোনও তান্ত্রিক বা জ্যোতিষী যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া আপনার কাছে কোনো তাবিজ,কবজ, মাদুলি বা ঐ ধরণের কিছু বিক্রয় করে থাকেন তবে আপনি আপনার অভিযোগ দায়ের করবেন এই ঠিকানায়--DIRECTORATE OF DRUGS CONTROL
P – 16, INDIA EXCHANGE PLACE EXTENSION, K.I.T. BUILDING – 5TH FLOOR, KOLKATA - 700 073, (+) 91 – (+) 33 – 2225 – 2214 / 9587 / 9610,TELE FAX: - 2225 – 2215, Email: psumana2021@gmail.com

অভিযোগ দায়ের করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, তান্ত্রিক-জ্যোতিষির রোগ সারাবার কোনো বিজ্ঞাপন পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার জেরক্স কপি অভিযোগ পত্রের সাথে যুক্ত করে দেবেন। মূল কাগজটি যত্ন করে রেখে দেবেন, মামলা চলাকালীন কাজে লাগবে l আপনার অভিযোগ পাওয়ার পর ড্রাগস কন্ট্রোল থেকে অভিযুক্তের কাছে জানতে চাইবে এই ধরণের তাবিজ কবজ (যা আইনের সংজ্ঞায় ওষুধ বা ড্রাগস) তৈরির বৈধ লাইসেন্স তার কাছে আছে কিনা l ড্রাগস কন্ট্রোলের দেওয়া লাইসেন্স ছাড়া ওষুধ বানানো বা বিক্রয়ের জন্য ওই জ্যোতিষী বা তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করবে ড্রাগস কন্ট্রোল l

মামলাটি হবে অভিযুক্ত তান্ত্রিক-জ্যোতিষি বনাম সরকারের। আপনাকে বড়জোর সাক্ষী দেওয়া ছাড়া কিছুটি করতে হবে না। এবং সর্বোপরি আপনার নিকটবর্তী পুলিশ থানা, বিডিও, এসডিও বা ডিএম অফিসে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে রাখুন।
তাহলে, আসুন আপনি আমি সহ সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বেআইনি এইসব পেশার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলি এবং নিথর প্রশাসনকে সচল করি, নচেৎ আইন বইয়ের মলাটে বন্দিই থাকবে অনন্তকাল অবধি।
তথ্যসহায়তায়: প্রবীর ঘোষ,অনাবিল সেনগুপ্ত, সন্তোষ শর্মা।

প্রসঙ্গে: দানপত্র বা উইল।

জেনে নিন কীভাবে করবেন উইল? মাথায় রাখতে হবে কোন বিষয়গুলি?

তথ্যসহায়তায়: কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিসরতা আইনজীবী শোহিনী চক্রবর্তী এবং মো. জে আর খান রবিন, বিশিষ্ট আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট

এই ভীতিপ্রদ প্যানডেমিকের আবহাওয়ায় সাধারণভাবে ‘উইল’ বা ইচ্ছাপত্র লেখার ঝোঁক যে বেড়েছে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, দুই-ই ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে নিজের পছন্দের যে কোনও ব্যক্তিকে দেওয়া যায়। এমনকী নিজের ‘Natural Heir’ বা উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করেও। এই প্রতিবেদনে এই নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা।

প্রথমেই জানা দরকার, কোনও ব্যক্তির উইল তাঁর মৃত্যুর পরই প্রযোজ্য হয়, জীবদ্দশায় কখনওই নয়। যে কোনও সাবালক ব্যক্তি স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে এবং নিজের ইচ্ছায়, অন্য কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উইল করতে পারেন। যিনি উইল সম্পাদন করেন, তিনি ‘টেসটেটর’ (Testator) এবং উইলের দ্বারা যে ব্যক্তি সম্পত্তি পান, তিনি ‘লিগেটি’ (Legatee)।

Testator (বা তাঁর নির্দেশমতো অন্য কেউ) যেন উইলটি সই করেন এবং সেটি যেন অন্তত দু’জন সাক্ষী (Attesting Witness) প্রত্যক্ষ করেন। এর পর সাক্ষীদেরও Testator-এর সামনে সেই উইলে Attesting Witness হিসাবে সই করতে হবে। তবে এই সাক্ষীদের দু’জনকেই এক সঙ্গে থাকতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা-একাধিক ব্যক্তি মিলে মিলিত বা Joint Will করতে পারেন।
Testator নিজের প্রয়োজনে পরবর্তীকালে উইলের কিছু পরিবর্তন বা সংযোজন করতে পারেন। আলাদা আর একটি ডকুমেন্ট করতে পারেন যাকে বলা হয় ‘কোডিসিল’ (Codicil)। অথবা আগের উইলটি ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে ফেলে নতুন করেও উইল লিখতে পারেন। আলাদা আলাদা সম্পত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন উইল সম্পাদন করা যায়। একই সম্পত্তির জন্য একাধিক উইল থাকলে, সবচেয়ে শেষের উইলটির বৈধতা থাকবে। Testator তাঁর উইলে এক বা একাধিক Executor নিযুক্ত করতে পারেন। Executor-এর দায়িত্ব হল Testator-এর মৃত্যুর পর কোর্টের মাধ্যমে উইলের প্রবেট নিয়ে উইল অনুযায়ী Legatee-দের সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া।

অনেকেই আইনজ্ঞদের কাছে জানতে চান যে কীভাবে ইচ্ছাপত্র লিখলে পরবর্তীকালে সেই উইলের প্রবেট নেওয়ার সুবিধা হবে। তাদের কথা মাথায় রেখে আমি কিছু সাধারণ পরামর্শ দিচ্ছি। টেসটেটরের যদি অক্ষরজ্ঞান থাকে এবং তাঁর যদি নিজের হাতে উইল লেখার ক্ষমতা থাকে, তাহলে তা নিজের হাতের অক্ষরে লিখুন। উইল যেন ভাল মানের কাগজে, ভাল মানের কালি ব্যবহার করে লেখা হয়।উইল লেখার কোনও নির্দিষ্ট ধরন বা format নেই। পরিষ্কার, ঝরঝরে এবং সহজভাবে বোধগম্য ভাষায় লিখুন। একের বেশি মানে বা ধারণা জন্মাতে পারে, এমন শব্দ বা ভাষা এড়িয়ে চলুন।উইলের প্রতি পাতায় Testator-এর সই থাকলে ভাল। উইলে যদি কোনও correction করা হয়, তার পাশে যেন Testator-এর short signature থাকে। উইলে উল্লেখিত সম্পত্তির যথাযথ বর্ণনা দিন। তেমনি Legatee-এরও যথাযথ বর্ণনা দিন যাতে তাঁকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। উইল যদিও বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রি করার প্রয়োজন হয় না তবুও রেজিস্ট্রেশনে সচেষ্ট হন।

উইল প্রবেটের সময় Attesting Witness-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত তাঁদের সাক্ষ্যই প্রমাণ করে যে উইল সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। সেই জন্য উইলের Attesting Witness ভেবেচিন্তে নির্বাচন করা উচিত। Legatee বা Executor-কে সাক্ষী না করাই ভাল। Testator-এর পরিচিত ব্যক্তিদের সাক্ষী করাই উচিত। Testator-এর অপরিচিত এবং Legatee-দের ঘনিষ্ঠ কাউকে Attesting Witness না করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়ত বলি, আপনার চেয়ে বয়সে ছোট বা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়েসি ব্যক্তিদের Executor এবং Attesting witness রাখুন। কারণটি বুঝতেই পারছেন, যাতে তাঁরা Testator-এর মৃত্যুর পরও আশা করা যায়, জীবিত থাকবেন। শুনতে খারাপ লাগলেও এঁদের বেঁচে থাকা উইল প্রবেটের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাজনক হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, যেহেতু সুস্থ মানসিক স্থিতি, উইল লেখার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা শর্ত, Testator-এর পরিচিত কোনও ডাক্তারবাবুকে একজন Attesting witness রাখতে পারলে খুব ভাল হয়। Testator যখন উইলে কোনও সম্পত্তি কোনও Legatee-কে দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে সেটি দেওয়ার কারণ উল্লেখ করলে ভাল হয়। তেমনই যদি তিনি তাঁর Natural Heir-দের বঞ্চিত করতে চান, তা করার কারণ উল্লেখ করলে ভাল।

Testator যদি নিরক্ষর হন, তাহলে সেই উইলে স্পষ্ট করতে হবে যে সেই উইলটি তাঁকে পড়ে শোনানো এবং বুঝিয়ে বলার পর তিনি তাঁর চিহ্ন বা mark রেখেছেন। উইল অবশ্যই কোনও সুরক্ষিত জায়গায় রাখুন। তবে এমন কোনও জায়গায় রাখুন যা আপনার মৃত্যুর পর সহজেই পাওয়া যায়। এবং Executor যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার প্রবেট নিতে পারেন।

ভারতবর্ষে Testamentary Succession-এর আইন Indian Succession Act 1925 দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য এই নিয়মগুলি ইসলাম ধর্মাবলম্বী বা ওই আইনে উল্লিখিত 'exempted person'-দের উপর কার্যকরী নয়। এই আইন অনুযায়ী একজন পিতা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক সন্তানের অভিভাবক উইলের মাধ্যমে নিযুক্ত করতে পারেন। Testamentary Succession সংক্রান্ত আইনের পরিসর যথেষ্ট বড় এবং কিছু ক্ষেত্রে জটিলও বটে। তাই মনে কোনও দ্বিধা না রেখে বা অনুরূপ হা-হুতাশ না করে পেশাদার আইনজীবির পরামর্শে উইল করুন। নিজের উত্তরাধিকারী নিজে পছন্দ করুন এবং সেই সম্পত্তি ভোগ করার তাঁর পথটি সহজ করে দিন। নির্ভুলভাবে লেখা উইলের কোনও বিকল্প হয় না।

Testator-এর মৃত্যুর পর কী করণীয়?

Testator-এর মৃত্যুর পর Executor উইলের প্রবেট পাওয়ার জন্য কোর্টে আবেদন করেন। অর্থাৎ উইল যে 'ভ্যালিড' (মিথ্যা নয়) তা দেখাই এখানে উদ্দেশ্য। যদি উইলে কোনও Executor নিযুক্ত না থাকে, অথবা Executor কোনও পদক্ষেপ না নেন, তাহলে Legatee-রা কোর্টের মাধ্যমে Letters of administration পেতে পারেন। সাধারণত প্রবেট বা লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' পেতে ডিস্ট্রিক্ট সিভিল কোর্টে যেতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে হাই কোর্টও হতে পারে।

মুসলিম আইনে উইল ও দান এর বিষয়ে আসুন জেনে নিই।

মুসলিম আইনে উইল ও দানের গুরুত্ব অপরিসীম। উইল একটি ইংরেজি শব্দ। যা আরবিতে অসিয়ত এবং বাংলায় ইচ্ছাপত্র বলে। আসলে অসিয়ত, উইল ও ইচ্ছাপত্র একই কথা। উইলের বিষয়ে মুসলিম আইনের ১১৫-১৩৪ ধারায় উল্লেখ রয়েছে। উইল সম্পত্তি হস্তান্তরের একটা মাধ্যম। যা পরে আরোপিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে নাবালক নয় এমন সুস্থ মস্তিষ্কের প্রত্যেক মুসলমান উইলের মাধ্যমে তার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে (ধারা-১১৫)।

উইলের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ১. উইলের কোনো নির্দিষ্ট ফর্মা বা ধরন নেই। তা ছাড়া উইল মৌখিক বা লিখিতভাবে কার্যকর করা যায় (ধারা-১১৬)। ২. কোনো ওয়ারিশের বরাবরে উইল করলে উইলকারীর মৃত্যুর পর অন্যান্য ওয়ারিশদের সম্মতিক্রমে মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশ কার্যকর হবে। অন্যথায় উইলটি বাতিল হবে (ধারা-১১৭)। ৩. কোনো মুসলিম তার সব ব্যয়ভার ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/৩ অংশ ওয়ারিশ ছাড়া অন্য যেকোনো ব্যক্তির বরাবরে উইল করতে পারে। এর বেশি করলেও উইলকারীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণের সম্মতি না থাকলে ১/৩ অংশের জন্য উইলটি কার্যকর হবে, এর বেশি কোনোভাবেই কার্যকর হবে না (ধারা-১১৮, ১১৯)। ৪. উইলকারীর মৃত্যুকালে অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে উইলের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না (ধারা-১২০)। ৫. উইল গ্রহণকারী ব্যক্তি উইলদাতার আগে মারা গেলে ওই উইল তামাদি দ্বারা বারিত বিধায় তা বাতিল হবে (ধারা-১২১)। ৬. উইল দাতার মৃত্যুর পর থেকে উইল কার্যকর হয় এবং উইলের বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব দাতার মৃত্যুর সময় বিদ্যমান থাকতে হয় (ধারা-১২২,১২৩)। ৭. উইলের কোনো শর্ত থাকলে ওই উইল বেআইনি হবে (ধারা-১২৪, ১২৫, ১২৬)। এবং ৮. কোনো মুসলিম উইল উপযুক্ত প্রমাণের পর প্রবেট গৃহীত না হলেও সাক্ষ্য আইনে যথার্থ উইল হিসেবে গৃহীত হতে পারে (ধারা-১৩১)। উইলদাতা তার উইলটি রদ বা বাতিলও করতে পারে। যেমন রদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা (ধারা-১২৮), উইলকৃত সম্পত্তিতে স্থাপনা নির্মাণ বা উইলের বিষয়বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন দ্বারা (ধারা-১২৯) এবং উইলকৃত সম্পত্তি পরবর্তী সময়ে অন্যের বরাবরে হস্তান্তর দ্বারা (ধারা-১৩০)।

মুসলিম আইনে 'দান' কী? বাংলায় যা দান আরবিতে তা হেবা এবং ইংরেজিতে গিফট। দানের বিষয়ে মুসলিম আইনের ১৩৮-১৭২ ধারায় এবং ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২২, ১২৩ ও ১২৯ ধারায় উল্লেখ রয়েছে। সাধারণত স্নেহ ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ বা প্রতিদানের বিনিময়ে বা পুণ্য লাভের আশায় বা অন্যান্য কারণে কোনো ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট সম্পত্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দান করে থাকেন। সুস্থ ও সাবালক প্রত্যেক মুসলমান তার সম্পত্তি দানের মাধ্যমে অন্যের বরাবরে হস্তান্তর করার জন্য উপযুক্ত (ধারা-১৩৯)। মুসলিম আইন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, 'দানের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন, ১. সাধারণ দান (ধারা-১৩৮) ২. বিনিময়সহ দান (হেবা-বিল-এওয়াজ, ধারা-১৬৮), ৩. শর্তযুক্ত বিনিময়সহ দান (শরত-উল-এওয়াজ, ধারা-১৬৯), ৪. সম্পত্তির আয় বা ফলভোগাধিকারের জন্য দান (আরিয়ত, ধারা- ১৭০) এবং ৫. সাদকা (ধর্মীয় পুণ্য বা নেকি অর্জনের লক্ষ্যে দান, ধারা-১৭১)।

সাধারণ দান বলতে কোনো বিনিময় বা প্রতিদান ছাড়া স্নেহ ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ কোনো ব্যক্তি তার সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় অন্য কোনো ব্যক্তির বরাবরে প্রদান করা এবং অন্য ব্যক্তি নিজে বা তার পক্ষে অন্য কেউ তা গ্রহণ করাকে বোঝায় (ধারা-১৩৮)। অন্যদিকে বিনিময়সহ দান (হেবা-বিল-এওয়াজ) বলতে বোঝায়, প্রতিদানের জন্য প্রদত্ত একটি দান, যা মূলত একটি বিক্রয় বিশেষ এবং দানদাতা কর্তৃক প্রতিদান গ্রহণ এবং দানগ্রহীতা কর্তৃক দানের বিষয়বস্তুতে দখল গ্রহণের শর্ত পূরণ হলেই তাকে বলা হয় শর্তযুক্ত বিনিময়সহ দান (শর্তে এওয়াজ)। এ ছাড়াও কোনো প্রতিদান ছাড়া দাতার ইচ্ছাধীন সময়ের জন্য দানকৃত সম্পত্তির আয় ভোগ করার জন্য অপর একজনের বরাবরে দান করাকে বলা হয় সম্পত্তির আয় বা ফলভোগাধিকারের জন্য দান এবং ধর্মীয় পুণ্য বা নেকি অর্জনের উদ্দেশ্য দান। মুসলিম আইন অনুযায়ী দানের বিষয়বস্তু সাধারণত বলবৎযোগ্য দাবি। দানের ৩টি শর্ত রয়েছে- ১. দানদাতা কর্তৃক দানের বিষয়বস্তু হস্তান্তরের প্রস্তাব, ২. দানগ্রহীতা নিজে বা তার পক্ষে অন্য ব্যক্তি কর্তৃক ওই প্রস্তাব গ্রহণ এবং ৩. দানের বিষয়বস্তুর দখল দানগ্রহীতার বরাবরে হস্তান্তর (ধারা-১৪৯)।

দানের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- দানের ক্ষেত্রে দানদাতার একটি সৎ মনোভাব থাকতে হয়, ওয়ারিশগণকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দান করলে তা বৈধ হয় না (ধারা-১৪০), ভূমিষ্ঠ হয়নি এমন ব্যক্তির বরাবরে দান করা যায় না (ধারা-১৪১) এবং দান যেকোনো ব্যক্তি বা দান দাতার যেকোনো ওয়ারিশের বরাবরে দান দাতার সমগ্র বা আংশিক সম্পত্তি দান করা যায় (ধারা-১৪২)। মুসলিম আইন অনুযায়ী মৌখিকভাবে দান করা যায়। দানের ক্ষেত্রে লিখিত দলিলের প্রয়োজন নেই (ধারা-১৪৭)।

দানের বিষয়বস্তুর ওপর থেকে দানদাতা সম্পূর্ণ রূপে মালিকানাস্বত্ব ও কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে হয় (ধারা-১৪৮)। দানের বিষয়ে দানগ্রহীতাকে দখল বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক (ধারা-১৫০, ১৫৬)। স্থাবর সম্পত্তির দখল দানগ্রহীতাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত দান সম্পূর্ণ হয় না। তবে দানদাতা ও দান গ্রহীতা যদি দানকৃত সম্পত্তিতে একত্রে বসবাস করে তাহলে দানের বিষয়বস্তু/দানকৃত সম্পত্তির দখল দান গ্রহীতার বরাবরে হস্তান্তরের প্রয়োজন নেই (ধারা-১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭)। দানের বিষয়বস্তু অবিভাগযোগ্য হলেও ওই দান বৈধ (ধারা-১৫৯)। তবে, ভবিষ্যতে দান সম্পূর্ণ করা হবে বা অনিশ্চিত কিছু ঘটলে দান কার্যকর হবে এমন কোনো দান বৈধ নয় (ধারা-১৬২)।

লিংক- ১) https://www.sangbadpratidin.in/personal-finance/must-know-facts-while-writing-a-will/

লিংক- ২) https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=161064

ঈশ্বর কে, আরটিআই প্রশ্নে থতমত সরকার

Who is God government stupefied by RTI question.

সংবাদ সংস্থা

ভূমিকম্পে দোকান নষ্ট হয়েছিল। "অ্যাক্ট অব গড" বলে টাকা দিতে চায়নি বিমা সংস্থা। তাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন "ওহ মাই গড" ছবির কাঞ্জিলালজি মেটারূপী পরেশ রাওয়াল। প্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও বাস্তবে ঈশ্বরকে আইনের প্যাঁচে টেনে আনলেন এক ব্যক্তি। আর তার জবাব দিতে হিমশিম খেল আইন মন্ত্রক।

ভারতে ঈশ্বরের নামে শপথ নেন প্রধানমন্ত্রী-সহ শীর্ষ সাংবিধানিক পদাধিকারী ও জনপ্রতিনিধিরা। সম্প্রতি তথ্যের অধিকার আইনের অধীনে শ্রদ্ধানন্দ যোগাচার্য নামে এক ব্যক্তি জানতে চান, এই ঈশ্বর কে। আর্জিটি গিয়েছিল রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে। সেখান থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ঘুরে সেটি যায় আইন মন্ত্রকে।

সরকারের কাছ থেকে উপযুক্ত জবাব না পেয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে যান শ্রদ্ধানন্দ। ভিডিও কনফারেন্সে আইন মন্ত্রকের এক অফিসার শ্রদ্ধানন্দকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, সংবিধানে "ঈশ্বর" শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা নেই। সরকারি রেকর্ডে যে তথ্য নেই তা তথ্যের অধিকার আইনে জানানো যায় না।

জবাবে খুশি হননি শ্রদ্ধানন্দ। তখন মুখ্য তথ্য আধিকারিক এস কে চিটকারা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, "সত্য", "ধর্ম", "জাতি" শব্দগুলির অর্থ সংবিধানে বলা নেই। তাই এ নিয়ে তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রদ্ধানন্দ জাতীয় স্মারক চিহ্নের নীচে থাকা "সত্যমেব জয়তে" শব্দটির অর্থও জানতে চেয়েছিলেন। চিটকারা তাঁকে জানান, ওই শব্দটি সংবিধানের কোনও ধারার অন্তর্ভুক্ত নয়। সত্য, ন্যায়, জাতি শব্দের অর্থ বোঝানোর কথা শিক্ষক বা আচার্যদের। তথ্যের অধিকার আইনে তা জানানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া কিছু কিছু শব্দ আদালতের রায়েও ব্যবহার করা হয়। সেগুলি রায়ের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে বুঝতে হয়।

এই সওয়ালের মাঝে তথ্য কমিশনার শ্রীধর আচারুলু শ্রদ্ধানন্দকে প্রশ্ন করেন, "আপনি নিজে ঈশ্বর বা সত্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন?" শ্রদ্ধানন্দ পারেননি।

শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধানন্দের আর্জি বাতিল করে শ্রীধর আচারুলু বলেন, "আবেদনকারী বুঝতে পারছেন না, তিনি যা চাইছেন তা হল জ্ঞান। তথ্য ভিন্ন বস্তু। দর্শন বা ঈশ্বরচিন্তা ব্যাখ্যা করা তথ্য আধিকারিকের কাজ নয়। আবেদনকারী সরকারি দফতরের প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন।"

কড়া ভাষায় আচারুলু বলেন, "এমন আর্জি সমাজের কোনও কাজে লাগে না।" সেই সঙ্গে আবেদনকারীকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, "যোগচার্যের মতো বড় নামের মানুষের এমন ফাঁপা আর্জি করা উচিত নয়। সত্য, ঈশ্বর, ধর্মের কথা জানতে গেলে তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করুন। নিজের অজ্ঞতা দূর করুন।"

"ওহ মাই গড" ছবিতে শেষ পর্যন্ত কাঞ্জিলালজিকে সাহায্য করতে এসেছিলেন খোদ ঈশ্বর। এই আর্জির জবাব দিতে গিয়ে সরকারি অফিসারেরা ঈশ্বরকে স্মরণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

https://www.google.com/amp/s/www.anandabazar.com/amp/india/who-is-god-government-stupified-by-rti-question-1.141985

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তে বোম্বে হাইকোর্ট একটি রায় এ স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে, রাষ্ট্র কাউকে তার ধর্ম জানাতে বাধ্য করতে পারবে না। তিনি কোনও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নন বা কোনও ধর্ম পালন করেন না -- এই দাবী করার সাংবিধানিক অধিকার আছে প্রত্যেক নাগরিকের। (State can compel none to declare or specify his/her religion. Citizens have Constitutional Right to belong to 'No Religion'.

----- Bombey H C Ruling

No person in India can be compelled to declare his religion

HIGH COURTS

Published on September 26, 2014By Editor

Bombay High Court: In a landmark judgment, a bench comprising of A.S. Oka and A.S. Chandurkar, JJ declared that by virtue of Article 25 of the Constitution, every individual has the right to claim that he does not practice or profess any religion and thereby directed the state that they cannot compel any individual to declare or specify his religion in any form or in any declaration.

In the present case the petitioners were members of a registered organization "Full Gospel Church of God". Though they believed in the existence of Lord Jesus Christ but they did not believe in any religion, much less Christianity. According to their belief, Lord Jesus Christ desired to have a kingdom of heaven and not to form any religion. Therefore, they wanted a gazette notification to be issued recording that they were not Christians and that they belong to 'no religion'. This application was rejected by Government Printing Press against which they filed a public interest litigation in Court.

The Court took into consideration various judgments including Commissioner of Police v. Acharya Jagadishwarananda Avadhuta (2004) 12 SCC 770 where it was stated that 'man's relation to his God is no concern of the State'. The Bench also observed that Article 25 (1); of the Constitution is in two parts. The first part confers fundamental right to freedom of conscience whereas the second part confers a right on a citizen to freely profess, practice or propagate any religion. The Court clarified that as freedom of conscience confers a fundamental right to entertain a religious belief, it also confers a right on an individual to express an opinion that he does not belong to any religion. Therefore, no authority which is a state within the meaning of Article 12 or any of its agency or instrumentality can infringe the fundamental right to freedom of conscience and thereby, the Court set aside the order of the Government Printing Press.Dr. Ranjeet Suryakant Mohite vs. Union of India, Public Interest Litigation No. 139 of 2010, decided on 23.09.2014

News Link: https://www.scconline.com/blog/post/2014/09/26/no-person-in-india-can-be-compelled-to-declare-his-religion/

ধর্ষণের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ, নির্যাতিতাকে বিয়ে করার-

ঘটনাটি মার্চ ২০২১ এর।

নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত একজন সরকারি কর্মী। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ, নির্যাতিতাকে বিয়ে করার। অভিযুক্ত যদিও বিবাহিত। কিন্তু নির্যাতিতাকে বিয়ে করতে চাইলে আদালতের তরফে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে। এমনকি তাঁর চাকরি যাতে না যায়, তা দেখবেন বলেও জানিয়েছেন। ভাবা যায়! মহিলাদের নিরাপত্তা কে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই রায়।

আচ্ছা, ধর্ষণের মতন জঘন্যতম অপরাধ কি বিয়েতে মকুব হয়ে যায়? এমন একজন অপরাধীর উদ্দ্যেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের এই উক্তি কি আরো কিছু অপরাধীদের তৈরীতে উৎসাহ যোগাচ্ছে না যারা আগামীদিনে ধর্ষণ করে নির্যাতিতাকে বিয়ে করার পরে সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে? খবরটির লিংক-
https://www.google.com/amp/s/www.anandabazar.com/amp/india/supreme-court-asked-rape-accused-government-worker-if-he-would-marry-the-victim-chief-justice-sa-bobde-draws-flak-from-social-media-dgtl/cid/1268940

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরেই সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য মাননীয়া বৃন্দা করাট, প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে কে এই ঘটনায় একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি এইরকম -

March 2, 2021

Press Release

Smt. Brinda Karat, Member, Polit Bureau of Communist Party of India (Marxist) had written the following letter to the Chief Justice of India on the observations that the CJI made into different cases yesterday.

To

The Chief Justice of India

Supreme Court

New Delhi

Sir,

I write to you in connection with the comments reportedly made by you in two cases in open court. The first is in in the case of a bail petition appeal by the rapist of a then minor girl student of Class 9, against the decision of the Aurangabad bench of the Maharashtra High Court which denied him bail, overturning the lower courts decision. It is reported by the site “Bar and Bench”, “.. CJI Bobde asked counsel for the petitioner, "Will you marry her?" To this, the advocate replied, "I will take instructions." .."You should have thought before seducing and raping the young girl. You knew you are a government servant," was CJI Bobde's response. "We are not forcing you to marry. Let us know if you will. Otherwise you will say we are forcing you to marry her," the CJI went on to observe. When the matter was heard again shortly thereafter, counsel for the petitioner said, "I wanted to marry her. But she refused. Now I cannot, as I am already married.”

The Court granted interim protection for four weeks to the rapist and asked him to apply for regular bail.

Sir,
These questions, words and actions have serious implications in granting of bail in cases of rape of minors. Please reconsider and withdraw these comments and questions and the bail you have granted to the rapist. Please uphold the judgment of the Aurangabad High Court which rules that bail granted to him by the lower court was "atrocious."
The girl was gagged and raped by this criminal, when she was just sixteen years old. He repeated his crime 10-12 times. The girl tried to commit suicide. Does this show consent? In any case, in the case of a minor, as this girl was, the law is clear that there is no issue of consent.

Chief Justice Sir, what about the victim, now 18 and what the effect such a question will have on her? Is her suffering, her trauma of no consequence, of no value? Rape victims are not robots whose thoughts and feelings are under remote control of others. Regardless of what her parents may have wanted the girl had reportedly refused the suggestion of marriage.

By such questions put to a rapist the message given is that a rapist can escape jail if after the crime he "agrees" to marry his victim whether she wants to or not. There is a prevailing retrograde social approach that the victim of rape is a "bad" woman and if the rapist marries her, she gains respectability in the eyes of society. Comments of the apex court should not give the impression of supporting such approaches.

In a crime of rape the processes of justice must keep the interests of the victim at the centre. Unfortunately in this case, the opposite has happened.

The second case relates to the comments reportedly made in the case of a bail petition hearing of a man who had sexual intercourse with a woman on the false promise that he would marry her. Under the law, this constitutes rape. However it is reported "The Supreme Court on Monday stayed the arrest of a man accused of rape by his former partner, asking `... however brutal the husband is... when two people (are) living as husband and wife... can sexual intercourse between them be called rape?'" Yes sir it can be called rape. Rape is determined not by a marriage certificate but whether or not the woman consented to have sexual intercourse. The comments reportedly made justify brutality and cause harm to the woman.

As one who has fought as part of women's movements both outside and within Parliament for changes in laws and perceptions regarding rape victims and their rights, I believe that the comments made by the court, constitute a setback for the struggle for justice.

I appeal to you to consider this letter as a request to withdraw the comments and decisions. Women hope that the power and strength of the highest Court is used to help victims of sexual assault not the perpetrators, even more so when the victims are minors.

Yours sincerely,
Sd/-
(Brinda Karat)

উক্ত বিষয়ে প্রধান বিচারপতি এস এ (শরৎ অরবিন্দ) বোবদে র এই নিন্দনীয় ও মহিলাদের প্রতি এই অসম্মানজনক রায় নিয়ে এনডিটিভি রিপোর্ট -

"Will You Marry Her?" Supreme Court Asked Government Worker In Rape Case

The Supreme court was hearing the bail request of Mohit Subhash Chavan, a technician with the Maharashtra State Electric Production Company. He has been accused of raping a schoolgirl and faces charges under the severe POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) law.

By A Vaidyanathan
1 March 2021 AT 13:41

The Supreme Court today asked a government employee seeking protection from arrest whether he would marry a woman who has accused him of rape.

The top court was hearing the bail request of Mohit Subhash Chavan, a technician with the Maharashtra State Electric Production Company. He has been accused of raping a schoolgirl and faces charges under the severe POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) law.

"If you want to marry we can help you. If not, you lose your job and go to jail. You seduced the girl, raped her," Chief Justice of India SA Bobde told the petitioner's lawyer, who argued that his client could lose his job.

The petitioner told the court his mother had offered marriage when the girl went to the police. But she had reportedly refused. Then a document was drawn up to say a marriage would take place once the girl turned 18. When she did, however, the man refused to marry her. That is when a rape complaint was filed against him, according to a petition filed by Chavan.

In a question that has been commented upon on social media, the Chief Justice asked the accused man: "Will you marry her?"

Chavan's lawyer replied: "Will take instructions." The Chief Justce said: "You should have thought before seducing and raping the young girl. You knew you are a government servant."

The Chief Justice said: "We are not forcing you to marry. Let us know if you will. Otherwise you will say we are forcing you to marry her."
The accused's lawyer said he would reply after consulting with his client.
Later, he told the Supreme Court: "Initially I wanted to marry her. But she refused. Now I cannot as I am already married."

He also said the trial was on and charges were yet to be framed. "I am a government servant and if I am arrested I will be suspended automatically," he said.
"That's why we have given you this indulgence. We will stay the arrest for four weeks. Then you apply for regular bail," said Chief Justice Bobde. The trial court had granted Chavan protection from arrest but the High Court had cancelled it.

The Supreme Court said he would not be arrested for four weeks and he could apply for regular bail.In another instance, a case relating to a matrimonial dispute before the Chief Justice-led bench was sent to mediation between the two sides.
"If you cannot live together gracefully then leave gracefully," the Chief Justice noted.

Recently, another man from Punjab accused of rape caught a reprieve from the Supreme Court on condition that he would marry the woman within six months. He was warned of jail if he broke his promise to marry the woman, who is now in Australia.

But in the case, the man had a relationship with the woman who accused him of rape and cheating after he refused to marry her.

খবরটির অনলাইন লিংক- https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-asked-government-employee-accused-of-rape-will-you-marry-her-2381025?amp=1&akamai-rum=off&pfrom=home-ndtv_bigstory&__twitter_impression=true

ধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সাধারণ সম্পাদক মণীশ রায়চৌধুরী লিখেছেন-
"ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি চিরকালই ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডেরই সমর্থক।

আমরা অবশ্যই হত্যার বদলে হত্যার মধ্যযুগীয় বর্বরতা'র রীতিতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু ভারতীয় আইনে বিরলতম অপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ডের যে বন্দোবস্ত আছে আমরা তার কট্টর সমর্থক। আশা করি, এটা আপনারাও স্বীকার করবেন যে কোন সভ্য সমাজে শিশু ধর্ষণ, গণধর্ষণ বা ধর্ষণ করে হত্যার ঘটনা বিরল অপরাধ হিসাবেই থাকা উচিত।
নাকি, মৃত্যুদন্ডের বিরোধী তথাকথিত মানবতাবাদীরা চান এসব জঘন্য অপরাধ আমাদের জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠুক?

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, "মৃত্যুদণ্ড দিলেই কি ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে?"
কেউ কেউ তো আবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন, "আপনি গ্যারান্টি দিতে পারেন যে মৃত্যুদণ্ড দিলেই ধর্ষণের ঘটনা শূন্য হয়ে যাবে?"
এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে মনুষ্যচরিত্র নিয়ে কিছু বিষয় জেনে নেওয়া প্রয়োজন।
আচ্ছা, একটি বার ভাবুন তো মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় কী?
মৃত্যু!!! আমি, আপনি, আমরা কেউই মরতে চাইনা। মৃত্যু জীবনের অটল সত্য জেনেও আমরা তা ভুলে থাকার ভান করি।

কিন্তু তারপরও এই সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা নিজের আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে পিছপা হননা।
এখানে আদর্শ বলতে আমি কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি আস্থাশীল বোঝাতে চেয়েছি।
সেই আদর্শ আমাদের চোখে প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল দুটোই হতে পারে কারণ মতাদর্শ বিষয়টি আপেক্ষিক।
আমার চোখে যিনি বিপ্লবী আপনার চোখে তিনি সন্ত্রাসবাদী হতেই পারে আবার উল্টোটাও হতে পারে।
সোজাভাবে বললে, কোন বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ বাদে অধিকাংশ মানুষই মরতে ভয় পায়।
প্রতিদিন আমাদের চারপাশে যে সকল ধর্ষণের ঘটনা ঘটে তার অন্তত ৯৭% (আসলে হয়তো ১০০% ই) এসকল ভোগী, লম্পট মানুষের দ্বারাই হয়।
আর এই শ্রেণীর মানুষের ১০০% ই ভীতু, স্বার্থপর হয়।
তাদের প্রাণে মৃত্যুভয় থাকবেনা তা অসম্ভব।

প্রশ্ন হলো, এতসব জেনেও তারা তাহলে ধর্ষণ করে কেন?
কারণ তারা জানে এদেশের পুলিশ, প্রশাসন কে বছরের পর বছর বিশেষ কারণেই মেরুদণ্ডহীন, অপদার্থ করে রাখা হয়েছে।
অগণিত ধর্ষণের ঘটনা থানার চৌকাঠ পেরোয়না। যদি বা থানায় গেল তাহলেও সেখানে রিপোর্টই লেখা হয়না।
অপরাধী যদি ক্ষমতাশালী হয় তাহলে তো পুলিশ নিজেই তার এজেন্ট হয়ে নির্যাতিতা বা তার পরিবারকে নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করে চাপ দিয়ে কেস ডিসমিস করতে চায়।
এমনকি ধর্ষণের রিপোর্ট লেখাতে এসে ধর্ষিতাকে থানার ভিতরেই ধর্ষিতা হতে হয়েছে এরকম ঘটনার কথা কান পাতলে শোনা যায়।

এতকিছুর পরেও যদি রিপোর্ট ফাইল হয়, তাহলে পুলিশ অপরাধী কে "খুঁজেই পায়না"।
তারপরও যদি ধরা পড়ল তখন বছরের পর বছর বিচার চলতে থাকে।
হয়তো লোয়ার কোর্ট মৃত্যুদন্ড দিল তাহলে হাইকোর্ট, তারপর সুপ্রিমকোর্ট আছে।
মৃত্যুদন্ড বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যায়।
সুপ্রিম কোর্টের রায়েও যদি মৃত্যুদণ্ড বজায় থাকে তাহলে অপরাধী রাষ্ট্রপতির কাছে সুযোগ পায়।
তথাকথিত কিছু মানবাধিকার কর্মী যারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন তারাই পথসভা শুরু করেন, "কোন রাষ্ট্র কি তার নাগরিক কে বর্বরভাবে হত্যা করতে পারে?"
বন্ধুরা নিজেরাই বিবেচনা করুন, যেখানে ধর্ষিতা আত্মরক্ষার জন্য সামান্যতম সুযোগ পায়না সেখানে একজন নরপশু ধর্ষক, খুনি আত্মরক্ষার কতরকম সুযোগ সুবিধা পায়।

ভোগী, লম্পট অপরাধী যখন জানেই যে সে জঘন্যতম অপরাধ করেও আইনের সাথে
চু-কিতকিত খেলে বেঁচে যাবে, এমনকি ধরা পড়লেও প্রাণে মরবেনা তখন সে তো অপরাধ করবেই।
ধর্ষক নাবালক হলে তো মশাই (এদেশে আবার ধর্ষকরা নাবালকও হয়!) কথাই নেই।

জুভেনাইল কেস, তাই কয়েক বছর হোমে রেখে হাতে সেলাই মেশিন ধরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
ধর্ষণের মত এতবড় কাজ করেছে অন্তত একটা সেলাইমেশিন তো প্রাইজ দিতেই হয়।

যতদিন না ধর্ষণের ঘটনা কে দ্রুত বিচার করে মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত করা হবে ততদিন এসব চলতেই থাকবে।
ধুর, ছাড়ুন তো মশাই!
এত ভেবে কী হবে?
কাগজে পড়লাম কোন এক ক্ষমতাসীন নেতা ভারতমাতার মূর্তি তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন তাই নিয়ে মশগুল থাকি।
হাজার হোক, আমার বাড়িতে তো কিছু হয়নি!!!"

ইচ্ছামতো ধর্ম গ্রহণ ভারতে।

১৮ বছরের বেশি বয়সী যে কোনো নাগরিক তার ইচ্ছামতো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে বলে সংবিধানে অধিকার দেয়া রয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার ভারতের উচ্চ আদালতে অশ্বিন উপাধ্যায় নামে আইনজীবীর আবেদনের প্রতিউত্তরে এমন মন্তব্য করেছেন। এছাড়া এ বিষয়ে 'এরকম ক্ষতিকর' পিটিশন করার জন্য নিন্দাও জানিয়েছে আদালত। অশ্বিনের আবেদন ছিল, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মান্তরকরণ বন্ধের জন্য সর্বোচ্চ আদালত কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোকে যেন নির্দেশ দেয়। সংবিধান বিরোধী এমন আবেদন করায় অশ্বিনের আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণকে নিন্দা জানিয়েছেন বিচারপতি আর এফ নরিম্যান, বি আর গাভাই ও ঋষিকেশ রায়কে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ। বিচারপতিরা বলেন, একজন সিনিয়র আইনজীবী হওয়ার পরও সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারের বিষয়ে জানা নেই আপনার। যদি না জানেন তাহলে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব করার আগে তা জেনে নিতে পারেন। এভাবে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য আমরা আপনার এবং আপনার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারি। সূত্র- দ্য হিন্দু।

খবরটির লিংক - https://m.dailyinqilab.com/article/372707/%E0%A6%87%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87

শুরুতেই একটি বিশেষ খবরে চোখ রাখা যাক। ঘটনাটি ২০১৮ সালের। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অন্দরে জন্মাষ্টমী পুজোপাঠের উদ্বোধন করেছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্র- https://eisamay.indiatimes.com/west-bengal-news/kolkata-news/bjp-ignore-west-bengal-assembly-janmashtamai-programme/articleshow/85710497.cms

বিধানসভায় এভাবে পুজোপাঠের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ নিয়ে সরব হয়েছিলেন বেশকয়েকটি বিজ্ঞান ও যুক্তিমনষ্ক সংগঠনের সদস্যরা। তাদের দাবী ছিল সংবিধানে (The Constitution of India) উল্লেখিত ভারত একটি "ধর্মনিরপেক্ষ" রাষ্ট্র (Secular County)। ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান কার্যকর করা হয়। এরপরে ১৯৭৬-সালের ১১ নভেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট অনুমোদিত এবং ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক শব্দটির সাথে যুক্ত হয় ধর্মনিরপেক্ষ বা Secular ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদে ' ধর্মনিরপেক্ষ ' (Secular) শব্দটি ব্যবহার করে লেখা হয়েছে -

"We The People Of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens; "। অর্থাৎ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হল সংবিধানের মৌলিক নীতি।

ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির কোনোরকম সংজ্ঞা না উল্লেখ থাকলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (ইংরেজি: Secularism) শব্দটির বিস্তৃত অর্থ রয়েছে।তবে ধর্মনিরপেক্ষবাদ বলতে সাধারণত রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উপর নির্ভরশীল থাকেনা। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না। কাউকে ধর্ম পালনে বাধ্য করা হবে না। সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র

সবার"। রাজনৈতিক ব্যবহারের দিক থেকে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে সাধারণ আইনজারি এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়।"

এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি হবে সম্পূর্ণ ধর্ম বর্জিত। রাষ্ট্রনায়কগণ কোনভাবেই প্রকাশ্যে ধর্ম-আচরণ করতে পারবেন না।একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সাধারন মানুষ থেকে রাষ্ট্রনায়কগণ প্রকাশ্যে নয়, তবে ব্যাক্তিগত ভাবে ভাবে ধর্মাচরণ করতেই পারেন।

সংবিধান যেহেতু প্রতিটি মানুষকেই ধর্মীয় অধিকার দিয়েছে তাই আমজনতা যেমন ধর্মচারণ করতে পারেন,আবার তেমনই কেউ জন্মসূত্রে পাওয়া প্রতিষ্ঠানিক ধর্মকে (হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি) সম্পূর্ণ ত্যাগ করে জীবনে এগিয়েও চলতে পারেন।

নিরপেক্ষ শব্দের অর্থ কোনো বা কারোর পক্ষেই থাকা নয়। রাষ্ট্রকে ধর্মবর্জিত রাখতে রাষ্ট্রনায়ক যথা, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, সরকারি আমলাদের প্রকাশ্যে ধর্মচারণ বে-আইনি। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম কেবল ব্যাক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপার হতে পারে।

অনেকেই হয়তো জানেন না, এই শর্তকে লঙ্ঘন করলে, অর্থাৎ রাজনীতি বা ভোটব্যঙ্কের স্বার্থে কোনো নেতামন্ত্রীরা প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ করে অ-ধর্মনিরপেক্ষ কাজকর্মের সাথে জড়িয়ে থাকলে সংবিধানের "দ্য রিপ্রেজেন্টেসন অফ পিপলস অ্যাক্ট ১৯৫১" (অ্যামেন্ডমেন্ট ১৯৮৯) এর ২৯ক ধারায় ঐ নেতা মন্ত্রী কিংবা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দলটির স্বীকৃতি খারিজ করার বিধান রয়েছে নির্বাচন কমিশনের হাতে।

৩রা জানুয়ারি, ২০১৭ সালে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে ভোট চাওয়া বা ভোট না দিতে প্ররোচিত করাকে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ বলেই রায় দিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির বেঞ্চে চার জন বিচারপতি এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, কেবল প্রার্থী নয়, ভোটারদের ধর্ম-বর্ণের ধুয়ো তুলেও প্রচার করা যাবে না।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৩(৩) ধারায় ধর্ম, জাতি, ভাষা, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া অবশ্য এমনিতেই নিষিদ্ধ। শীর্ষ আদালত বলেছে— কেবল প্রার্থী নয়, প্রচারে আনা যাবে না ভোটারদের ধর্ম, জাতি, ভাষার কথাও। এমনকী প্রার্থীর এজেন্টের সামাজিক পরিচয়ের জোরেও ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা যাবে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কার্যকর করা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দিহান অনেক রাজনীতি বিশ্লেষকগণ। তাঁদের কথায়, "ধর্ম, জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট চাইলে প্রার্থিপদ বাতিল করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। তারা বড়জোর আদালতে যেতে পারে।"

এই বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে হলে আইন করে কমিশনকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু তা করতে ভয় পায় সব রাজনৈতিক দলই। কারণ ধর্ম, জাতপাতের অঙ্ককে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাদের নেই। আমাদের এটাও স্মরণে রাখতে হবে সংবিধানকে বদলে মনুসংহিতার শাসন চাওয়া, অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্রর দাবী জানানো, প্রকাশ্যে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করে আমজনতার মগজধোলাই করা, ধর্ম এবং জাতপাতের নামে হিংসা ও বিদ্বেষকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সমর্থন জানানো অ-ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাজনৈতিক দল ২০১৩ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছ ধর্মীয় মেরুকরণকে অস্ত্র করেই। মজার বিষয় এটাই নিজদের ধর্মনিরপেক্ষ দাবী জানানো কোনো রাজনৈতিক দলই নির্বাচন কমিশন থেকে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়নি উক্ত রাজনৈতিক দলটির অসাংবিধানিক কাজের জন্য স্বীকৃতি বাতিলের দাবীতে।

ভারতীয় সংবিধানে আর্টিকেল ৫১এ (এইচ) পার্ট ৪এ [Article 51A(h) Part iv A] তে উল্লেখ রয়েছ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকদের কর্তব্য হচ্ছে, বিজ্ঞানমনস্কতা, মনুষ্যত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সাধনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো (It shall

be duty of every citizen of India to develop the scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform)।

নির্বাচন ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া, ধর্ম-বর্ণের নামে ভোট চাওয়া যাবে না: সুপ্রিম নির্দেশ

-নির্ণয় ভট্টাচার্য্য

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া..." কবি নজরুলের এই অমোঘ উচ্চারণই যেন আজ প্রতিধ্বনীত হল সুপ্রিমকোর্টের সাত সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে। আদালত আক্ষরিক অর্থে ঐতিহাসিক এক রায়ে আজ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, জাত-ধর্ম-বর্ণের আবেগকে 'কাজে লাগিয়ে' কোনও রাজনীতিক ভারতীয় ভূখন্ডে ভোট ভিক্ষা করতে পারবেন না। আর কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যদি তা করে থাকেন, তাহলে সেই কাজকে নির্বাচনী আইনের আওতায় 'দুর্নীতি' হিসাবেই গণ্য করা হবে।

শীর্ষ আদালতের স্বচ্ছ উক্তি, ভোট বা নির্বাচন একটি আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া, সেখানে ধর্মীয় (বর্ণ বা জাতি) আবেগের কোনও স্থান নেই। সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ আরও বলেছে যে, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে 'ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রে'র উপর প্রতিষ্ঠীত, রাষ্ট্র সেখানে কোনও ভাবেই নাক গলাতে পারে না।

প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শীর্ষ আদালতের আজকের এই রায়ে নড়েচড়ে বসেছে তামাম রাজনীতিক মহল। কারণ, উত্তর প্রদেশের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 'স্পর্শকাতর' রাজ্যের নির্বাচনে প্রয়শই জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের জিগির তুলে ভোটে ফায়দা তোলার চেষ্টা নতুন নয়। ফলে আজকের সুপ্রিম নির্দেশের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের 'সংস্কৃতি'তে অভ্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি বেশ কিছুটা বেকায়দায়। তবে, শুধু উত্তর প্রদেশই নয়, সারা ভারতেই বিভিন্ন এলাকায় ভোট টানতে 'ভাবাবেগ'-এ ভরসা রাখেন দলমত নির্বিশেষে অনেক 'ঘোষীত ধর্মনিরপেক্ষ' দলও। ধর্মীয় ভাবাবেগের ঘোলা জলে মাছ ধরতে 'পটু' এইসব মৎস্যজীবীদের কার্যত আজ হুঁশিয়ার করল দেশের শীর্ষ আদালত।

India Supreme Court bans election appeals using religion or caste

The Indian Supreme Court has ruled that politicians cannot use religion or caste to seek votes.
"Religion has no role in electoral process, which is a secular activity," the judges said in their ruling.

The court said using religion or caste to seek votes amounted to corrupt practices under electoral laws. The landmark ruling comes just weeks ahead of the crucial election in Uttar Pradesh state where the two issues generally dominate polls. Monday's ruling said the relationship between man and God was an individual choice and the state was forbidden from interfering in such an activity.
The ruling was passed by a seven-judge bench headed by Chief Justice TS Thakur, although there was a difference of opinion among the judges - four supported the order while three differed with it.

The three dissenting judges said "discussion on caste, creed and religion is constitutionally protected within and outside elections and this cannot be restricted" and that the issue should be left to parliament to decide.

Caste and religion are often central to Indian elections - most parties select candidates based on their religion or caste and campaigning often involves appealing to voters on these issues.
The court was hearing a question first raised in 1990 in a court in the western state of Maharashtra, which asked whether this was legitimate in elections.
সূত্র- https://www.bbc.com/news/world-asia-india-38487409

সরকারের বিরোধিতা মানেই দেশদ্রোহিতা নয়, ফারুক মামলায় মত সুপ্রিম কোর্টের

নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেই 'দেশদ্রোহী'-র তকমা জোটে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বহু বারই এমন অভিযোগ করেছেন বিরোধী নেতা-নেত্রীরা। তবে সরকারের বিরোধিতা করলেই যে তা 'দেশদ্রোহী' হওয়া, তেমন মনে করে না দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, "সরকার-বিরোধী মতপোষণ করা বা সরকারের বিরোধিতা করলেই তা দেশদ্রোহিতা, এমনটা বলা যায় না।" জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ফারুক আবদুল্লার বিরুদ্ধে একটি আবেদনের শুনানিতে এই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের।

সুপ্রিম কোর্টে ফারুকের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন রজত শর্মা এবং নেহ শ্রীবাস্তব। তাঁদের দাবি, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খারিজ করা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে চিন এবং পাকিস্তানের সাহায্য নিয়েছেন ফারুক। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শ্রীনগরের সাংসদ ফারুকের মন্তব্যেরও সমালোচনা করেছেন তাঁরা। ফারুককে দেশবিরোধী আখ্যা দিয়ে আবেদনকারীদের মন্তব্য, "ফারুকের সংসদীয় সদস্যপদ কেড়ে না নেওয়া হলে ভারতে তাঁর মতো দেশদ্রোহীদের কাজকর্মেই উৎসাহ দেওয়ার শামিল হবে। দেশের ঐক্যের পক্ষে যা ক্ষতিকারক।"

যদিও আবেদনকারীদের দাবি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, ফারুকের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন আবেদনকারীরা। সেই সঙ্গে বুধবার ওই মামলায় আবেদনকারীদের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

২০১৯ সালের অগস্টে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে দেয় মোদী সরকার। সেই সঙ্গে ওই রাজ্যকে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ— দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়। তার পর থেকেই ফারুক-সহ উপত্যকার একাধিক রাজনীতিককে গৃহবন্দি করে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বরাবরই সরব ৮৩ বছরের ফারুক। গৃহবন্দিত্ব কাটতেই রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের পক্ষেও দাবি জানিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁকে ফের বন্দি করা হয়েছে বলেও শোনা গিয়েছে।
খবরটির লিংক- https://www.anandabazar.com/india/expressing-different-views-from-government-cannot-be-termed-as-sedition-says-supreme-court-dgtl/cid/1269247

নাস্তিকদের তা হলে কী হবে, মহুয়ার মামলা সুপ্রিম কোর্টে

-অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের কোথাও বলা হয়নি তাঁদের অধিকারের কথা। অথচ আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারে এ দেশে পালিয়ে আসা নাস্তিকরা সংখ্যায় খুব একটা কম নন। কী হবে তাঁদের ভবিষ্যত? কোনওরকম ধর্মাচরণে বিশ্বাস না রাখা এই উদ্বাস্তুরা কেন ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন না? শীর্ষ আদালতে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।
'নতুন কেন্দ্রীয় আইনে তিনটি পড়শি দেশে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হওয়া সেদেশের সংখ্যালঘু যারা ভারতে পালিয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে মাত্র ছটি সম্প্রদায়কে এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আহমেদিয়া মুসলিম, হাজারা মুসলিম, শিয়া মুসলিম, ইহুদি, নাস্তিকরা এই শ্রেণিভুক্ত নন। কী ভাবে এদের কেন্দ্রীয় আইনের প্রেক্ষিত থেকে বাইরে রাখা হল?' জনস্বার্থের মামলায় প্রশ্ন মহুয়া মৈত্রের। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ বোবদের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বুধবার এই মামলার শুনানি করবে। একইসঙ্গে শুনানি হবে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা এক ঝাঁক মামলার। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল,

এখনও পর্যন্ত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রই একমাত্র মামলাকারী যিনি পড়শি দেশ থেকে ভারতে আসা অন্য সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছেন কোনও ধর্মবিশ্বাস না রাখা নাস্তিকদের ভবিষ্যত নিয়ে। তাঁর দাবি, ২০১২ সালের 'উইন গ্যালপ গ্লোবাল ইনডেক্স অফ রিলিজিয়ন রিপোর্ট' অনুযায়ী এ দেশের মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশ ঘোষিত নাস্তিক। এই হিসেবে ১৩০ কোটির দেশে নাস্তিকদের সংখ্যা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ। তাঁদের মধ্যে আছেন পড়শি দেশ থেকে পালিয়ে আসা নাস্তিকরাও।

নতুন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে তৃণমূল সাংসদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে দেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস। বলা হয়েছে -'সত্তর বছর আগে ১৯৪৯ সালের ১০,১১ এবং ১২ অগস্ট দীর্ঘ আলোচনার পরে দেশের সংবিধান প্রণেতা ও আইনি বিশেষজ্ঞরা একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতের নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্মাচরণকে কোনওভাবেই প্রাধান্য দেওয়া হবে না। তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল নাগরিকত্বের নিরপেক্ষ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হবে 'জাস সলি' অর্থাৎ জন্মস্থানের ভিত্তি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫-এ এই বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তার পরেও কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রবর্তন করে, যেখানে দেশের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য ধর্মীয় ভিত্তিকেই প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে?' তাঁর প্রশ্ন মায়ানমারে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হওয়া রোহিঙ্গা মুসলিম, শ্রীলঙ্কার সংখ্যালঘু তামিল, চিনের উইঘুর মুসলিম ও তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাঁরা অত্যাচারের হাত থেকে ভারতে পালিয়ে এসেছেন, তাদের এ দেশের নাগরিকত্ব প্রদান নিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকার যে ছ'টি সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেবে বলে স্থির করেছে, তার মধ্যে তাঁরা নেই।

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনে অভিযোগ জানিয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেছেন, '১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ২ ধারায় সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে দেশের নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্তকে ফাস্ট ট্র্যাক করছে, তা প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের ১৪ ধারায় উল্লিখিত জনসাধারণের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করছে। ২০১৯ সালের সংশোধনী ভারতের সংবিধানের পার্ট-৩-এর পরিপন্থী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষার জন্য ভারত সরকারের যাবতীয় অঙ্গীকারকে অস্বীকার করছে এই নীতি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রধান শর্ত হল ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের মত বিভেদকামী কোনও মন্তব্য না করা এবং সবার সমান অধিকার সুরক্ষিত রাখা। নতুন আইন এই ভিত্তিকে খণ্ডন করছে।'

https://eisamay.indiatimes.com/nation/mahua/articleshow/72773979.cms

কলেজে ভর্তির ফর্মে সবার উপরে মানবধর্ম

ধর্মের নাম মানবতা। পড়ুয়াদের ভর্তির ফর্মে এ বার চাইলে এমনটাও লিখতে পারেন কোনও আবেদনকারী। এ বছর ভর্তির জন্য অনলাইনে ফর্মে পড়ুয়াদের জন্য এই সুযোগ করে দিচ্ছে কলকাতার বেথুন কলেজ এবং মেদিনীপুর কলেজ।

গত সোমবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে সেই রাত থেকেই অনলাইনে বিভিন্ন কলেজের ফর্ম পূরণ শুরু হয়েছে। আর সেখানেই বেথুন ও মেদিনীপুর কলেজের জন্য ফর্ম ভর্তি করতে গিয়ে আবেদনকারী ছাত্রীরা দেখতে পাচ্ছেন, ধর্মের কলামে তালিকার প্রথমেই রয়েছে মানবধর্ম। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট বা অন্য যে কোনও ধর্মকে বাদ দিয়ে মানবতাকে নিজের ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ পাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।

কেন এই উদ্যোগ? বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা মমতা রায় জানাচ্ছেন, গত বছরও কলেজে ভর্তির অনলাইন ফর্ম থাকলেও তাতে মানবতাকে নিজের ধর্ম বলে বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। তিনি বলেন, “অনেক আবেদনকারী হয়তো কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করেন না। তিনি হয়তো শুধু মানবধর্মে বিশ্বাসী। এই আবেদনকারীরা ওই কলামে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান-সহ নানা ধর্মের মধ্যে ‘অন্যান্য’ বলে যেখানে উল্লেখ থাকত তা বেছে নিতেন। অনেকে আবার লিখে দিতেন ‘নন বিলিভার’। এ বার থেকে তাঁরা নিজের মত আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারবেন।” অধ্যক্ষার মতে, মানবতা ছাড়া যে কোনও ধর্মই হয় না, সেই বার্তাও এর মাধ্যমে

নবীন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে। আর মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র বেরা বলছেন, ‘‘মানুষের প্রথম পরিচয় সে মানুষ। মানবতাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই কলামটি এমন রাখা হয়েছে।’’

বেথুনের অধ্যক্ষা অবশ্য জানাচ্ছেন, সুষ্ঠু ভাবে ভর্তির মেধা-তালিকা বার করাটাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। তবে তার মধ্যেই ছোট ছোট বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এ বার অনলাইনে ভর্তির আবেদনপত্র প্রকাশের আগে কলেজে অ্যাডমিশন কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এ বারের আবেদনপত্রে ধর্মের তালিকায় স্থান পাবে মানবধর্ম।

বেথুন ও মেদিনীপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন আবেদনকারী ছাত্রী থেকে শুরু করে তাঁদের অভিভাবকদের অনেকেই। তাঁদের একাংশের মতে, এর ফলে অনেকেই নিজের মত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন।

তবে শুধু কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেই নয়। চাকরির আবেদন থেকে শুরু করে নানা জায়গায় ফর্ম ভর্তি করার সময়ে ধর্মের নাম লেখার একটি জায়গা থাকে, যা আবেদনকারীকে লিখতেই হয়। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের নামের সঙ্গে সঙ্গে ‘অন্যান্য’ বলেও লেখা থাকে। বেথুন কলেজের মতো এ বার সেই সব জায়গায় ধর্মের কলামে মানবতাকে রাখা যেতেই পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মনে করছেন, সব ধর্মেরই মূল কথা মানবতা। এখন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক সময়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়। আসলে ধর্মে ধর্মে কিন্তু কোনও বিভেদ নেই। শীর্ষেন্দুবাবুর কথায়, “আজকাল অনেকেই ধর্মীয় পরিচয় দিতে চান না বা দিতে লজ্জা পান। সে ক্ষেত্রে মানবতাকে বেছে নেওয়ার এই সুযোগ থাকাটা ভাল। তাতে আবেদনকারীকে একটা স্বাধীনতাও দেওয়া হল।”

সমাজতত্ত্বের শিক্ষক অভিজিৎ মিত্র এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, “এই উদ্যোগ অনুসরণযোগ্য।”
https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/bethune-college-and-midnapore-college-included-humanities-in-their-religion-section-1.999637

যে কোনও ভারতীয়র অধিকার রয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার’, রায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: সমাজ সংস্কারক পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর অনুগত এবং দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সদস্যদের সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার রয়েছে ঈশ্বর এবং ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার। ঠিক যেমন অন্যদের অধিকার আছে ঈশ্বর বিশ্বাসে।এই রায় ঘোষণা করল মাদ্রাজ হাই কোর্ট।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দানের সময়ে বলে, ‘মামলাকারীর যদি অধিকার থাকে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারা অনুযায়ী ঈশ্বারের অস্তিত্ব এবং ধর্মা সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশের, তাহলে সুপ্রিম কোর্টেক লালাই সিং যাদব মামলার উদাহরণ তুলে আমরাও বলছি পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর অনুগত এবং দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সদস্যদেরও ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ঈশ্বরকে অস্বীকার করার। ’ডিভিশন বেঞ্চে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি এস মণিকুমার এবং সুব্রামোনিয়াম প্রসাদ।

১৯৬৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সমাজ সংস্কারক পেরিয়ার ই ভি রামস্বামী জীবিত থাকাকালীন ত্রিচিতে উন্মোচিত হয় তাঁর একটি মূর্তি। উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সি এন আন্নাদুরাই। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে কামরাজও। তাঁর সেই মূর্তির নিচে লেখা হয়েছিল, ‘ঈশ্বর বলে কেউ নেই... ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্বই নেই। যে ঈশ্বরের জন্ম দিয়েছে সে ভীষণই বোকা। যে ঈশ্বরের প্রচার করেছে সে স্কাউনড্রেল এবং যে ঈশ্বরের আরাধনা করে সে বর্বর, আদিম।’

মামলাকারী এম দেইভানয়াগমের দাবি ছিল, এই ধরনের আক্রমণাত্মক এবং আপত্তিকর মন্তব্য পেরিয়ার কোনওদিনও করেননি এবং তাঁর মৃত্যুর পর এই সব কথা লেখা হয়েছিল মূর্তির নিচে। দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সভাপতি এর বিরোধিতা করে বলেন, 'থানথাই পেরিয়ার আগে থেকেই বুঝেছিলেন, তাঁর মূর্তির নিচে এই কথাগুলি লেখা না হলে কিছু বছর পর তাঁকেই ঈশ্বর জ্ঞানে মানুষ পুজো করা শুরু করবে। সেই জন্যেই এই কথাগুলি তিনি বলে গিয়েছিলেন।'

https://eisamay.indiatimes.com/nation/madras-high-court-declares-that-indian-constitution-has-given-right-to-its-citizens-to-deny-gods-existence/articleshow/71006042.cms

ধর্মের কলামে লেখা হোক 'মানবতা' আর্জি যুক্তিবাদী সমিতির

৩ জুন ২০১৯ এ "ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি"র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি এবং পুরুলিয়া শাখার সম্পাদক মধুসূদন মাহাতো, সিধু কানু বিরষা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Sidhu-kanho-Birsha University) ভাইস চ্যান্সেলর এবং রেজিস্টার কে তাদের বিভিন্ন ফর্ম (Form) এ ধর্মীয় (Religion) কলামে মানবতাবাদ বা মানবধর্ম রাখার আবেদন জানান।

অনেকে হয়তো ভাববেন, বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে ৪২০০টি প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম (Religion) থাকতে হটাৎ মানবধর্ম কেন বা কি প্রয়োজনে? আসলে, সমস্ত ধর্মেই নিজেদের কে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানায়। মানবতা এবং পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার লোকদেখানো প্রচারও করে থাকে কিন্ত সেটাই যদি সত্য হতো তাহলে ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে হিংসা, বিদ্বেষ, রক্তপাতের খবর শোনাই যেতো না। 'ধর্ম মানবতা শেখায় ' কথাটা আসলে সোনার পাথরবাটির মতন ব্যপার। এটি সর্বৈব মিথ্যে এবং অপপ্রচার।

প্রথম মানবধর্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে নিউইয়র্কে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অধিকার ঘোষণার অনেক আগে। এই মানবধর্মীরা তখন ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ১৯২৯ সালে পাশ্চাত্যে "Humanism" নামে যে নতুন Ism বা মতবাদের জন্ম হয়েছিল সেটা ছিল ইহুদি- খ্রিস্টান কট্টর পন্থীদের অবিরাম সংঘর্ষের একটা ফলস্বরূপ। তখনকার গণ্যমান্যরাই ছিলেন এই দলে। এঁরা মানবধর্মকে অন্য সমস্ত প্রচলিত ধর্মের বিকল্প হিসেবে চেয়েছিলেন। এদের উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন Albert Einstein, Will Durant, Thomas Mann, Julian Huxley ইত্যাদি জ্ঞানী গুণী যোদ্ধারা। এদের পথপ্রদর্শক ছিল আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান। তাদের আস্থা ছিল, প্রত্যয় ছিল কিন্তু ছিল না অন্ধবিশ্বাস। তাদের আস্থা ছিল গণতন্ত্রে, বিজ্ঞানে, সব মানুষের সমান অধিকারে।

এখন এই ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগে অনেক বিশ্বাস বা Cult যা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে উঠে এসেছে, তাঁরা আলাদা স্বীকৃতি চাইছেন। যেমন রামকৃষ্ণের ভক্তরা "Ramkrishnaite" হিসেবে আলাদা ধর্মীয় স্বীকৃতি চাইছিলেন বেশ কিছু বছর ধরেই। কিন্তু তাঁরা মূলত হিন্দু বলেই তাঁদের এই আবেদন বাতিল করে দেয় সরকার। অবাক লেগেছিল যখন একজন সফল আবেদনকারীর চাকরিতে ঢোকা নাকচ হয়ে যায় শুধুমাত্র " Religion " কলামে "মানবতাবাদ" লেখার জন্য। যেন মানবিক হওয়াটা খুব গর্হিত অপরাধ।

সেটা ১৯৯২-৯৩ সাল। যুক্তিবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এই বাংলার ছেলে মেয়েরা সরকারি, বে-সরকারি সমস্ত আবেদনপত্রে "ধর্ম" কলাম তুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। "ধর্মপালন বা ধর্মাচরণ কারোর ব্যক্তিগত ব্যপার, একটি ধর্মনিরপক্ষে রাষ্ট্রে ধর্মীয় পরিচয় জানানো জরুরি নয়। যাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম মানেন না তাঁদের form বাতিল করা হচ্ছে অসম্পূর্ণ বলে। এই সময় এগিয়ে আসে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সিস্টার কনসার্ন " Humanist Association of India" বা " ভারতের মানবতাবাদী সমিতি " এবং সক্রিয় হয় মানবতাকে ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় রাষ্ট্রসংঘের অফিসে। উত্তরও আসে দেরি না করেই। UNO তাদের Human Rights এবং Religious Rights সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় '১৯৮১-র জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে প্রতিটি মানুষের যে কোনো ধর্মমত গ্রহণ করার ও চর্চা করার স্বাধীন অধিকার আছে।' তারপরই এই আইনি লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে মানবতাবাদী

সমিতি ও যুক্তিবাদী সমিতি। একটা চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সাংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশি দূতাবাসেও। তারপর মানবতাবাদী সমিতির সহায়তায় কোর্টে গিয়ে affidavit করে দলে দলে ছেলেমেয়ে Humanist কে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৯৩ সালে ১০ ডিসেম্বর। ১৯৯৩ সালে ১০ ডিসেম্বর "বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে" প্রথম ৫৪ জন সদস্য-সদস্যা আইনিভাবে Humanist হন।

এই কঠিন লড়াইটা জেতার পর এখন আর কোন বাধা নেই– যে কোন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশে এই একই ভাবে যে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে HUMANIST ঘোষণা করতে পারেন সগর্বে।

তথ্যসহায়তায়: সুমিত্রা পদ্মনাভন (বিশিষ্ট লেখিকা এবং ভারতের মানবতাবাদী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি)।

পুরোহিতদের ভাতা ও পুজো কমিটিগুলিকে ৫০ হাজার টাকা কেন, মামলা দায়ের হাইকোর্টে

দুর্গা পুজোয় ক্লাবগুলোকে কেন অনুদান দেওয়া হচ্ছে? কেনই বা পুরোহিতদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে ফের জনস্বার্থ মামলা করলেন সিটু নেতা মামলাকারী সৌরভ দত্ত। আগামী বুধবার এই মামলার শুনানি। দুটি মামলাই শুনবেন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

এবার দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও পুজোর মাস থেকে ১,০০০ টাকা করে পুরোহিতদের জন্য ভাতা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিরোধীদের অভিযোগ,বিধানসভা ভোটের আগে সরকারি টাকায় খয়রাতি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম-কংগ্রেসের বক্তব্য, হিন্দুত্ব নিয়ে বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা চালাচ্ছে তৃণমূল সরকার। আর তার জেরেই ফের মামলা করেন সিপিএমের শ্রমিক সংগঠনের নেতা সৌরভ দত্ত।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে প্রথম পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়া শুরু করে রাজ্য। সেবার ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। সেবছর মামলা করেছিলেন সৌরভবাবু। সেই মামলায় হাইকোর্টে বয়ান বদল করে রাজ্য। জানায় যে, ট্রাফিক পুলিশের "সেফ ড্রাইভ- সেভ লাইফ" প্রকল্পে এই টাকা দিচ্ছে সরকার। অবশেষে, মামলায় স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট। তারপর তা তুলেও নেওয়া হয়। এরপর সৌরভ দত্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। এখনও সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি শীর্ষ আদালতে। তার মধ্যেই ফের মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে।

আইনজীবী সালোনি ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কপি আদালতে বুধবার জমা দেবেন তারা। এখন দেখার আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানিতে কী রায় দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত সৌরভ দত্ত নিজে এখন করোনা আক্রান্ত। দুর্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ফোনেই আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তিনি।

https://www.kolkata24x7.com/why-50000-rupees-to-the-clun-case-filled/

আসুন কৃষিবিলের ব্যাপারে একটু জেনে নিই।

Farm Bill, 2020:

1) প্রথম বিলটি The Essential Commodies (Amendment) Bill 2020; এই বিল অনুযায়ী চাল, ডাল, আটা, আলু, চিনি, পিয়াঁজ, ভোজ্য তেল সহ মোট ২০ টির বেশি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মজুত করার উর্ধ্বসীমা ও তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৫ সালে এই আইনের উদ্দেশ্যই ছিল অভাবের সময় সরকার সরাসরি কৃষকদের থেকে খাদ্যশস্য কিনে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিতরণ করবে। এখন থেকে কৃষকদের থেকে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য সরকার আর বাধ্য না, সাথে কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা এখন থেকে যত ইচ্ছা দ্রব্যাদি অনির্দিষ্টকালের জন্য গুদামজাত করে কৃত্রিম ভাবে বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

2) - দ্বিতীয় বিলটি The Farmers Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020; যার গালভরা নাম দিয়েছে মূল্য নিশ্চয়তা! এই বিল নাকি কৃষকদের আয় নিশ্চিত করবে! কৃষকদের সাথে সরাসরি পেপসিকো, আদানি, রিলায়েন্স এর মত বড় বড় কোম্পানি'রা চুক্তি করতে পারবে। ব্রিটিশ আমলের সেই নীলকর সাহেবদের নীলচাষের প্রথা একটু ঘুরিয়ে ফিরে আসছে আরকি। বড় বড় কোম্পানি গুলোর সাথে কৃষকদের চুক্তি হওয়ার পর কোনো কারণে উৎপন্ন ফসল পছন্দ না হলে তা কিনতে কিম্বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ফসল নষ্ট হলে সেই আর্থিক ক্ষতির দায় নিতে কোম্পানি গুলো বাধ্য না। সরকার বলছে সেক্ষেত্রে ক্ষতির মূল্য পেতে চাষী-রা আইনের সাহায্য নিতে পারে। কিন্তু আপনার কি মনে হয় আদানি, পেপসিকো-দের সাথে আপনার পাড়ার গরীব চাষী মদন দা দের কোর্টের আইনি লড়াই লড়ার মত পকেটের জোর আছে?

3) - তৃতীয় বিলটি The Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020; এর ফলে ক্রেতা ব্যাবসায়িক সংস্থাগুলির সাথে কৃষকরা সরাসরি কেনাবেচা করতে পারবে মুক্তভাবে। এক্ষেত্রে সরকার আর কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না। 'স্বামীনাথন কমিশনে'র সুপারিশ মেনে খরচের দেড় গুণ দাম কৃষকদের জন্য সুনিশ্চিত করতে হবে সেই দায়ভার থেকে সরকার হাত তুলে নিলো।

সাপ নিয়ে আইন ও জনস্বার্থে প্রচারিত

প্রিয় বন্ধুরা, মনে রাখবেন সাপ আমাদের শত্রু নয়, বরং পরিবেশ মিত্র। তাই শুধুমাত্র আতঙ্কেই ওদের মেরে ফেলবেন না। যেহেতু ওরা বড় শান্ত, তাই নিজেদের বিপদ না বুঝলে ওরা আপনাকে যেচে ছোবল মারবেই না। আর ছোবল দিলেই যে মৃত্যু অবধারিত সেটাও কিন্তু ভূল ধারনা। কারন, একটা পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, পৃথিবীতে পাওয়া প্রায় ২০০০ প্রজাতির সাপের মধ্যে মাত্র ২৮০ টি প্রজাতি বিষধর। ভারতে পাওয়া প্রায় ২১৬ টি প্রজাতির ভেতর মাত্র ৬৮ টি বিষাক্ত। এই রাজ্যে সাধারণত ১০৫ টি প্রজাতির সাপের দেখা পাওয়া যায়। মূলত প্রধান চারটে সাপ নিয়ে চিন্তাটা বেশি। যেমন, কেউটে (Monocled Cobra), গোখুরা (Spectacled Cobra), কালাচ (Common Krait) এবং চন্দ্রবোড়া (Russell's Viper)...

কয়েকটি বিষয় মাথায় গেঁথে নিন, আখেরে আপনারই লাভ। যেমন, সর্পদংশনের একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে AVS (Anti Venom Serum), কোনো ঝাড়ফুঁক, মাদুলি কবজ ইত্যাদি নয় এবং ওঝা, গুণিন মানেই সবকটা প্রতারক ও বুজরুক।

মনে রাখুন সাপের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা,

R_I_G_H_T.....

R- Reassurance

রোগীকে আশ্বস্ত করুন। কারণ রোগী এইসময় খুবই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন। আতঙ্কও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। রোগীকে বোঝান, সাপের কামড়ে আক্রান্ত বহু মানুষ চিকিৎসায় বেঁচে উঠেছেন, তাই আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

I – Immobilization

যত কম নড়াচড়া হবে তত কম হারে বিষ সারা শরীরে ছড়াবে। স্কেল বা বাঁশের টুকরো সহ হাতে/ পায়ে (যে অংশে কামড়াবে) কাপড় দিয়ে হাল্কা করে বেঁধে দিন। হাত বা পা (কামড়ের নিকটতম স্থান) যাতে তিনি ভাঁজ করতে না পারেন তাই এই ব্যবস্থা।

GH – Go To Hospital

ফোন করে জেনে নিন আপনার নিকটতম যে হাসপাতালে

১)A.V.S,

২) নিওস্টিগমিন

৩) অ্যাট্রোপিন এবং

৪) অ্যাড্রিনালিন আছে সেই হাসপাতালে চলুন। মাথায় রাখবেন সাপের কামড়ের সম্পূর্ণ চিকিৎসা একটি ব্লক প্রাইমারী হেলথ সেন্টারেই সম্ভব। সম্ভব হলে রোগীকে মোটর সাইকেলের মাঝে বসিয়ে রোগীর সাথে কথা বলতে বলতে চলুন। জেনে রাখবেন এখানে সময়ের ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

T- Tell Doctor for Treatment. হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকে সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে বলুন। কথা বলতে গিয়ে রোগীর কথার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি (যেমন কথা জড়িয়ে আসা, নাকি সুরে কথা বলা খেয়াল করলে তা যথাযথ (কতক্ষন আগে শুরু হল) ভাবে চিকিৎসকে জানান।

এছাড়া, স্মরণে রাখুন, RULE OF 100। মানে, সাপে কামড়ানোর ১০০ মিনিটের মধ্যে ১০০ মিলিলিটার AVS শরীরে প্রবেশ করলে রোগীর বেঁচে যাবার সম্ভাবনা থাকে ১০০%।।

এশিয়ার বিষাক্ততম সাপ কালাচ (Common Krait) এর কামড়ে কোনও জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না, দংশন স্থানে কোনও চিহ্নও পাওয়া প্রায় যায়ই না। পেটে ব্যাথা, গাঁটে গাঁটে ব্যাথা, খিঁচুনি কিংবা শুধুমাত্র দুর্বলতা অনুভব করার লক্ষনের সাথে দুচোখের পাতা পড়ে আসা নিশ্চিত কালাজের কামড়ের লক্ষণ।

এর চিকিৎসা–

বিষক্রিয়া নিশ্চিত হলে ডাক্তার-

১- কোন স্কীন টেস্ট ছাড়াই (যা ২০১০ সালে WHO র নির্দেশিকায় বাতিল হয়ে গেছে) শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকেই ৪ ভাগের ১ভাগ অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন চামড়ার তলায় দিয়ে শিরা ফুঁড়ে স্যালাইনের সাথে ১০ভায়াল AVS এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে শরীরে প্রবেশ করাবেন।সাথে অবশ্যই দেবেন নিওস্টিগমিন এবং অ্যাট্রোপিন (ফণাধর নার্ভবিষ গোখরো ও কেউটের ক্ষেত্রে এই দুই ইঞ্জেকশন দিতেই হবে)

২- কোনও অবস্থাতে রোগীকে রেফার করতে হলে ১০ ভায়াল AVS, নিওস্টিগমিন এবং অ্যাট্রোপিন না দিয়ে রেফার করা যাবে না।

৩- AVS দিলে ৭০% ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া(শ্বাসকষ্ট, শরীরে আমবাতের মত দেখতে পাওয়া ইত্যাদি)হয় যাকে সাময়িক স্যালাইন বন্ধ করে ইনজেকশন সিরিঞ্জে ধরে রাখা ০.৫m.lঅ্যাড্রিনালিন দিয়ে সফলভাবে মোকাবিলা সম্ভব।

৪- চন্দ্রবোড়ার কামড়ে চিকিৎসায় দেরী হলেই কেবল ডায়ালেসিস লাগে। দুঃখের সাথে জানাই বর্তমানে বেশকয়েকটি কেসে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রবোড়ার দংশনে AVS কাজ করছেনা ঠিকমতো।

পরিশেষে জানাই, প্রতিবছর আমাদের দেশে শুধুমাত্র সচেতনতা ও সুচিকিৎসার অভাবে প্রায় ৫৫০০০ মানুষের মৃত্যু হয় সর্পদংশনের কারনে।

❖ সাপের কামড়ে কোনও রোগীর যদি মৃত্যু ঘটে –মৃত ব্যক্তির পরিবার এককালীন ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। কোন রোগী মারা গেলে সরকারী হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার "মৃত্যুর কারণ যে সাপের কামড়" এই মর্মে শংসাপত্র প্রদান করবেন

কারণ সাপে কামড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রাপ্য ২লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নয় এই শংসাপত্রই চলবে।(সরকারী অর্ডার নং- ১৫৬১(১৯)F.R/8P-৩/০৪ date ১৯.৮.২০০৮)।

❖ সংযোজন: নির্বিচারে সাপ হত্যা বে-আইনি এবং দণ্ডনীয় অপরাধ এবং জামিন অযোগ্য অপরাধ এবং এর শাস্তি (ভারতে) ১ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত জেল / মোটা অঙ্কের জরিমানা। তাছাড়া, সমস্ত সাপ বণ্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ দ্বারা সংরক্ষিত এবং বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া সাপ পোষা, পাচার, বে-আইনি বিষ সংগ্রহের জন্য হত্যা আইনত অপরাধ।

তথ্যসহায়তায়: ডাঃ দয়াল বন্ধু মজুমদার, মেহেবুব আলম, সন্দীপ সরকার, পিন্টু হালদার, মুবারক আনসারি, মরুৎ দেব।।

The Protection of Civil Right Act, 1955

ক) যে কোন সরকারি / জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থান, ব্যবস্থা, সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকলের সমান নাগরিক অধিকার আছে এবং সেই অধিকার বিঘ্নিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যায়।
খ) অস্পৃশ্যতা আইন অনুযায়ী বিলুপ্ত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
গ) তপশিলী জাতির কারো সঙ্গে উচ্চবর্ণের কারো বিয়ে হলে ৩০০০০/- টাকা সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা আছে।

১) তপশিলী জাতি বা তপশিলী জনজাতির কারো প্রতি, অন্য উচ্চবর্ণ জাতি বা সম্প্রদায়ের কারো দ্বারা সম্মানহানি, উচ্ছেদ, ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রভাবিত করা, মহিলাদের প্রতি অশালীন আচরণ ইত্যাদি ঘটনা সংগঠিত হয়, সেক্ষেত্রে

ক) দ্রুত তদন্ত এবং চার্জশীট গঠন,
খ) বিশেষ আদালতের মাধ্যমে দ্রুত বিচার,
গ) অপরাধীদের বাড়তি সাজা এবং
ঘ) নির্যাতিত বা তার পরিবারকে দ্রুত আর্থিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদির সংস্থান আছে।

২) নির্যাতিত ব্যক্তি তার পক্ষে যে কেউ নিকটবর্তী থানায়, পুলিশ সুপার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক বা প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মহল আধিকারিক তথা জেলা মহল আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন বা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইট এ www.anagrasarkalyan.gov.in

তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫ বা Right to Information Act, 2005 (RTI Act):

এটি ভারতীয় সংসদের দ্বারা গৃহীত হওয়া একটি আইন যা দেশের নাগরিকগণকে কোনোরকম তথ্য সহজে লাভ করতে সাহায্য করে। ভারতে আরটিআই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দু'টি সংস্থা দেখে। যেমন- ১) সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন (সিআইসি) এবং ২) স্টেট ইনফরমেশন কমিশন (এসআইসি)। এই দু'টিই স্বাধীন সংস্থা, ফলে, দ্বিতীয় সংস্থাটি প্রথম সংস্থাটির অধীন একেবারেই নয়। সিআইসি ভারতের রাষ্ট্রপতির এক্তিয়ারভুক্ত এবং এসআইসি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের কাছে জবাব দিতে বাধ্য।

প্রথমে এই আইনটি জম্মু এবং কাশ্মীর বাদে ভারতের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে প্রযোজ্য ছিল কারন, তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত জম্মু এবং কাশ্মীরের 'জম্মু এবং কাশ্মীর তথ্য জানার অধিকার, ২০০৯' শীর্ষক একটি নিজ আইন আছে। কিন্তু,

২০১৯ সালের ৫ অগস্ট, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারা প্রত্যাহার করার পরে জম্মু এবং কাশ্মীরেও এই আইন কার্যকর করা হবে বলে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল।

ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে বলে, তথ্য জানার অধিকারও এই ধারার মধ্যেই পরে বলে সুপ্রিম কোর্ট মনে করে। একে বাস্তবে প্রয়োগ করতে তৈরি হয়ছে তথ্যের অধিকার আইন (আরটিআই) ২০০৫। এই অধিকার দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে নাগরিকদের হাত শক্ত করে। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণের ক্ষমতা তৈরি করে দেয়। এরফলে জনগণ, সমস্ত সরকারি তথ্যকে যাচাই করে জানতে পারেন, যাদের ভোট দিয়ে তাঁরা সরকারে এনেছেন তাঁরা ঠিকমতো কাজ করছেন কিনা। এই আইনকে অস্ত্র করে দেশের একজন নাগরিক দর্শক থেকে প্রশাসন প্রক্রিয়ায় একজন সংক্রিয় অংশগ্রহণকারী হতে পারেন। এই আইনবলে এক জন নাগরিক দেশের সমস্ত সরকারি দফতরের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন অনলাইন এবং অফলাইন দুই ভাবেই।

তথ্য জানার অধিকার আইনটি ২০০৫ সালের ১৫ জুন ভারতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল এবং ১২ অক্টোবর ২০০৫ সাল থেকে পূর্ণ কার্যকরী হয়। "সরকারী গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩" (Official Secrets Act 1923) সহ এইধরনের কয়েকটি আইন নাগরিকের তথ্য লাভ করার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল, সেসব তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫ নাকচ করে দেয়।

এই আইনের ২০০৫-এর সেকশন ২(জে)-এ তথ্যের অধিকার মানে সমস্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি কর্তৃপক্ষের (পাবলিক অথরিটি) তথ্য জানার অধিকার। এর মধ্যে পরে-

(১) কাজ, তথ্য এবং রেকর্ডস দেখার অধিকার। (তথ্য অর্থাৎ, কোনো রেকর্ড, নথি, মেমো, ই-মেল, মতামত, পরামর্শ, প্রেস রিলিজ, বিজ্ঞপ্তি,নির্দেশ, লগবুক, চুক্তি, রির্পোট, দলিল দস্তাবেজ, নমুনা, মডেল, তথ্য যেগুলি ইলেকট্রনিক মোডে ধরা আছে, আপাত বলবৎ কোনও আইনে পাবলিক অথরিটির নেওয়া কোনও বেসরকারি সংস্থার তথ্য)।
২) প্রত্যায়িত নমুনা গ্রহণ
৩) ফ্লপি, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা প্রিন্ট আউট করে কমপিউটারে রাখা তথ্য সংগ্রহণ করা যাবে।
এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, এক জন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দেওয়া হবে না যদি তিনি তথ্য আধিকারিককে বোঝাতে সক্ষম না হন যে, প্রকাশিত তথ্য জনস্বার্থে কাজে লাগবে (এ ক্ষেত্রে আংশিক তথ্য দেওয়া যেতে পারে যার মধ্যে অপ্রকাশযোগ্য কোনও তথ্য থাকবে না)-

১) দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বিঘ্নিত হয় এমন তথ্য, যে তথ্য প্রকাশ করলে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটে, অপরাধের উস্কানিতে সাহায্য করে, দেশের অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, সেই ধরনের কোনও তথ্য
২) আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা কোনও তথ্য বা এমন তথ্য যা প্রকাশ করলে আদালতের অবমাননা হবে

৩) সংসদ বা রাজ্য বিধানসভার অধিকার ভঙ্গ হতে পারে এমন কোনও তথ্য

৪) বাণিজ্যিক গোপন বিষয়, ব্যবসায়িক গোপন কৌশল বা বুদ্ধিগত সম্পত্তি যার প্রকাশ তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের ক্ষতি করবে, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন

৫) কোনও ব্যক্তির আস্থাভাজন সম্পর্ক সূত্রে পাওয়া তথ্য, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন

৬) বিদেশি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গোপন তথ্য

৭) এমন কোনও তথ্য যা প্রকাশ করলে কোনও ব্যক্তির শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা নিরাপত্তা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে দেওয়া কোনও সূত্র বা তথ্য

৮) যে তথ্য প্রকাশের ফলে অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান, গ্রেফতারি বা মামলা রুজু করা বিঘ্নিত হবে

৯) মন্ত্রিপরিষদ, সচিব ও অন্য আধিকারিকদের আলোচনার নথিসহ মন্ত্রিসভার কাগজপত্র

১০) ব্যক্তিগত তথ্য, যার সঙ্গে জনসাধারণের কার্যকলাপ বা আগ্রহের কোনও সম্পর্ক নেই বা ব্যক্তির গোপনীয়তায় অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হবে, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্যের প্রকাশ প্রয়োজন।

সাংবাদিক এবং লেখক শ্রী বুদ্ধদেব পান জানাচ্ছেন- " ২০১১ সালের ১৫ই জুন ভারতীয় সংসদ RTI Act আইনটি পাশ হয় এবং ওই বছরের অক্টোবর মাসের ১২ তারিখ থেকে পুরোপুরি কার্যকর হয়। মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন এবং অরুণা রায় ভারতে এই আইনটি বলবৎ হওয়ার মূল কারীগর হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার এবং বাকস্বাধীনতার অধিকারকে এই আইনটি জোরদার করেছে। বলে রাখা ভালো, ২০০২ সালে লাগু হওয়া তথ্যের স্বাধীনতা আইনটির জায়গা বর্তমানে আরটিআই নিয়েছে। প্রদেয় তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন ভারতে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো আরটিআই দাখিল হয়।

২০১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা কর্তৃক পাস হওয়া হুইশল ব্লোয়ার্স প্রোটেকশন আইন আরটিআই'য়ের সামনে বড়ো বাধা। কারণ, ওই আইনের ভিত্তিতে যেকোনও তথ্য প্রকাশ করার আগে তা খতিয়ে দেখা হবে, আদৌ তা প্রকাশযোগ্য কি না সাধারণ মানুষের স্বার্থে। এখানেও বলা রাখা দরকার, সবই আইন মাফিক কার্যকর হবে। আরটিআই হেতু যে কোনও সরকারি সংস্থা, তাদের যাবতীয় তথ্যের ডিজিটাল রেকর্ড রাখতে বাধ্য।"

২০১৩ সালের অগস্ট মাসে তথ্যের অধিকার আইন (সংশোধনী) বিল এনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার আরটিআই বহির্ভুত করে দেয় যে, ভারতের কোনও রাজনৈতিক দলই এই আইনের আওতায় পরবে না। অন্যদিকে, তথ্যের অধিকার সংশোধন বিল, ২২শে জুলাই ২০১৯ (লোকসভায় অনুমোদিত) সালে পাশ হয়। যেটিতে সি.আই.সি. এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যে নিয়োজিত তথ্য কমিশনারদের কার্যাদির শর্তাবলীর পরিমার্জন করা হয়। এটিতে তথ্য কমিশনের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে বলে আইনটি সমালোচিতও হয়েছে। এরপরে ভারতের শীর্ষ আদালত ১৩ই নভেম্বর, ২০১৯ সালে, দিল্লী হাইকোর্টের রায়কে সমর্থন করেন যেখানে বলা হয়েছে, ভারতের প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ও তথ্য জানার অধিকার আইনের (আর.টি.আই.) আওতাভুক্ত থাকবে।

উক্ত বিলটি নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কর্মচারী, গণঅভিযোগ ও পেনশন বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, বর্তমান সরকার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নীতি অনুসরণ করেই সরকার তথ্য জানার অধিকার আইনে তথ্য সংক্রান্ত আবেদন দাখিলের সংখ্যা কমাতে সরকারি দপ্তরগুলির অধিকাংশ তথ্যই স্বেচ্ছায় প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেছেন যে, নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার অভিযোগ নিষ্পত্তির ওপর গুরুত্ব

দিচ্ছে। এর ফলে, বিগত পাঁচ বছরে জবাবের অপেক্ষায় তথ্য সংক্রান্ত আবেদন দাখিল পড়ে থাকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

এই লেখাটি শেষ করবো, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রাচী মিশ্রর বক্তব্য দিয়ে যা NEWS 18 বাংলার অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে ১২ মে, ২০২১ তারিখে।

"তথ্য জানার অধিকার আমাদের সাংবিধানিক, চাইলে চাওয়া যায় সরকারি নথিও! দেশের RTI আইন নিয়ে জানুন বিশদে!"

- প্রাচী মিশ্র (সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী)

প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে আমরা যতই সমালোচনা করি না কেন, আদতে গণতান্ত্রিক সংবিধান কিন্তু দেশের নাগরিকদের হাতে অনেক ক্ষমতাই তুলে দিয়েছে। তার মধ্যেই একটি হল তথ্য জানার অধিকার বা Right To Information, সংক্ষেপে RTI। এই বিষয়ে এবার আলোকপাত করছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রাচী মিশ্র (Prachi Mishra)।

২০০৫ সালের Right To Information অ্যাক্ট আদতে কী?

দেশের নাগরিক সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে যে কোনও তথ্য জানতে চাইতে পারে। এই তথ্য জানার অধিকার এবং আবেদন করার পদ্ধতিই Right To Information নামে সুপরিচিত। সংবিধানের এই অ্যাক্ট অনুসারে জনৈক নাগরিকের আবেদন করার ৩০ দিনের মধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষ সেই তথ্য দিতে বাধ্য থাকে।

অ্যাক্টের অধীন Information বা তথ্য কী কী হতে পারে?

তথ্যের বস্তুত নানা ফর্ম্যাট থাকতে পারে, এর মধ্যে বেশ কিছু ফর্ম্যাট আবার ইলেকট্রনিকও, যেমন- রেকর্ড, ডকুমেন্ট, মেইল, ওপিনিয়ন, প্রেস রিলিজ, অর্ডার, রিপোর্ট ডেটা ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, সরকারি কর্তৃপক্ষের অধীনে যদি কোনও পাবলিক বডি থাকে, তাহলে তার তথ্যও নাগরিকের জানার অধিকার আছে।

Right To Information অ্যাক্ট অনুসারে কী ধরনের তথ্য জানতে পারা যায়?

সহজ ভাবে বললে নাগরিক সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কিত যে কোনও ধরনের তথ্য জানতে চাইতে পারে। তাই যে কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি সংসদীয় নথিও নাগরিককে দেখার এবং জানার অধিকার দিয়ে থাকে এই আইন।

RTI কী ভাবে ফাইল করতে হয়?

নাগরিককে এক্ষেত্রে Public Information Officer, সংক্ষেপে PIO-র সংশ্লিষ্ট দফতরে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। সঙ্গে ফি জমা করতে হয় ১০ টাকা। ৩০ দিনের মধ্যে উত্তর না পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে Central Information Commission, সংক্ষেপে CIC-এর কাছে আবেদন জানানো যায়।

আবেদনপত্রের বিশেষ কোনও ধরন আছে কি?

না, নাগরিক যে ভাবে স্বচ্ছন্দবোধ করবেন, সে ভাবেই আবেদন করতে পারেন। তবে আবেদনপত্রে যে তথ্য চাওয়া আছে সে সম্পর্কে যতটা বিশদে সম্ভব উল্লেখ করতে হবে, একই সঙ্গে নাম এবং ঠিকানা থাকাও আবশ্যক।

RTI Act কি নাগরিককে সম্পূর্ণ তথ্য দেয়?

ক্ষেত্রবিশেষে RTI Act নাগরিককে আংশিক তথ্যও দিতে পারে, এই বিষয়ে আইনের ১০ নম্বর ধারায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আবেদনপত্রে তথ্য কেন জানতে চাওয়া হচ্ছে সেটা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে?
না, এই বিষয়টি আবেদকের ইচ্ছাধীন- প্রয়োজন মনে হলে তিনি করতে পারেন, না করলেও অসুবিধা নেই।

PIO কি তথ্যদানে অস্বীকার করতে পারে?

RTI Act-এর ৮ নম্বর ধারায় এই বিষয়ে PIO-কে ১১টি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রবিশেষে PIO তথ্যদানে আইনত অস্বীকার করতে পারে। এগুলি হল- বিদেশ সরকারের গোপন নথি, দেশের নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে হানিকর তথ্য, সরকারের কূটনৈতিক তথ্য, দেশের উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাননীতি এবং অর্থনীতি, আইনসভার বিশেষ কোনও নীতির লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি।

এমন কোনও সংগঠন কি আছে যাকে এই আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়?

সরকারের বেশ কিছু গোয়েন্দা এবং সুরক্ষা দফতর এই আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। যদি দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘণ করা না হয়, তাহলে এই সংগঠনগুলো নাগরিকের আবেদনের প্রত্যুত্তরে তথ্য দিতে বাধ্য নয়। এই বিষয়টি আইনের দ্বিতীয় প্রস্তাবনায় স্বীকৃত হয়েছে।
NEWS 18 বাংলায় প্রকাশিত খবরটির লিংক- https://bengali.news18.com/news/explained/what-is-rti-act-all-you-need-to-know-about-rti-act-ac-596075.html

প্রকাশ্যে ধর্মাচরণের বিতর্ক উঠল বিধানসভায়

শুরুতেই একটি বিশেষ খবরে চোখ রাখা যাক। ঘটনাটি ২০১৮ সালের। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অন্দরে জন্মাষ্টমী পুজোপাঠের উদ্বোধন ককরেছিলে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিধানসভায় এভাবে পুজোপাঠের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ নিয়ে সরব হয়েছিলেন বেশকয়েকটি বিজ্ঞান ও যুক্তিমনস্ক সংগঠনের সদস্যরা। তাদের দাবী ছিল সংবিধানে (The Constitution of India) উল্লেখিত ভারত একটি "ধর্মনিরপেক্ষ" রাষ্ট্র (Secular County)। ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান কার্যকর করা হয়। এরপরে ১৯৭৬-সালের ১১ নভেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট অনুমোদিত এবং ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক শব্দটির সাথে যুক্ত হয় ধর্মনিরপেক্ষ বা Secular ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদে ' ধর্মনিরপেক্ষ ' (Secular) শব্দটি ব্যবহার করে লেখা হয়েছে -
" We The People Of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens; "। অর্থাৎ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হল সংবিধানের মৌলিক নীতি।

ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির কোনোরকম সংজ্ঞা না উল্লেখ থাকলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (ইংরেজি: Secularism) শব্দটির বিস্তৃত অর্থ রয়েছে।তবে ধর্মনিরপেক্ষবাদ বলতে সাধারণত রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে

পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উপর নির্ভরশীল থাকেনা। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না। কাউকে ধর্ম পালনে বাধ্য করা হবে না। সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার"। রাজনৈতিক ব্যবহারের দিক থেকে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে সাধারণ আইনজারি এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়।"

এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি হবে সম্পূর্ণ ধর্ম বর্জিত। রাষ্ট্রনায়কগণ কোনভাবেই প্রকাশ্যে ধর্ম-আচরণ করতে পারবেন না।একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সাধারন মানুষ থেকে রাষ্ট্রনায়কগণ প্রকাশ্যে নয়, তবে ব্যাক্তিগত ভাবে ভাবে ধর্মাচরণ করতেই পারেন।
সংবিধান যেহেতু প্রতিটি মানুষকেই ধর্মীয় অধিকার দিয়েছে তাই আমজনতা যেমন ধর্মচারণ করতে পারেন,আবার তেমনই কেউ জন্মসূত্রে পাওয়া প্রতিষ্ঠানিক ধর্মকে (হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি) সম্পূর্ণ ত্যাগ করে জীবনে এগিয়েও চলতে পারেন।

নিরপেক্ষ শব্দের অর্থ কোনো বা কারোর পক্ষেই থাকা নয়। রাষ্ট্রকে ধর্মবর্জিত রাখতে রাষ্ট্রনায়ক যথা, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, সরকারি আমলাদের প্রকাশ্যে ধর্মচারণ বে-আইনি। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম কেবল ব্যাক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপার হতে পারে।

অনেকেই হয়তো জানেন না, এই শর্তকে লঙ্ঘন করলে, অর্থাৎ রাজনীতি বা ভোটব্যঙ্কের স্বার্থে কোনো নেতামন্ত্রীরা প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ করে অ-ধর্মনিরপেক্ষ কাজকর্মের সাথে জড়িয়ে থাকলে সংবিধানের "দ্য রিপ্রেজেন্টেসন অফ পিপলস অ্যাক্ট **১৯৫১**" (অ্যামেন্ডমেন্ট **১৯৮৯**) এর **২৯**ক ধারায় ঐ নেতা মন্ত্রী কিংবা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দলটির স্বীকৃতি খারিজ করার বিধান রয়েছে নির্বাচন কমিশনের হাতে।

৩রা জানুয়ারি, ২০১৭ সালে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে ভোট চাওয়া বা ভোট না দিতে প্ররোচিত করাকে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ বলেই রায় দিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির বেঞ্চে চার জন বিচারপতি এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, কেবল প্রার্থী নয়, ভোটারদের ধর্ম-বর্ণের ধুয়ো তুলেও প্রচার করা যাবে না।
জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের **১**২৩(৩) ধারায় ধর্ম, জাতি, ভাষা, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া অবশ্য এমনিতেই নিষিদ্ধ। শীর্ষ আদালত বলেছে— কেবল প্রার্থী নয়, প্রচারে আনা যাবে না ভোটারদের ধর্ম, জাতি, ভাষার কথাও। এমনকী প্রার্থীর এজেন্টের সামাজিক পরিচয়ের জোরেও ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা যাবে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কার্যকর করা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দিহান অনেক রাজনীতি বিশ্লেষকগণ। তাঁদের কথায়, "ধর্ম, জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট চাইলে প্রার্থিপদ বাতিল করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। তারা বড়জোর আদালতে যেতে পারে।"
এই বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে হলে আইন করে কমিশনকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু তা করতে ভয় পায় সব রাজনৈতিক দলই। কারণ ধর্ম, জাতপাতের অঙ্ককে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাদের নেই। আমাদের এটাও স্মরণে রাখতে হবে সংবিধানকে বদলে মনুসংহিতার শাসন চাওয়া, অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্রর দাবী জানানো, প্রকাশ্যে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করে আমজনতার মগজধোলাই করা, ধর্ম এবং জাতপাতের নামে হিংসা ও বিদ্বেষকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সমর্থন জানানো অ-ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাজনৈতিক দল **২০১৩** সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছ ধর্মীয় মেরুকরণকে অস্ত্র করেই। মজার বিষয় এটাই নিজেদের

ধর্মনিরপেক্ষ দাবী জানানো কোনো রাজনৈতিক দলই নির্বাচন কমিশন থেকে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়নি উক্ত রাজনৈতিক দলটির অসাংবিধানিক কাজের জন্য স্বীকৃতি বাতিলের দাবীতে।

ভারতীয় সংবিধানে আর্টিকেল ৫১এ (এইচ) পার্ট ৪এ [Article 51A(h)Part iv A] তে উল্লেখ রয়েছ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকদের কর্তব্য হচ্ছে, বিজ্ঞানমনস্কতা, মনুষ্যত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সাধনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো (It shall be duty of every citizen of India to develop the scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform)।

https://eisamay.indiatimes.com/west-bengal-news/kolkata-news/bjp-ignore-west-bengal-assembly-janmashtamai-programme/articleshow/85710497.cms

নির্বাচন ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া, ধর্ম-বর্ণের নামে ভোট চাওয়া যাবে না: সুপ্রিম নির্দেশ

- নির্ণয় ভট্টাচার্য্য

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া..." কবি নজরুলের এই অমোঘ উচ্চারণই যেন আজ প্রতিধ্বনীত হল সুপ্রিমকোর্টের সাত সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে। আদালত আক্ষরিক অর্থে ঐতিহাসিক এক রায়ে আজ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, জাত-ধর্ম-বর্ণের আবেগকে 'কাজে লাগিয়ে' কোনও রাজনীতিক ভারতীয় ভূখন্ডে ভোট ভিক্ষা করতে পারবেন না। আর কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যদি তা করে থাকেন, তাহলে সেই কাজকে নির্বাচনী আইনের আওতায় 'দুর্নীতি' হিসাবেই গণ্য করা হবে।

শীর্ষ আদালতের স্বচ্ছ উক্তি, ভোট বা নির্বাচন একটি আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া, সেখানে ধর্মীয় (বর্ণ বা জাতি) আবেগের কোনও স্থান নেই। সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ আরও বলেছে যে, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে 'ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রে'র উপর প্রতিষ্ঠীত, রাষ্ট্র সেখানে কোনও ভাবেই নাক গলাতে পারে না।

প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শীর্ষ আদালতের আজকের এই রায়ে নড়েচড়ে বসেছে তামাম রাজনীতিক মহল। কারণ, উত্তর প্রদেশের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 'স্পর্শকাতর' রাজ্যের নির্বাচনে প্রয়শই জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের জিগির তুলে ভোটে ফায়দা তোলার চেষ্টা নতুন নয়। ফলে আজকের সুপ্রিম নির্দেশের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের 'সংস্কৃতি'তে অভ্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি বেশ কিছুটা বেকায়দায়। তবে, শুধু উত্তর প্রদেশই নয়, সারা ভারতেই বিভিন্ন এলাকায় ভোট টানতে 'ভাবাবেগ'-এ ভরসা রাখেন দলমত নির্বিশেষে অনেক 'ঘোষীত ধর্মনিরপেক্ষ' দলও। ধর্মীয় ভাবাবেগের ঘোলা জলে মাছ ধরতে 'পটু' এইসব মৎস্যজীবীদের কার্যত আজ হুঁশিয়ার করল দেশের শীর্ষ আদালত।

খবরের লিংক- https://zeenews.india.com/bengali/nation/supreme-courts-virdict-on-using-religious-sentiment-in-election_157274.html

India Supreme Court bans election appeals using religion or caste

The Indian Supreme Court has ruled that politicians cannot use religion or caste to seek votes. "Religion has no role in electoral process, which is a secular activity," the judges said in their ruling.

The court said using religion or caste to seek votes amounted to corrupt practices under electoral laws.
The landmark ruling comes just weeks ahead of the crucial election in Uttar Pradesh state where the two issues generally dominate polls.
Monday's ruling said the relationship between man and God was an individual choice and the state was forbidden from interfering in such an activity.

The ruling was passed by a seven-judge bench headed by Chief Justice TS Thakur, although there was a difference of opinion among the judges - four supported the order while three differed with it.
The three dissenting judges said "discussion on caste, creed and religion is constitutionally protected within and outside elections and this cannot be restricted" and that the issue should be left to parliament to decide.

Caste and religion are often central to Indian elections - most parties select candidates based on their religion or caste and campaigning often involves appealing to voters on these issues.

The court was hearing a question first raised in 1990 in a court in the western state of Maharashtra, which asked whether this was legitimate in elections.
সূত্র- https://www.bbc.com/news/world-asia-india-38487409

তথ্যসহায়তায়: বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী-অনাবিল সেনগুপ্ত, আইনিবিশেষজ্ঞ -ওসমান মল্লিক, আইনজীবী-দেবপ্রিয় হালদার, আইনজীবী- রাজেশ কুমার শর্মা।

জ্যোতিষী, তান্ত্রিকগিরি প্রতারণা পেশা, হতে পারে জেলও।

জ্যোতিষী, তান্ত্রিক,ওঝা,জানগুরু,কাপালিক, অলৌকিক ক্ষমতাধর, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধর, ডাইনি সন্দেহে কোনো মহিলার ওপরে অত্যাচার করা কোনো ব্যাক্তি, ইত্যাদিদের জেলে ঢোকাবার জন্য আমাদের দেশে বেশ কয়েকটা ভালো আইন রয়েছে। আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা এই দেশে টাকা এবং রাজনীতিক পরিচিতি থাকার সুবাদে অপরাধীরা অনেক বে-আইনি কাজ করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরায় শুধুমাত্র জনগণের আইন বিষয়ে অবজ্ঞার কারণে। সরকার চাইলেই আইন কে মলাটবন্দি অবস্থায় ফেলে না রেখে, জনগণ কে এই বিষয়ে সচেতন করতে পারে। কিন্তু তারা কানে তুলো গুঁজে বসে থাকে। আমজনতা এইসব আইনের ব্যাপার সঠিক ভবে জানলে নিজেরাই তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে সমস্ত, চোর, চিটিংবাজদের জেলে ঢোকাতে পারেন, অনায়াসেই।

নরেন্দ্র দাভোলকর, যিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন, অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতির। উনি ২০০৩ সাল থেকেই একটা আইন কে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। অবশেষে "The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013 লাগু হয়। তাছাড়া Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954, The Drugs and Cosmetics Act 1940, IPC 420, IPC 302, IPC 303 এর মতন বেশ কিছু কঠোর আইনও এই দেশে রয়েছে।

প্রসঙ্গত জানাই, সংসদ প্রবর্তিত এই আইন 30 th April 1954 সালে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং 1st May 1954 এ ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি গেজেটের বিশেষ সংখ্যার দ্বিতীয় অংশের, প্রথম অধ্যায়ের ২৪ নং ক্রমে প্রকাশিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর বাদে ভারতের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য।

The Drugs Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 আইনের সংশোধন হয় 1963 তে। এই আইনের 9(A) ধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে, এই আইন ভঙ্গকারীদের Cognizable Offence হিসেবে গন্য করা হবে। অর্থাৎ কেউ কেউ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের না করলেও পুলিশ কোনোও ভাবে এই অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে প্রাথমিক জানার ভিত্তিতে কোনো অভিযুক্তকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে (Notwithstanding anything contained in The Code of Criminal Procedure 1898 an Offence Punishable under this Act shall be Cognizable)..

আগে Drugs and Magic Remedies Act ভঙ্গকারীদের অপরাধ ছিলো Non-Cognizable অর্থাৎ এক বা একাধিক ব্যাক্তিকে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হত। পুলিশ সরকারের তরফ থেকে অভিযোগকারীর পক্ষে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতেন। আদালত অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বা ওয়ারেন্ট দায়ের করলে তবেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারতেন।

এই উল্লিখিত আইন ভাঙ্গাটা যেহেতু Non-Cognizable অপরাধ বলে 1963 সালে আইন সংযোজনের আগে পর্যন্ত গণ্য করা হত, তাই আদালত অভিযুক্তর বাসস্থল কিংবা ব্যাবসা/চাকরিস্থলে থানা মারফত অভিযুক্তকে সামনস পাঠাতেন। সামনস অর্থাৎ আদালতের নির্দেশ। যাতে লেখা থাকে কবে, কতটার সময়, কোনো আদালতে তাকে হাজিরা দিতে হবে। যেহেতু উল্লেখিত এই আইন ভাঙ্গাটা Criminal Offence বা ফৌজদারি অপরাধ তাই অভিযুক্তকে (পড়ুন জ্যোতিষী, তান্ত্রিককে) আদালতে হাজির হয়ে জামিন নিতে হত।

কোনো জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা,জানগুরু ইত্যাদি বুজরুক প্রতারকের বিরুদ্ধে ' ম্যাজিক রেমেডিস 'আইন ভেঙ্গেছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার পরও কোনোও বিশেষ কারণে পুলিশ নিরব দর্শক থাকতেই পারেন। তখন আপনি অভিযোগকারী হলেও পুলিশের কাছে অভিযোগ করার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে (যেমন ডাইরি নং অথবা লিখিত অভিযোগ গ্রহণের থানার সিলমোহর

ও স্বাক্ষর করা অভিযোগপত্র) আদালতে মামলা করা যায়। একে ' Complain Case ' বলে। এই মামলার ভিত্তিতে আদালত সামনস পাঠাবেন অভিযুক্তর কাছে। অভিযুক্ত আদালতে হাজির হয়ে জামিন নেবেন। সামনস অগ্রাহ্য করলে আদালত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ কে আদেশ দেবেন।

" The Drugs And Cosmetics Act 1940, Amendment GSR 884 (E)..বিভিন্ন সময়ে এই আইন সংশোধন হয়েছে। যেমন,1955,1957,1962,1963,1964..শেষ এমেন্ডমেন্ট হয় 2009 এ। 19th March 2009 তারিখে ভারতের প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ জারি করেছে কেন্দ্রের ' স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর '। এবার থেকে শাস্তির পরিমান আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা।

কয়েকজন মুক্তমনা, যুক্তিবাদী মানুষ এই রাজ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে মহারাষ্ট্রের ধাঁচে একটা জোরালো বা কঠোর আইন প্রণয়ণের দাবীতে সরব। ইতিমধ্যে ওনারা আইনের খসড়া জমা দিয়েছেন State Law Commission এর দপ্তরে। এনারা যেই আইনটি আনতে চান তার নাম " The West Bengal Prevention of Superstition and Black Magic Practices Bill 2016 ".. আপাতত এই আইনটি লাল ফিঁতের ফাঁসে আটকে রয়েছে।

পরিশেষে জানাই, বৃত্তিকর চাপান হয় আইনসম্মত পেশার উপর। আইন সম্মত পেশার একটা তালিকা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্যাক্স অন প্রফেশন, টেডস, কলিংস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৯-এ। প্রফেশন ট্যাক্স বিষয়ক আইন ১৯৭৯ এর সেকশন ও (২) তে আইন-সম্মত পেশার পূর্ণ তালিকা দেওয়া আছে। তাতে কোথাও 'জ্যোতিষ' এর নাম নেই। কারন 'জ্যোতিষ' এর কোন আইনি স্বীকৃতি নেই। বরং এদেশের আইন অনুসারে জ্যোতিষ পেশা বে-আইনি, নিষিদ্ধ, অবাঞ্ছিত, অনৈতিক এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

জ্যোতিষ শাস্ত্রটাই যখন বে-আইনি, প্রতারণা এবং চিটিংবাজি। তখন আজ নয়তো কাল জ্যোতিষী, তান্ত্রিকদের জেলে যাওয়া আটকানোর সাধ্য কারোর নেই। তবে আমার ব্যাক্তিগত মতে শুধুমাত্র কঠোর আইন এনে এদের দমানো যাবেনা। কারন টাকা এবং রাজনীতিক পরিচিতির সুবাদে এরা আইন কে পকেট বন্দি করে ছাড় পেয়ে যাবে। এদের একটাই ওষুধ। সেটা হচ্ছে বয়কট করা।

বেশ্যাবৃত্তি, PITA আইন এবং..

-অভিষেক দে

১৮ ডিসেম্বর ২০২০ তে আনন্দবাজার পত্রিকার অনলাইন পোর্টাল এ একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম: " লকডাউন যাঁদের যৌনকর্মী বানাল, সন্ধ্যা-মালতি-শ্যামলীদের কথা "। লিংক- https://www.anandabazar.com/west-bengal/many-women-working-as-sex-worker-after-loosing-their-job-in-lockdown-dgtldx-1.1244911

এই রিপোর্ট টি বানিয়েছেন জনৈক সৈকত ঘোষ। এই প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আশাকরছি সবাই ঠান্ডা মাথায় পড়বেন। এই রিপোর্ট টি নিয়ে কয়েকজন ব্যক্তির বক্তব্য পড়েছি বা শুনেছি। যাদের মোদ্দা কথা " বেশ্যাবৃত্তি কি অপরাধ? আরে ওরা তো গতরটা খাটিয়ে রোজগার করছে। চুরিচামারি থোড়াই করছে নাকি? পেটে ক্ষিদে থাকলে নৈতিক - অনৈতিক তত্ত্বকথা এসব মাথায় থাকেনা। তাছাড়া কেউ যদি এটাকে পেশা বানাতে চায় স্বইচ্ছায় তাহলে আপত্তির কি আছে? সিগারেটের প্যাকেটে ধূমপান ক্যান্সারের কারন মার্কা ছবি দিয়েও তো দিব্যি বিক্রি হচ্ছে তাহলে বেশ্যাবৃত্তির বেলায় এতো প্রশ্ন কেন উঠবে? "

বাহঃ, চমৎকার। এই প্রসঙ্গ মনে পরছে " thehindu " অনলাইন পোর্টাল এ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম ছিল - "Prostitution not a criminal offence: Bombay HC orders release of 3 sex workers "। অর্থাৎ বোম্বে হাইকোর্ট তার একটি রায়ে জানিয়েছে,
বেশ্যাবৃত্তি বা দেহ ব্যাবসা আইনত অপরাধ নয়। খবরটির লিংক-
https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/prostitution-not-a-criminal-offence-bombay-hc-orders-release-of-3-sex-workers/article32701646.ece

উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে,
" Prostitution is the business or practice of engaging in sexual activity in exchange for payment. Prostitution is sometimes described as sexual services, commercial sex or, colloquially, hooking. It is sometimes referred to euphemistically as "the world's oldest profession" in the English-speaking world. A person who works in this field is called a prostitute and is a type of sex worker ".

১৯৫০ সালের মে মাসে নিউইয়র্ক এ আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক কনভেনশনের স্বাক্ষরিত প্রস্তাবের ফল হিসেবে ভারতে " The Immoral Traffic (prevention) Act 1956 " এর সূচনা হয়। এই " PITA " আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় পতিতাবৃত্তি নিয়ে যা বলা আছে, তাতে একজন সাধারন মানুষের ও বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, পতিতাব্যাবসা বা যৌনতা ব্যাবসা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বা Criminal Offence।

আমাদের এই ভোগবাদী সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি, অনেক এনজিও আছে যারা মুখোশের আড়ালে দুর্দান্ত ভণ্ডামি করে খায়। এরা যেনতেন প্রকারে বেশ্যাবৃত্তি কে আইনত করতে বদ্ধপরিকর। এই মুখোশধারীরা এটা ভুলে যায় যে, বেশ্যাবৃত্তি ঠিকে আছে শুধুমাত্র ভোগবাদী গ্রাহকদের ওপর নির্ভর করে এবং এতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয় রয়েছে।

কথাপ্রসঙ্গে একটা আলোচনায় সাংবাদিক এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সংযুক্ত সম্পাদক সন্তোষ শর্মা জানাচ্ছেন, " উত্তর প্রদেশ একটার পর একটা ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল। National Crime Record Bureau এর রিপোর্ট অনুসারে,২০১৯ সালে ভারতে প্রতিদিন ৮৭ টা ধর্ষণ ঘটেছে যার বেশিরভাগই উত্তরপ্রদেশে। এই পরিস্থিতিতে বেশ্যাগিরিকে আইনের তমকা

দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। আমার কয়েকজনের মুখেও বেশ্যাবৃত্তি বা প্রস্টিটিউশনকে লাইসেন্স দেওয়ার কথা শুনেছি। তাঁদেরকে আমি কিছু কড়া কথা বলেছিলাম যেমন, এই লকডাউনে এমন অনেকে আছেন যাঁরা কাজ হারিয়ে বাড়িয়ে বসে আছেন। বিশেষ করে মহিলারা। কোথাও কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না?চিন্তা কেন করছেন হে পুরুষ, একবার ভেবে দেখুন আপনি বাড়িতে পায়ের ওপর পা তুলে বসে মৌজমস্তি করছেন আর অন্যদিকে আপনার স্ত্রী আপনার জন্য টাকা রোজগার করে চলেছেন। কিন্তু যদি আমাদের দেশে বেশ্যাগিরি আইনত হত তাহলে টুক করে আপনার স্ত্রীর নামে দেহবিক্রির লাইসেন্স নিয়ে ঘরেই বেশ্যালায় খুলে বসলেন। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত যখন খুশি আপানার বেশ্যালয়ে গ্রাহকদের আনাগোনা। যত বেশি স্ত্রী গতর খাটাবে তত বেশি টাকা। এই সুযোগে পাড়ার যে সব ফালতু মদমাতাল আপনার স্ত্রীকে কে দেখে লালা ঝড়াতো তারা এই সুযোগে চেখে দেখার সুবর্ণ সুযোগও পেয়ে যাবে। থানা পুলিশ, পাড়ার মাস্তানের কোনও বালাই নেই। কারণ আপনার স্ত্রী লাইসেন্স ধারি বেশ্যা যে। এখানেও শেষ নয়। হয়তো বাড়িতে অবিবাহিতা বোন রয়েছে, টাকার অভাবে বিয়ে দিতে পারছেন না। বোনের নামেও বেশ্যাগিরির লাইসেন্স নিয়ে নিন। স্ত্রী আর বোন দুজনের ডবল রোজগারে ঘরে টাকার বন্যা বইবে। কি! আমার এই কথা শুনে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে? জানেন, আমারও রাগ হয়। যারা চাইছেন বেশ্যাগিরিকে আইনত করা হোক, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনি কি নিজের স্ত্রী বা বোনকে বেশ্যা বানাতে যদি চান, তাহলে এখনই স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে পোস্টার, ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন গড়ে তুলুন। কথা দিচ্ছি এই সাংবাদিক আপনাকে খবরের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

আমি, সন্তোষ শর্মা বেশ্যাগিরিকে আইনত করার সবথেকে বড়ো বিরোধী। আমি চাই না দেশটা বেশ্যাখানায় পরিণত হোক। তাই মুক্তমনা যুক্তিবাদী বন্ধুদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, যে বা যারাই বেশ্যাগিরিকে আইনত করার দাবি তুলছে, তাদের প্রশ্ন করুন সবার আগে, তারা কি নিজের বাড়ির মা, স্ত্রী বোনকেও বেশ্যা বানাতে রাজি আছেন কি? "

আসুন, একনজরে দেখে নেওয়া যাক কি রয়েছে PITA আইনে। এই আইনের ২ নং ধারায় পতিতালয় বা Brothel এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে কোনও স্থান, বাড়ি, গাড়ি - সম্পূর্ণরূপে বা অংশকে বোঝাবে যেখানে বাণিজ্যিক উদ্দ্যেশ্যে, লাভের আশায় যৌনতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাকেই পতিতালয় বা Brothel বলে চিহ্নিত করা হবে।

' Prostitute ' বলে সেইসব মানুষকে চিহ্নিত করা হবে, যারা বাণিজ্যিকভাবে নিজের যৌনতাকে লাভের আশায় ব্যবহার করে। পতিতাবৃত্তি বা Prostitution হল যৌনতাকে বাণিজ্যিক লাভের উদ্দ্যেশ্যে ব্যবহার।

শিশু বলতে তাদের বলা হয়েছে, যাদের বয়স ১৬ বছরের কম। এই বয়সসীমার মধ্যে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের ' শিশুপতিতা ' হিসবে গণ্য করা হবে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক তারাই, যাদের বয়স ১৬ বছরের ওপর কিন্তু ১৮ বছর অতিক্রম করেনি এই বয়সসীমার মধ্যে পতিতাদের ' অপ্রাপ্তবয়স্ক পতিতা ' বলে গণ্য করা হবে। ১৮ বছর যারা পার করেছে, তারাই আইনের চোখে অপ্রাপ্তবয়স্ক।

PITA আইনের ৩ নং ধারায় পতিতালয় চালানোর বিরুদ্ধে রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা। কোনও ব্যক্তি যদি মালিক হিসেবে, ভাড়াটিয়া হিসেবে অথবা লিজ হোল্ডার হিসেবে কোনো পতিতালয় চালায়, তবে তার প্রথম অপরাধের জন্য এক থেকে তিন বছরের জেল এবং দু হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের জন্য দুই থেকে পাঁচ বছরের জেল ও দু হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।

PITA আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে - কোনও পতিতার আয়ে জীবনযাপনকারীর শাস্তি কমপক্ষে দু বছরের জেল ও সঙ্গে এক হাজার টাকা জরিমানা। এছাড়া, কোনো শিশুকে পতিতাবৃত্তিতে নামিয়ে সেই আয়ে জীবনযাপনকারীর শাস্তি কমপক্ষে সাত থেকে দশ বছরের জেল ও জরিমানা।

PITA আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি পতিতাবৃত্তিতে উৎসাহিত করলে বা কাওকে পতিতা হিসবে নিয়োগ করলে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে।

এই আইনের ১৩ নং ধারায় পতিতাবৃত্তি নিবারণের উদ্দ্যেশ্যে বিশেষ পুলিশ অফিসার ' স্পেশাল পুলিশ অফিসার ' নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে বিশেষ পুলিশ অফিসার, পতিতাবৃত্তি চালানোর সন্দেহে যে কোনো স্থানে বিনা ওয়ারেন্টে প্রবেশ ও অনুসন্ধান করতে পারে।

১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট যদি কোনওভাবে খবর পান যে, কাওকে পতিতাবৃত্তিতে নামানোর উদ্দ্যেশ্যে আটক করা হয়েছে, তবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য পুলিশকে আদেশ দিতে পারেন। ১৭(ক) ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট উদ্ধার করা মানুষটিকে তার মা, বাবা অথবা অভিভাবকের হাতে তুলে দেবেন। তবে তার আগে অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখবেন ওই মা, বাবা কিংবা অভিভাবক ওই উদ্ধার করা মানুষটির ভরণপোষণে সক্ষম কি না। ১৮ ধারামতে ম্যাজিস্ট্রেট খবর পাওয়ামাত্র পতিতাবৃত্তি চালানোর উদ্দ্যেশ্যে ব্যবহৃত যে কোনো স্থান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতে পারেন।

আইনের এতগুলো ধারাগুলি ভালোভাবে পড়লে যেকেউ বুঝবেন যে পতিতাবৃত্তি বে-আইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এইফাঁকে আমরা জেনে নিই পতিতাবৃত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পতিতাদের অসংখ্য নামে ডাকা হতো বা হয়। যেমন, দেহপসারিনী, বেশ্যা, রক্ষিতা, উপপত্নী, জারিণী, পুংশ্চলী, অতীত্বরী, গণিকা, বিজর্জরা, আসুগো ইত্যাদি। আবার কামসূত্র গ্রন্থর লেখক বাৎস্যায়ন পতিতাদের ৯ টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী, নটি, শিল্পকারিকা, প্রকাশ বিনিষ্টা, রুপজীবা, গণিকা (সূত্র- চতুর্থ ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায় -২৪)। আবার ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের ১২৬ তম সূক্তের পঞ্চম ঋকে রয়েছে - " সুবন্ধবে যে বিশ্যা ইব ব্রা অনস্বন্তঃ শ্রব ঐযন্ত পূজা "। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ 'মরিস ভিন্টারনিৎস' এর মতে এখানে বিশ্যা শব্দটি থেকেই নাকি বেশ্যা কথাটির উৎপত্তি। এছাড়া, George Ryley Scott তার " A history of prostitution from antiquity to the present day " বইতে পতিতাবৃত্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন- পতিতা অর্থাৎ বেশ্যারা হলো সেই সম্প্রদায় ভুক্ত নারী যারা পুরুষকে যৌন সুখ ভোগ করাতে নিজেদের দেহ দিয়ে জীবিকা অর্জন করে।

পরিশেষে বলাই যায় যে, বেশ্যাবৃত্তি টিকে রয়েছে শরীর লোভী গ্রাহকদের চাহিদার ওপরে। সেইসব গ্রাহক যাদের কাছে নারী শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী, পায়ের জুতো এবং সন্তানের জন্মদেওয়ার যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই নয়। বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিৎ সর্বতোভাবে, কোনোরকম রাখঢাক না করেই। সুস্থ সমাজে বেশ্যাবৃত্তি অভিশাপের ন্যায়। একে সমূলে উৎপাটন করতে ব্যপক প্রচার ও প্রসার করতেই হবে।

কালো আইন "আফস্পা" মানবতার বিরোধী

প্রচারে: ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (Science and ratinalist Association of India) এবং ভারতের মানবতাবাদী সমিতি (Humanist Aassociation of India)।

সংবিধানে উল্লেখিত সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র ভারতে দীর্ঘদিন ধরে লাগু আছে AFSPA এবং UAPA নামের ভয়ঙ্কর এবং অমানবিক দুটি কালো আইন। মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী মানুষের মুক্তকণ্ঠে দাবী, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত (Supreme Court of India) সকল দিক বিবেচনা করে অতিদ্রুত এই কালো আইন দুটি বাতিল করুক মানুষের স্বার্থে, মানবতার স্বার্থে।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য যথা - অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর,নাগাল্যান্ড এবং অরুনাচল। এই সাতটি রাজ্যে জোরালো ভাবে চালু রয়েছে " Armed Forces Special Power Act " বা " AFSPA" (আফস্পা)। এই অমানবিক কালো আইন সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রেই শুধু চলতে পারে বলে মনে করেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সাব কমিটি অর্থাৎ Human Rights Sub Committee of UNO 1991এবং 1997 সালে AFSPA আইনকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদের সম্পুর্ণ বিরোধী বলে ঘোষণা করেছিল। UNO এটাও জানিয়েছিল যে, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত 1996 সালের আন্তর্জাতিক সনদ এবং 1984 সালের অত্যাচার বিরোধী সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ভারত, এই আইন বলবত রেখে চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ করেছে।

1958 সালের সশস্ত্র (বিশেষ ক্ষমতা) আইন - যা 1942 এ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে ব্রিটিশ এনেছিল " ভারত ছাড়ো " আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য - সেনাবাহিনীকে উপদ্রুত অঞ্চলে জঙ্গি দমনের নামে জনগণের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের ব্যাবস্থা নেবার অধিকার দেওয়া আছে। উক্ত আইনের -

4 A ধারায় আছে - কোনো ফৌজি জওয়ান, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাওকেই গুলি করে হত্যা করার অধিকারী।

4 B ধারায় বলা হয়েছে- সৈনরা জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস করার অধিকারী।

4 D ধারায় বলা হয়েছে - সেনাবাহিনী ওয়ারেন্ট ছাড়াই যখন খুশী যে কারোর বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালাতে পারে।

6 ধারায় বলা হয়েছে - কোনো সেনা জওয়ান যতই অপরাধ করুক, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ জানানো তো দূর কোনো মামলা দায়ের করা যাবেনা।

ভারতের ঘোষিত "গণতন্ত্র" র সাথে এই অমানবিক কালো আইন একেবারেই বেমানান। অবিলম্বে এই কালো আইন বাতিলের দাবীতে সোচ্চার হওয়া উচিৎ সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের।

অনেকের কাছে মনে হতেই পারে, দেশের সেনাদের কাজ, বলিদান, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ কে অপমান করতে এই লেখা। রোদ, জল, ঠান্ডা, খিদে,মৃত্যু ইত্যাদি কে উপেক্ষা করে সীমান্তে দাড়িয়ে থাকা সেনা জওয়ান দের অপমান করার উদ্যেশে এবং সস্তা প্রচারের লোভে এসব লিখছি।

যদিও এটা সম্পুর্ণ ভুল ধারণা। সেনা দের একাংশ যারা প্রকৃতই সৎ তারাও কিন্তু "আফস্পা "আইন কে বাতিল করার পক্ষে। কারন তাদের মত, এই কালো আইনের সুযোগ নিয়ে মণিপুরের নাগরিক দের সাথে দীর্ঘদিন ধরে অমানবিক অত্যাচার এবং শোষন চলছে। চলছে " রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস "। কোনো সেনা জওয়ান যতই চুরি,খুন ধর্ষণ করুক এই আইনে তাদের শাস্তি নেই। সেনাদের একটা অংশ ই কিন্তু মোটা অংকের বিনিময়ে পাচারকারী দের সাথ দেয়, এটাও ভুললে আমাদের চলবে না। হ্যাঁ, জানি সবাই এমন অসৎ নয়, কিন্তু দুর্নীতির বিচারে প্রথম সারিতে থাকা দেশে সৎ মানুষের সংখ্যা যে খুবই কম। আজ সিস্টেম টা যে বড্ড নোংরা হয়ে গেছে একদল ধান্দাবাজ নেতা মন্ত্রীদের সীমাহীন দুর্নীতি এবং নোংরা রাজনীতির জাঁতাকলে পিষে।

যারা ভাবেন সেনারা' ই আসল "দেশপ্রেমীক" তাদের উদ্যেশ্যে জানাতে চাই, শ্রদ্ধেয় কবিগুরু বহুদিন আগেই উপলব্ধি করেছিলেন "দেশপ্রেম"এর আসল অর্থ। তিনি তাঁর "আত্মপরিচয় " গ্রন্থে তাই লিখেছিলেন " দেশ মাটিতে নয়,মানুষে সৃষ্টি "। কবিগুরু সেই সব ধান্দাবাজ এবং মেকি নেতা নেত্রী দের মতন দেশপ্রেমিক ছিলেন না, যারা মুখে এক এবং কাজে আরেক নীতিতে বিশ্বাসী। কবিগুরু স্পষ্টভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন "দেশ " মানে কোনো ভূখণ্ড কিংবা মানচিত্র নয়।দেশপ্রেম মানে কখনোই শুধুমাত্র নিজের দেশর প্রতি প্রেম করা হতে পারেনা। বরং দেশের ভেতর বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত, বিপন্ন,নিরিহ, অসহায় মানুষকে প্রেম করাই হলো প্রকৃত দেশপ্রেম এবং যারা এই কাজ টি করতে পারেন আন্তরিকতার সাথে তারাই আসল দেশপ্রেমিক।

আমরা কবে সব জান্তার ভন্ডামীর ভান করা ছাড়বো? কবে "সাদা "কে সাদা এবং " কালো "কে কালো বলার ক্ষমতা রাখবো? রাষ্ট্রের দ্বারা নিপিড়িত, বঞ্চিত শোষিত মানুষ গুলো গর্জে উঠে প্রতিবাদ জানালেই কি তারা দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসবাদী, মাওবাদী অথবা শহুরে নকশাল? আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ভন্ড নেতা নেত্রীরাই কি ঠিক করে দেওয়ার অধীকারী, দেশপ্রেমী এবং দেশদ্রোহী

দের সংজ্ঞা? আজ, কেউ যদি চিৎকার করে বলে ওঠে " ভাত দে হারামজাদি নইলে মানচিত্র ছিঁড়ে খাবো " তাহলে কি তাঁকেও দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হবে?

" প্রিয় পাঠক বন্ধুরা, মনে রাখবেন সিস্টেমের একটা পায়া হলো সেনা রা। সিস্টেম বা সমাজকাঠামো কে রক্ষার শেষ শক্তি প্রয়োগের ধাপ সেনাবাহিনী। আর এই সেনাদের কিছু অংশই দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছে, যাতে বদনাম হচ্ছে বাকিদেরও। এদের প্রতি ঘৃনা ছুঁড়ে দেওয়ার দায়িত্ব প্রতিটি সৎ নাগরিক দের ই। এখানে বহুর ভেতর মাত্র পাঁচটি উদাহরণ তুলে ধরছি। একটি তথাকথিত 'স্বাধীন ' রাষ্ট্রের সেনারা তাঁদের দেশের নাগরিক দের সাথে কিভাবে ফ্যাসিস্ট আচরণ করে থাকে এগুলো তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

(১) July 2006 সালে ভারতের একাধিক দৈনিক পত্রিকাতে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি -
ট্রেনযাত্রীকে নগ্ন করে ঘোরাল মদ্যপ সেনারা
পাটনা, 5th জুলাই: "খালি কর ট্রেনের কামরা, না হলে ওর মতো করে ঘোরানো হবে সবাইকে।"
ওর মতো করে অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার পরমাত্মা যাদবের মতো। যাকে কাল রাতে গুয়াহাটি- নিউদিল্লী নর্থ ইষ্ট এক্সপ্রেসে নগ্ন করে ট্রেনের মধ্যে ঘোরায় সেনাবাহিনীর মদ্যপ জওয়ানেরা। এমনকি জওয়ানেরা তাঁর পায়ু মৈথুন করার চেষ্টা করেছিল বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ পরমাত্মার।
বারাউনি আর পি এফ সূত্রে জানা যায়,ওই জওয়ানেরা বারাউনি কাটিহার ডিভিশনের মানসি স্টেশন থেকে মদ্যপ অবস্থায় ওই জেনারেল কামড়ায় চড়ে। ট্রেনে উঠেই তাঁরা বসে থাকা যাত্রীদের সিট ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বলে। কিছু যাত্রী প্রতিবাদ করলে তাঁদের মালপত্র চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে জানায় পুলিশ...........

(২) *ফৌজি পীড়নে বিধ্বস্ত মণিপুরী কিশোর - কিশোরী*। এই শিরোনামে একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় 20th June 2002 সালে। সমীক্ষক -সৌভদ্র চট্টোপাধ্যায়, ইম্ফল।

১৯ জুন: বয়স ছিলো ১৪। কাকা জঙ্গি, ফেরারা। জঙ্গি কাকার খবর বার করতে তাকে তুলে নিয়ে যায় অসম রাইফেলস। প্রায় দু' সপ্তাহ পরে ছাড়া পায় ছেলেটি। দ্বিতীয়বার একই কারণে তাকে আটক করা হয় ১৭ বছর বয়সে। তারাপর আরও একবার। যখন সে বিশ বছরের যুবক।
মণিপুরের উরিপক এলাকার ২৪ বছর বয়সের এই যুবক জোরালো শব্দ সহ্য করতে পারেনা। অন্ধকারে থাকা পছন্দ করে। পোড়া বা কোনো উগ্র গন্ধে চিৎকার করে ওঠে সে। দুর্বল স্বাস্থ্য। অচেনা লোকেদের সম্পর্কে অসম্ভব ভীত। খিদে নেই। সারাক্ষণ গুটিয়ে থাকে। কোনো বিষয়ে ১৫-২০ মিনিটের বেশী মনঃসংযোগ করতে পারে না নিম্ন- মধ্যবিত্ত পরিবারের এই যুবক।
১৬ বছরের মেয়েটির কথাই ধরা যাক। তার জবানবন্দি অনুযায়ী, " মা মদ বিক্রি করতো। সেখানে নিয়মিত মদ্যপান করতে আসত তিন সেপাই। " একদিন মায়ের অনুপস্থিতিতে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে একশো টাকার নোট ফেলে রেখে দিয়েছিল। হ্যাঁ, আগের দিন একটা লিপস্টিক উপহার দিয়েছিল বটে।
ইম্ফল উপত্যকার মৈতেই মেয়েটির কথায় " আমার কোনো যৌন ইচ্ছা আর অবশিষ্ট নেই। আমি সারা দিন মদ খেতে পারলেই খুশি। আর কিছু চাই না এই জীবন থেকে "।
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ' কোব ' এর " টরচার্ড চিলড্রেনস প্রোগ্রাম " এ এমন শারীরিক ও মানসিক আঘাত গ্রস্তের উদাহরণ ভুরি ভুরি।

কেবল গ্রামাঞ্চলেই নয়, নিরাপত্তারক্ষীদের অত্যাচারে এমন জিবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে শহরের তথাকথিত ' সুরক্ষিত ' এলাকার বহু শিশু, কিশোর, যুবক।

সম্প্রতি থৌবাল জেলার লাপথেন গ্রামে অসম রাইফেলসের অভিযানের পরে ২১ জন গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়ে ইম্ফল হাসপাতালে ভর্তি আছেন,তা কোনো ব্যাতিক্রমী ঘটনা নয়।মণিপুরে এই ট্রাডিশন দীর্ঘদিনের।
গত প্রায় দুই দশক ধরে ক্রমাগত সংঘর্ষের পরিমন্ডলে থাকতে থাকতে মণিপুরিদের অবস্থা কী রকম?

ইম্ফলের জওহরলাল নেহেরু হাসপাতালে মনস্তত্ত্ববিদ শান্তিবালা দেবী, ১৯৯৬-৯৮, এই সময়টা চূড়াচাঁদপুর জেলায় ছিলেন। তাঁর কথায়, "বহু সাধারন মানুষ হিস্টিরিক্যাল হয়ে গিয়েছিল। অনেকের মধ্যে প্রবল ভয় ছিল,এই বুঝি ফৌজিরা ধরতে আসবে,এই বুঝি কেউ খুন করে ফেলল।"

এই পরিস্থিতিতে মণিপুরে আত্মহননের প্রবণতা সাংঘাতিক রকমের বেশী। 'কোর' এর সমীক্ষা অনুসারে, ৯৬-৯৮ সালে মণিপুরে আত্মহত্যার হার ছিল প্রতি মাসে ৪.৪। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করত প্রতি মাসে ৭ জন। ৯৮-৯৯ সালে আত্মহত্যার হার বেড়ে দাঁড়ায় মাথাপিছু ৮ জন। আত্মহত্যার তালিকায় পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ছিল ১:১।

৯৭ সালে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে নিহতের সংখ্যা ৪১৬, অত্যাচারিত ৭১ জন।৩৮ জন নিখোঁজ হয়েছে। ৭২ টি ' কাস্টাডি ডেথ ' এর খবর প্রকাশিত হয়েছে। ৯৮ এ সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে, ৪১৭, ৭১,১৪,১০।

'কোর' এর সভানেত্রী আনা পিন্টো জানিয়েছেন "গত তিন বছরে মণিপুরে মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংস্রতার ঘটনা ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।"

শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন আক্রমণের ঘটনা '৯৭ সালে মণিপুরে ২ টি হয়েছিল। এক বছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ এ।
গত এক বছর ধরে 'কোর' ইম্ফল, মোরে,উখরুলের শহর,আধা- শহর,অঞ্চলে এক সমীক্ষা চালিয়েছিল ৪০ বছর বয়সি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মানুষের উপর। দেখা গিয়েছে,প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে দিনরাত কাটিয়ে এদের মধ্যে ড্রাগ, মদ্যপান, জুয়াখেলার প্রবণতা বেশি।

(৩) প্রিয় পাঠক বন্ধুদের অনুরোধ করবো নিজের স্মৃতি কে খানিকটা পেছনের দিকে নিয়ে যেতে। ' থাংজাম মনোরমা 'র নামটা মনে পরে কি আপনাদের? হ্যাঁ, আমি সেই যুবতী থাংজাম মনোরমা' র কথাই বলছি যাকে অসম রাইফেলস এর জওয়ানেরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় 10th July 2004 এ, এরপরে নগারিয়ান পাহাড়ে পাওয়া যায় তাঁর বুলেটে ছিন্ন মৃতদেহ, সর্বাঙ্গে ছিল যৌন অত্যাচারের স্পষ্ট চিহ্ন। অর্থাৎ তাঁকে সম্ভবত গণধর্ষণ করেই খুন করেছিল অসম রাইফেলস এর 17 No. ব্যাটেলিয়ন। এই জঘন্যতম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে ওঠে মণিপুর। 15th July 2004 এ অসম রাইফেলস এর সদর দপ্তর ' কাংলাফোর্ট ' এর সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে 12 জন মহিলারা দাঁড়িয়ে পড়েন। সাদা কাপড়ে, লাল কালিতে " INDIAN ARMY RAPE US " লেখা শ্লোগান গোটা বিশ্ব সেদিন দেখেছিল। এই ঘটনায় ক্ষোভে, ঘৃণায় ফেটে পড়ে বিশ্বের প্রায় সমস্ত ' মানবতাবাদী ' রা। আফস্পা আইন কে শিখণ্ডী করে কিভাবে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে মানবাধিকার হরণ হচ্ছে, মনোরমা'র ঘটনা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

(৪) একটি নির্ভেজাল রিপোর্ট। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, 30th November 2008। *কিনশাসা, কঙ্গো*।।

অনেক হয়েছে, ভারতীয় সেনাদের আর চাই না। শান্তিবাহিনী পাঠাতে চান পাঠান, কিন্তু ভারতীয়দের বাদ দিয়ে অন্য দেশ থেকে পাঠান। রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর অনুরোধ। কঙ্গোয় সরকার বনাম জেনারেল এনাকুন্ডার নেতৃত্বে সরকার বিরোধীদের তীব্র সংঘর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাহত,গৃহহীন। ৪৪ টি কমিউনিটি গ্রুপ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে

সাহায্য প্রার্থনা করায়,রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে কয়েক হাজার সেনা সংবলিত শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো হয়। তার মধ্যে যে ভারতীয়রা প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা নাকি স্থানীয় সোনা লুণ্ঠন,ধর্ষণ ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত। কঙ্গো সরকারের মতে, মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ক্রমাগত অভিযোগ করেছেন ভারতীয় সৈনদের বিরুদ্ধে। অভিযোগের কিয়দংশ যদি সত্যি হয়,তাহলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মাথা হেঁট হল।

(৫) নাগাল্যান্ডের মোন জেলায় 5th December 2021, শনিবার সন্ধ্যাবেলায় কয়লা খনি থেকে পিক-আপ ভ্যানে করে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন দিনমজুর শ্রমিক। টেরোরিস্ট সন্দেহে 11জনকে গুলি করে, ভুল করে খুন করে ফেলেছে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি। তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছে, " An investigation is underway to ascertain whether the incident was a case of mistaken identity ".

এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হাঁড়ির একটা ভাত টিপে যেমন চাল টা সেদ্ধ হয়ে ভাতে পরিনত হয়েছে কিনা বোঝা যায়, তেমনই সিস্টেমের অঙ্গ সেনাবাহিনীদের একাংশের কাজ দেখেই বাকিটুকু বিচার করা যায় " মুক্তকণ্ঠে "। এই অবস্থা কি চলছে, চলবে?

প্রিয় পাঠক বন্ধু, প্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুক্তমনা মানুষের কাছে বিনীত অনুরোধ, আসুন আমরা সকলে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানাই এই আফস্পার বিরুদ্ধে। বন্ধ হোক আফস্পার মতন কালো আইনের সুযোগ নিয়ে অসহায় মানুষের সাথে বঞ্চনা, শোষন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। প্রবল জনরোষের চাপে May 1995 তে বাতিল হয়েছে "The Terrorist And Desperative Activities (Prevention) Act 1987" বা "TADA"। এছাড়াও " The Prevention Of Terrorism Act 2000 " বা "POTA", যা 21st September 2004 এ বাতিল করা হয়। উক্ত আইনগুলো যদি বাতিল হতে পারে তাহলে বিশ্বজনমতের চাপে বন্ধ হোক মানুষের অধিকার হরণের মতো জঘন্য কালো আইন "আফস্পা"।

ভারতের সেরা কালো আইন “UAPA”

দিনটি ২৬ শে নভেম্বর ২০০৮। মুম্বাই তে ঘটে গেলো ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা। এই ঘটনার ২০ দিন পরে সাংসদে একটি বিল পাশ হলো যার নাম ‘Unlawful Activities Prevention Act (Amendment) 2008’ বা “UAPA 2008”

উক্ত আইনে বলা হচ্ছে, বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখা যাবে। দেশের প্রচলিত আইনে কোনো বিচারাধীন আসামীকে সর্বাধিক ১৫ দিন পুলিশ হেপাজতে রাখা যায় (Sec 43D)। কিন্তু " ইউএপিএ" আইনানুসারে বিনা বিচারে ১৮০ দিন আটক রাখা যাবে। বিদেশীদের বিনা বিচারে আজীবন আটকে রাখা যেতে পারে। সাক্ষের বয়ান ও পরিচয় জানানো হবে না বিচারাধীন আসামী কে। একজন সাংবাদিক তার সংবাদের 'সোর্স' জানাতে বাধ্য থাকবেন। একজন আইনজীবী তার মক্কেলের যাবতীয় গোপন তথ্য জানাতে বাধ্য থাকবেন।

পুলিশদের পক্ষে আইনটিতে বলা হয়েছে - ধরেই নেওয়া হবে একজন পুলিশ তদন্তকারী অফিসার সততার সাথে শুভ বিশ্বাস নিয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করছেন। তাই তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। কোনো ব্যাক্তি সন্ত্রাসবাদী কাজেকর্মে সহযোগিতা বা প্ররোচিত করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। এক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার বা সংস্থার যদি মনে হয় সেই ব্যাক্তিটি উগ্রপন্থী কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্য ছিলো, তাহলেই গ্রেপ্তার করা যাবে।

গত ২৪ শে জুলাই ২০১৯ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ "UAPA" আইনের শংশোধন করলেন সাংসদে। সংশোধিত বিলে বলা হয়েছে "শুধুমাত্র সন্দেহ হলেই কোনো ব্যাক্তিকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হতে পারে এবং সরকারী তদন্তকারী গোয়েন্দা সংস্থা প্রয়োজনে যেকোনো রাজ্যে গিয়ে তদন্ত চালাতে পারে। ২৮৭ জন সাংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাশ হয়েছে এই বিলটি। নিন্দুক মানুষেরা প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, সরকারের হ্যাঁ তে হ্যাঁ এবং না তে না মেলালেই কি দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসবাদী? সরকারের সমালোচনা কিংবা দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেই কি সে সন্ত্রাসবাদী অথবা পাকিস্তানের চর? সরকার কি ঠিক করবে দেশপ্রেমীক এবং দেশদ্রোহীর সংজ্ঞা? যারা অসহায়,শোষিত, বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকারের জন্য সরব হয় তারা কি সত্যিই দেশদ্রোহী, মাওবাদী, শহুরে নকশাল? বিরোধী কণ্ঠস্বর কে আটকানোর জন্যই কি এই আইনের শংশোধন?

কবিগুরু তারা আত্মপরিচয় গ্রন্থে লিখেছিলেন "দেশ মাটিতে নয় মানুষে সৃষ্টি", তবে কি কবিগুরু ভুল ছিলেন? দেশ মানে কি শুধুমাত্র একটা মানচিত্র কিংবা ভূখণ্ড মাত্র? অসহায় নিরন্ন বঞ্চিত শোষিত মানুষের প্রতি ভালোবাসা কি দেশপ্রেম নয়?

মনে পড়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ শক্তির হাতে পরাধীন ভারতে ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন কে। যেখানে স্রেফ সন্দেহ বশেই কাউকেই গ্রেপ্তারের বিধান ছিলো। "UAPA" সংশোধিত আইনে কি অনেকটা একই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না? একটা ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি কি সত্যিই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না? মুক্তচিন্তার পথ কে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে মগজধোলাই দ্বারা। অসহায় মানুষের জন্য লড়াই টাও আজ হয়ে উঠছে দেশদ্রোহীতা। ভন্ডদের সাথে আসল দেশপ্রেমী কে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। নিরন্তর মগজধোলাই করে মানুষের ভেতর জাগিয়ে তোলা হচ্ছে বিভেদ, অন্ধবিশ্বাস, বিদ্বেষের বিষ। প্রকৃত জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী দের সাথে গুলিয়ে ফেলানোর চেষ্টা চলছে যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। যে আইন টাকে এনে ভুলটা কংগ্রেস সরকার করেছিল সেই ভুল কে আরো সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেছে বর্তমান সরকার।

প্রবল জনরোষের চাপে ইতিমধ্যে বাতিল হয়েছে "The Terrorist And Desperative Activities (Prevention) Act 1987" বা "TADA"। যা বাতিল হয় May 1995. এছাড়াও "The Prevention Of Terrorism Act 2000" বা "POTA", যা 21st September 2004 এ বাতিল করা হয়। "AFSPA & UAPA তো বর্তমানে আছেই। এই ধরনের কালো আইন,জঙ্গলের আইন শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রেই চলতে পারে বলে মনে করে রাষ্ট্রপুঞ্জ।

একজন বিজ্ঞানমনস্ক সমাজবিজ্ঞানী লেখক মনে করেন- "দুর্নীতির রাস্তা খোলা রেখে কোনও কড়া আইন তৈরী করেই সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবেনা। বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী 'ভি আই পি' এবং' ভিভি আই পি' দের অনেকেই ঘুষ দিয়ে অতীতে সন্ত্রাসবাদী কাজে সাহায্য করেছে,ভবিষ্যতেও করবে"। অবিলম্বে এই কালো আইন বাতিলের জন্য সোচ্চার হন। দলমত নির্বিশেষে পথে নামুন।

সংযোজন: ভীম কোড়েগাঁও মামলা। অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ছক। অভিযুক্তের নাম ফাদার স্ট্যান স্বামী। বয়স ৮৪। রাচি থেকে NIA ৮ অক্টোবর ২০২০ সালে থেকে বিনাবিচারে Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) আটক রাখে। ভীম কোড়েগাঁও মহারাষ্ট্র, আটক ছিলেন তলোজা সেন্ট্রাল জেলে। ফাদার স্টান পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং বার্ধক্যজনিত কারণে নিজের দৈনন্দিন কাজটুকুও নিজে করতে পারতেন না। আজ তাঁর মৃত্যুর খবর এলো।
মনে রাখবেন, এটা কিন্তু সাধারণ মৃত্যু নয়, রাষ্ট্রের পরিকল্পিত হত্যা।
শহীদ কমরেড ফাদার স্টান স্বামী লাল সেলাম।

ভারতের সরকারি ভাষা প্রসঙ্গে আইন

-ঈশান

"বাউল থেকে চর্যাপদ, ভাষা আমার প্রান,
একুশ মানে সেই ভাষাতেই রক্তঝরার গান।
সম্প্রতি চলে গেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই, ভাষা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সেইসব মানুষদেরকে।
"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১-শে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলতে পারি।"

আমাদের প্রত্যেকেরই মাতৃভাষা আছে, কিন্তু রাষ্ট্র ভাষা নেই। হ্যাঁ সত্যিই নেই। সম্ভবত ২০১৩ সাল থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারীর ঠিক দিন দুয়েক আগে থেকে কিছু অতিবোদ্ধারা (যাদের মধ্যে একশ্রেণীর বাঙালিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) নানানরকম বিকৃত তথ্যসহ প্রমাণে মরিয়া থাকেন যে - (১) হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা, (২) আরবী বা উর্দু নয় বাংলা চাই।

এই অতিবোদ্ধা, জ্ঞানপাপী প্রচারকারীদের এটা জানিয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন যে, National Language এবং Official Language দুটো সম্পূর্ণ কিন্তু আলাদা বিষয়। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের এই ভারতের কোনো রাষ্ট্রভাষা নেই। ভারতের সংবিধান ও ১৯৬৩ সালের 'Official Language Act' দ্বারা যা সুচিহ্নিত। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৩ নং ধারা অনুযায়ী, কেন্দ্র সরকারের দাপ্তরিক ভাষা (Official Language) ইংরেজি ও হিন্দি। ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ এবং ৩০ এ এই নিয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।
আরার ১২০ নং অনুচ্ছেদে সংসদে কি ভাষায় কাজকর্ম চলবে, তারও বর্ণনা রয়েছে।

সংবিধানের ৩৪৩ (১) ধারায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে "The Official Language of the Union government shall be Hindi in Devanagari script.", অর্থাৎ দেবনাগরী হরফে হিন্দি হল ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের (যাকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার বলে থাকি) সরকারি ভাষা। হিন্দিতে সংবিধানের ৩৪৩ (১) ধারার রূপান্তর হয়েছে এই রকম - "देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगा।" হিন্দির প্রচলিত রূপ অনুযায়ী শব্দটা হওয়া উচিৎ ছিল "সরকারি ভাষা"। কিন্তু প্রচলিত রূপ থেকে আদর্শ হিন্দিকে প্রায় সংস্কৃত বানিয়ে তোলার তাগিদেই এমন একটা অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছিল। আর ধ্বনির সাযুজ্য এবং বিশেষ তাগিদে সেটাকেই কেউ কেউ বানিয়ে ফেলেছেন রাষ্ট্রভাষা।

সংবিধানের ৩৪৩(২) ধারায় বলা হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত হিন্দির পাশাপাশি ইংরাজিও একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হবে। আবার ৩৪৩(৩) ধারায় বলা হল, "Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of
(a) the English language, or
(b) the Devanagari form of numerals, for such purposes as may be specified in the law."

সংবিধানের ৩৪৩ (৩) ধারার ভিত্তিতেই ১৯৬৩ সালের "Official Language Act" - এর মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের ২৬ শে জানুয়ারির পরেও ইংরাজির ব্যবহার অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কী কী ক্ষেত্রে? দেখে নেওয়া যাক। section 3- তে বলা হয়েছে "Continuation of English Language for official purposes of the Union and for use in Parliament-
(1) Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the
commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi,

(a) for all the official purposes of the Union for which it was being used (a) for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately
before that day;
and
(b) for the transaction of business in Parliament:
Provided that the English language shall be used for purposes of communication
between the Union and a State which has not adopted Hindi as its Official Language:

Provided further that where Hindi is used for purposes of communication between one State which has adopted Hindi as its official language and another State which has not
adopted Hindi as its Official Language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in the English language:

Provided also that nothing in this sub-section shall be construed as preventing a State which has not adopted Hindi as its official language from using Hindi for purposes of communication with the Union or with a State which has adopted Hindi as its official language, or by agreement with any other State, and in such a case, it shall not be obligatory to use the English language for purposes of communication with that State.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where Hindi or the English
Language is used for purposes of communication-
(i) between one Ministry or Department or office of the Central Government and
another;
(ii) between one Ministry or Department or office of the Central Government and any

corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office thereof.;
(iii) between any corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office thereof and another,
Translation of such communication in the English language or, as the case may be, in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the concerned Ministry,
Department, office or the corporation or company aforesaid have acquired a working knowledge of Hindi.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) both Hindi and the English
languages shall be used for-
(i) resolutions, general orders, rules, notifications administrative or other reports or press communiques issued or made by the Central Government or by a Ministry"।

প্রসঙ্গত জানাই, ২০১০ সালে একটি জনস্বার্থ মামলা হয় গুজরাট হাইকোর্টে। মামলাকারীরা বলেন যে কোন পণ্যের গায়ে সেই পণ্যের তৈরির তারিখ, তার উপকরণ এবং দাম এগুলি হিন্দিতে লিখতে হবে কেননা ইতিমধ্যেই হিন্দি ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। এই তথ্যকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে হাইকোর্ট সেদিন রায় দানের সময় জানায়, আদৌ হিন্দি ভারতের জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃত নয়। সাথে এটাও জানানো হয়েছিল, হিন্দি, গুজরাটের মাটিতে বিদেশী ভাষা। ২০২০ সালে প্রাণোজিৎ কর্মকার একটি RTI করেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যার উত্তরে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, "ভারতের কোনো রাষ্ট্রীয় ভাষা নেই।"

সংবিধান অনুযায়ী, 'ক্যাটেগোরি সি' রাজ্যে জনপরিষেবার ক্ষেত্রে সেখানকার ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য কেন্দ্র সরকার। পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ আমাদের রাজ্য বাংলায় 'ক্যাটেগোরি সি' রাজ্য। এখানে বাংলা ব্যবহার বাধ্যতামূলক। আর রাজ্য সরকার তার নিজের ইচ্ছে মতন রাজ্যের সরকারি ভাষা ঠিক করতে পারে।

ভারতে স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা ছিল ১,৬৫২টি। ২০০১ সালে এই ভাষার তালিকাকে আরেকটু অর্থবহ করে তোলা হয়েছে। দশ লক্ষ বা তার বেশি মানুষ কথা বলে এরকম ২৯টি ভাষাকে নির্বাচন করা হয়েছিল এবং দশ হাজার মানুষ কথা বলে এরকম ১২২ টি ভাষাকে আলাদা করা হয়েছিল। ২০০৪ সালে অবশ্য স্বীকৃত ভাষার এই তালিকা ছোট করে ২২টি করা হয়েছে। তবে, এখন নাকি ওপর থেকে দাদারা চাপ দিয়েছে আরো অন্তত ৩৮টি ভাষাকে আনুষ্ঠানিক তালিকায় যোগ করতে চলছে তোড়জোড়।

এই ভাষাগুলির মধ্যে ১৪টি সংবিধানে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২১তম সংবিধান সংশোধনীতে সিন্ধি ভাষাটি ১৯৬৭ সালে যোগ করা হয়েছিল। তারপরে ৭১তম সংবিধান সংশোধন আইন অনুসারে তিনটি ভাষা যেমন কোঙ্কনি, মণিপুরী ও নেপালীকে ১৯৯২ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে ৯২তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে ২০০৪ সালে বোডো, ডোগরি, মৈথিলি ও সাঁওতালি যোগ করা হয়েছিল।
সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত ২২ টি ভাষা হচ্ছে- (১) আসামি, (২) বাংলা (৩) গুজরাতি, (৪) হিন্দি, (৫) কন্নড়, (৬) কাশ্মিরি, (৭) কোঙ্কনি, (৮) মালয়ালাম, (৯) মণিপুরী, (১০) মারাঠি, (১১) নেপালি, (১২) ওড়িয়া, (১৩) পাঞ্জাবি, (১৪) সংস্কৃত, (১৫) সিন্ধি, (১৬) তামিল,
(১৭) তেলুগু, (১৮) উর্দু (১৯) বোডো (আসামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাষা শোনা যায়)
(২০) সাঁওতালি, (২১) মৈথিলি ও (২২) ডোগরি (জম্মু-কাশ্মীরে)।
আলোচনার সূত্রে জানিয়ে রাখি, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (বিজয় দিবস) থেকে কার্যকর হয়। সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে

৩৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সংবিধান কমিটি গঠন ও কমিটি কর্তৃক খসড়া প্রণয়ন ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট "খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন কমিটি" গঠিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "বাংলা ভাষা" বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা। প্রায় ৯৯% বাংলাদেশির মাতৃভাষা বাংলা। মোটেই উর্দু কিংবা আরবী নয়।

তাই আমরা উর্দু কিংবা আরবী যেমন চাই না ঠিক তেমনই জোরকরে চাপিয়ে দিতে চাওয়া হিন্দিও চাইনা। বাংলার বাঙালি মায়েদের মুখনিঃসৃত ভাষা "বাংলা"। দুঃখের বিষয় এটাই, এই ভাষায় কথাবলতে অনেক বাঙালির আজ লজ্জা লাগে।

ডাইনির নামে হত্যাকান্ড ও সংবিধান কী বলে?

-অভিষেক দে

সময়টা ২০০১ সালের সম্ভবত জানুয়ারি মাস। বাঁকুড়ার একটি গ্রামে গিয়েছি বন্ধু কৌশিক এর মামাতো দাদার বিয়েতে। বিয়ের আগের দিন সন্ধেবেলা গ্রামে পৌছে মেতে গেছি বিয়ের অনুষ্ঠানে। পরের দিন খুব ভোরে উঠে বন্ধুর একজন মামার সাথে বন্ধু কৌশিক এবং আমি বেরিয়েছি শীতের সকালে গ্রাম ঘুরতে। ঘুরতে ঘুরতে এক যায়গায় দেখি অনেক মানুষের ভীড়। ব্যাপার টা কি জানতে আমরা তিনজনে উক্ত স্থানে চলে আসি। দেখি কয়েকজন হোমড়াচোমড়া ব্যাক্তি খুব উত্তেজিত হয়ে কয়েকজন কে যেন কড়াভাষায় কিছু বলছে এবং তাঁদের অনতিদূরে একজন ষাটোর্ধ মহিলা অসহায় ভাবে মাটিতে মাথা নীচু করে কাঁদছেন। বন্ধুর মামা আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে বিষয় টা জেনে এসে আমাদের জানালেন, উক্ত মহিলা নাকি ডাইনি। গ্রামের একজন কে দেখলাম উনি নাকি গুণিন, তিনিই নাকি জানিয়েছেন উক্ত মহিলাটি একজন ডাইনি এবং মহিলার পরিবার কে গ্রামের মাতব্বর দের কাছে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে এর জন্য নইলে গ্রামে থাকা উক্ত পরিবারটির পক্ষে নাকি অসম্ভব।

ডাইনির ব্যাপারে গল্পের বইতে আগে অনেক পড়েছি, কিন্ত এভাবে সরাসরি একজন ডাইনি কে দেখে বিষ্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম বিষয়টা সেদিন ভালোভাবে না জানার দরুন। জানিনা, ডাইনি ঘোষিত সেই মহিলা এবং তাঁর পরিবারটি আদৌ অতগুলো টাকা দিয়ে গ্রামে থাকতে পেরেছিলেন কিনা। অনেক পরে জেনেছি ডাইনি বা ডায়েন বলে বাস্তবে কিছুই হয় না,ওসব গল্পগাঁথাতেই সম্ভব। কিন্ত আমি বললেই বা লোকে মানবে কেন? বাড়ির চালে ফনফন করে লাউ গাছ বেড়ে উঠছিল,কড়াও পরেছিল রাশি রাশি। আচমকা গাছ শুকিয়ে মরে গেলো। কেউ কি তবে কু-নজর দিয়েছে গাছে? কে-সে? ডাইনি নয় তো? সদ্য প্রসুতির সন্তান ক্ষিদের জন্য কাঁদছে অথচ মায়ের স্তনে মুখ দিচ্ছে না, কেউ কি মায়ের স্তন ভেড়ে দিয়েছে? সে, ডাইনি নয় তো? ছটফটে শিশুটা কেমন যেন হঠাৎ করেই ঝিমিয়ে গেছে। এটা ডাইনির কু-নজর নয়তো? এই তো গতবছর হারাণ এর মা এর পায়ে ঘা হয়, মলম লাগিয়েও কাজ হয় নি শেষে গ্রামের একজন গুণিনের কাছে জানতে পারলো গ্রামেরই এক ডাইনি, সেই পা এর রোগ টা জিইয়ে রেখেছে। শেষে গুণিন কে দক্ষিণা দিয়ে কিসব শেকড়বাকড় পরে সুস্থ হলো।

শুধু আদিবাসী সমাজ নয়, শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া কিংবা শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত শহুরে মানুষের একাংশও ডাইন বা ডাইনি বা ডায়েন এ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। আদিবাসী সমাজে এই বিশ্বাস হচ্ছে সমুদ্র গভীর। কোনো গ্রামের কোনো গুনিন,জানগুরু, ওঝা,দিখলি, সৎসখা ইত্যাদিরা যদি কোনো মহিলাকে একবার ডাইনি ঘোষণা করে দেয় তাহলে সেই মহিলাকে বাঁচানো খুবই সমস্যার। গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বর দের বিধান মতো ঘোষিত ডাইনির পরিবার কে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিয়ে তবে গ্রামে থাকতে হয়। কখনওবা ডাইনি বলে যাকে দেগে দেওয়া হয় তাঁকে প্রকাশ্যে নির্মম ভাবে হত্যাও হয়। খবরের কাগজে প্রায়শই এমন খবর আমাদের চোখে পরে। বিভিন্ন দেশের নানান গল্পগাঁথায় ডাইনি নিয়ে প্রচুর কাহিনী রয়েছে এসব গল্পই ধিরে ধিরে আমজনতাকে ডাইনির প্রতি বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। বাধ্য করে শেখাতে যে, ডায়েন বা ডাইনিদের কোনো অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা আছে, এবং ডাইনিরা সমাজের ক্ষতিই করে থাকে। স্টার প্ল্যাস হিন্দি চ্যানেলে তো ডাইনির প্রতি জনগণের বিশ্বাস জাগাতে ' নজর ' নামে একটা সিরিয়াল পর্যন্ত হয়েছে। এইধরনের সিরিয়াল বা সিনেমার প্রভাব মানবজীবনে অনেক। ডাইনি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে না জানি কত অসহায় মহিলারা সামাজের চোখে অপরাধী হয়ে অত্যাচারিত হবে, হচ্ছেও। প্রশাসনের

নাকের ডগায় বসে এসব চললেও কোনো প্রতিবাদ,প্রতিরোধ নেই। এই প্রসঙ্গে একটি লজ্জাজনক ও নৃশংশ ঘটনার কথা আপনাদের শোনাই।

রাঁচির মান্দার ব্লকের কাঞ্জিয়া মারাইটোলি গ্রাম। এই গ্রামেই গত ৭ই অগাস্ট, ২০১৫ সালে পাঁচজন মহিলা কে পিটিয়ে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে একদল উন্মত্ত গ্রামবাসী।
উক্ত পাঁচজন মহিলার অপরাধ, তারা নাকি " ডাইনি"। রাঁচির এই গ্রামে কেউ ডাইনি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেনা, বরং গভীরে বিশ্বাস করে। ফলে যা হয় সেটা সত্যিই ভয়াবহ।
২০১৪ সালে এই মারাইটোলি গ্রামের পাশেই একজন মহিলাকে ডাইনি ঘোষণা করে হত্যা করার পরে গ্রামের এক ওঝার নিদান মতে সাইকেলের হ্যান্ডেলে উক্ত মহিলার কাটা মাথা নিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরানো হয়।পুলিশ প্রশাসন কে সম্পুর্ন উপেক্ষা করেই। পুলিশ আসায় গ্রামবাসীরা জানায়, খুন করে বেশ করেছি। (তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ আগষ্ট ২০১৫)।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৩ থেকে ২০১৫ র অগাস্ট পর্যন্ত ডাইনি সন্দেহে কিংবা বিশ্বাসে এই গ্রামে ১২৪ জন মহিলা দের নির্মম ভাবে হত্যা হয়েছে। আরেকটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে আরেকটি জঘন্য ঘটনার কথা শোনা যাক।

বাঁকুড়া সিমলাপাল অঞ্চলের চূড়ামণি মান্ডি এবং তার পরিবার গত প্রায় দেড়বছর হল গ্রামে ফিরতে পারছেন না। কারণ তিনি নাকি ডাইন বা ডাইনি। গ্রামের একজন
জানগুরুর নির্দেশে, পরিবারটিকে জমিজমা বিক্রি করে জরিমানাও দিতে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তাঁদের ভিটেমাটিতে থাকার অধিকার নেই।
বর্তমানে একটা আদিবাসী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অনুগ্রহে পরজীবির মত বেঁচে আছেন ওনারা। অদ্ভুত এই অবস্থা। প্রশাসন সব জেনেও অন্ধ সেজে বসে আছে।
আশ্চর্য হলেও, রাগ হলেও এটাই আমাদের ভারত।
প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব কান্ড ঘটলেও তারা নির্বিকার।

" ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি " র পুরুলিয়া শাখার সম্পাদক মধুসূদন মাহাতো, দীর্ঘবছর ধরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ জঙ্গলমহল এলাকায় যুক্তিবাদী বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিশেষ ভাবে ডাইনি সমস্যা সহ আদিবাসী এলাকার আরেকটি সমস্যা নাবালিকা বিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজ মধুসূদন মাহাতো সহ কয়েকজন মুক্তমনা সহযোদ্ধারা নিরলস ভাবে কাজ করছেন। সম্প্রতি, মধুসূদন মাহাতো, তথ্যের অধিকার আইনে রাজ্যে সরকারের স্টেট ক্রাইম ব্যুরোর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে কত মানুষকে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হয়েছে?
সরকার লিখিত ভাবে জানিয়েছে এবিষয়ে কোন তথ্য তাদের কাছে নেই। ভাবা যায়! যেখানে তথ্যই নেই সেখানে প্রতিকার দুরাশা করাটা বোকামো।
স্বাভাবিক ভাবেই প্রশাসনের দারস্থ হয়েও সুবিচার পাননি চূড়ামণি মান্ডি এবং তার পরিবার। এই অবস্থাই কি চলছে, চলবেও? প্রশাসন কি এভাবেই জেগে ঘুমাবে? কিছু আলোচনার সময়ে মধুসূদন মাহাতোর দাবী, কাউকে ডাইনি বলে দেগে দেওয়ার পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত আছে। দেখা যাচ্ছে, যেই বছর কম বৃষ্টিপাত বা অনাবৃষ্টির ফলে খরার প্রকোপ দেখা যায় সেবছরই ডাইনির ঘটনা বেশি শোনা যায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতন যায়গায় এমনিতেই চাষাবাদ খুব কম হয় বৃষ্টি বা জলের অভাবে। তাই কয়েকজন ধূর্ত ব্যাক্তি এই বিষয় টাকে হাতিয়ার করে। তাঁরা বুজরুক, প্রতারক ওঝা,গুণিন, জানগুরু ইত্যদিদের সাথে মিলে কোনো মহিলা কে ডাইনি ঘোষণা করে দেয় এবং সঙ্গে থাকে মোটা অঙ্কের জরিমানা। স্বাভাবিক ভাবে অনেকেরই সেই টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই বলে চলে অত্যাচার এবং গ্রামে একঘরে করে রাখার বিধান। সোজা কথা, উদ্দ্যেশ্যে, কোনো মহিলাকে ডাইনি বলে দেগে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়ার নোংরা চক্রান্ত। যেহেতু গ্রামগঞ্জে আজও ডাইনির ক্ষমতায় বিশ্বাসী (পড়ুন

অন্ধবিশ্বাসী) মানুষের অভাব নেই তাই বিশ্বাসীরাও দল কোমড় বেঁধে নেমে পড়ে যাকে ডাইনি ঘোষণা করা হয়েছে তাঁর অথবা তাঁর পরিবারের ওপরে ক্রমাগত চাপ দিতে জরিমানার টাকা দেওয়ার জন্য।

যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান কিংবা মনোবিজ্ঞান আজকের মতন এতো উন্নত হয়নি সেসময় অজানা জ্বর বা রোগের প্রাদুর্ভাব কে অনেকে বোঙ্গা বা দেবতার অভিশাপ নয়তো ডাইনির কারসাজি ধরে নিতো। অবস্থা এখনো পালটায় নি। আজও প্রত্যন্ত গ্রামে সু-চিকিৎসার কেন্দ্র নেই। তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের ৭৩ বছর পরেও। আজও একশ্রেণীর মানুষের পরনে কাপড় নেই, হাতে রোজগার নেই, সু-চিকিৎসা নেই, পেটে খাদ্য দেওয়ার মতন অবস্থা নেই, পারিস্কার পানীয়জল নেই, বাসস্থান নেই, মাথার ওপরে ছাদ নেই। এই নেই এর রাজ্যে আছে শুধু প্রতারণা, বুজরুকি, ধর্মের সুড়সুড়ি। গলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ডুবে থাকা দেশে নাগরিক অধিকার আজ খর্ব। আমজনতা তাঁদের সংবিধান স্বীকৃত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। যে দেশে শুধুমাত্র ঘুষ দিয়ে কাজ করাতেই বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যায় সেদেশের জনতা সু-চিকিৎসার সুযোগ না পেলে এবং সচেতনতার অভাবে এসব ওঝা,গুণিন, জানগুরুদের খপ্পরে পরে সর্বসান্ত হয় এবং ডাইনি ঘোষিত বলে অত্যাচারিত,লাঞ্ছিত হয় প্রতিদিন, প্রতিমূহুর্তে। আসলে পুরুষশাসিত সমাজের মাথারা নারী কে কোনো দিনই ' মানুষ ' হিসেবে দেখেনি কিংবা ভাবেনি। সর্বদাই ভেবেছে ভোগের সামগ্রী অথবা সংসার সামলানোর যাবতীয় কাজ করার একটা যন্ত্র।

প্রায় দুশো খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ডাইনিতত্ত্ব বা ডাকিনিতত্ত্বের রমরমা শুরু হয় এবং দ্রুত ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রেসিন্যান্ড স্কট নামক একজন ব্যাক্তি প্রকাশ করেন ' The Discovery of Witchcraft ' নামের গ্রন্থ টি। উক্ত বইটির মূল আলোচনা ছিল মানসিক রোগীদের ডাইনি বলে ঘোষনা করে সমাজ মিথ্যেই তাঁদের ওপরে অত্যাচার করেছে। স্কট এর বইটি প্রায় সর্বত্রই ধিক্কৃত হয়েছিল সেসময়। এরও আগে ১৪৮৬ সালে খ্রিষ্টান ধর্মে পোপের নির্দেশে ' The Witche's Hammer ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মানসিক রোগীদের ডাইনি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই গ্রন্থেই বলা হয়েছিল ডাইনিরা সমাজের শত্রু, ওরা অশুভ শক্তি, তারা মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক জানে,সাধারণ মানুষ থেকে পশুপাখি দের ক্ষতি করে, নানান অসুখ তৈরী করে, রক্ত শুষে নেয়। তাই পোপের নির্দেশ ছিলো, ওদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ওঁদেরকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে শেষ করে দেওয়া হোক। 'The Witche's Hammer ' গ্রন্থটির সময় থেকে বহুযুগ ধরে প্রকাশ্যে মানসিক রোগিণী অর্থাৎ মহিলাদের উপর বারে বারে আঘাত এসেছে যা আজও ক্রমবর্ধমান। এখন হয়তো ডাইনি ঘোষিত কোনো মহিলাকে জীবন্ত জ্বলিয়ে দেওয়া হয়না, কিন্ত যা যা অত্যাচার হয় সেটা কোনো অংশেই কম নয়। রাঁচির মারাইটোলি গ্রামের ঘটনাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, যা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই সমস্যার শেকড় কতটা গভীরে।

National Crime Record Bureau র তথ্য অনুযায়ী, সাল ২০০০ থেকে ২০১৬ র মধ্যে ডাইনি ঘটনায় অত্যাচারিত ও খুন হয়েছেন ২৫০০ জন মহিলা। এতো গেলো সরকারি হিসেবে। কিন্তু বিভিন্ন মানবধিকার বা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনষ্ক সংগঠনের দাবী সংখ্যাটা কয়েকগুণ বেশি। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাইনি অপবাদে শুধু ইউরোপেই মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল ৮০ হাজার মহিলাকে। এই জঘন্যতম কান্ড শুধু ইউরোপ নয়, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড সহ অনেক দেশেই ছিল যথেষ্ট আকারে।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা যাক বিখ্যাত লেখিকা প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবীর। উনি দীর্ঘসময় ধরে আদিবাসী দের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের দাবীতে প্রচুর কাজ করেছেন, বিশেষ ভাবে ডাইনির ঘটনা নিয়ে। আরেকজন ব্যাক্তি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মহাশয়। উনিও ডাইনি নামক একুশ শতকের লজ্জাজনক কান্ড নিয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন। কিন্তু ওনার কিছু বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। যেমন শ্রী বাস্কের একটি লেখা ' আদিবাসী সমাজের সংস্কার ও কুসংস্কার ' এর এক যায়গায় উনি লিখেছেন- " এটাকে (ডাইনি) কুসংস্কার কিংবা অন্ধ বিশ্বাস যাই বলি না কেন, ভারতবর্ষের প্রায় সব আদিবাসী সমাজেই এই ক্ষতিকারক

বিদ্যার চর্চা দেখা যায়। যদিও সকলেই জানে এর প্রয়োগ অসামাজিক তবুও তারা এর মোহমুক্ত হতে পারেনি। আদিবাসী সমাজের কাছে এটা নিদারুণ অভিশাপ "।

অর্থাৎ, শ্রীবাস্কের ধারণায়, ডাইনির মত একটা ক্ষতিকারক বিদ্যার চর্চা চলছে। তাঁর মানে উনিও মনে করেন ডাইনি বা ডাইন বা ডায়েন বাস্তবে হয় এবং তাঁদের সত্যিই কোনো অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। গভীর দুঃখের সাথে জানাতে বাধ্য হচ্ছি ডাইনির প্রতি এমন অন্ধবিশ্বাস থাকলে, যতই মিটিং মিছিল আন্দোলন কিংবা লেখালিখি হোক না কেন সমস্যাটা মোটেই দূর করা সম্ভব নয়। ডাইনির প্রতি গভীর বিশ্বাসও রাখবো আবার এর বিরুদ্ধে কলম চালাবো এটা সোজাসাপটা স্ববিরোধীতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আরো দুঃখ পাই যখন ব্যাক্তিগত ভাবে পরিচিত কয়েকজন বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মীরাও মনে করেন এই পৃথিবীতে সত্যিই ডাইনির অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাঁরা নিজের ক্ষমতার বলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে একদা পত্রপত্রিকায় ঝড় তোলা স্বঘোষিত ডাইনি ইপ্সিতা রায়চৌধুরী' র কথা। ১৯৮৮ সালে উনি সাড়াজাগিয়ে এসেছিলেন। সেসময় পত্রপত্রিকায় ওনাকে নিয়ে গাদা গাদা নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছিল। কয়েকটি পত্রিকাতো ওনাকে ভালো ডাইনি আখ্যা দিয়ে প্রশংসায় ভরা লেখা পর্যন্ত লিখেছে। কিন্তু তারপরে যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মীদের দ্বারা ওনার বুজরুকি ফাঁস হয়। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৮ সাল নাগাদ বিভিন্ন পত্রিকায় উনার বুজরুকি ফাঁসের নানান মুখরোচক খবর প্রকাশিতও হয়।

কোনো ওঝা,জানগুরু,গুণিন, সৎসখা, দিখলি ইত্যাদিরা ডাইনি সন্দেহে কোনো মহিলার ওপরে অত্যাচার করলে বা ডাইনি বলে ঘোষণা করলে, তাঁদের জেলে ঢোকাবার জন্য আমাদের দেশে বেশ কয়েকটা ভালো ভালো আইন রয়েছে। কিন্তু আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা এই দেশে টাকা এবং রাজনীতিক পরিচিতি থাকার সুবাদে অপরাধীরা অনেক বে-আইনি কাজ করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরায় শুধুমাত্র জনগণের আইন বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে। সরকার চাইলেই আইন কে মলাটবন্দি অবস্থায় ফেলে না রেখে, জনগণ কে এই বিষয়ে সচেতন করতে পারে। আমজনতা এইসব আইনের ব্যাপারে সঠিক ভবে জানলে নিজেরাই এইসব প্রতারকদের জেলে ঢোকাতে পারেন অনায়াসেই।

" নারী সুরক্ষা ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিল-২০১১" নামক এই বিলের ৪ নং সেকশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কোনো মহিলাকে ডাইনি ঘোষণা করে গ্রামের অন্য সদস্যদের উস্কালে বা ডাইনি ঘোষিত মহিলার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে নির্যাতন ও শাস্তি দিলে অপরাধীদের সর্ব্বোচ্চ সাজা সাত বছরের জেল সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা জড়িমানা। এছাড়া ঝাড়খণ্ড সরকার পাশ করিয়েছে " ডাইনি প্রতিরোধ আইন- ২০১১", ছত্তিশগড় সরকার এনেছে " তোনাহি প্রতদ্ম নিভারণ আইন- ২০০৫ ", বিহার সরকার এনেছে " ডাইনি প্রতিরোধ আইন- ১৯৯৯"।

" অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি " র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নরেন্দ্র দাভোলকর, যাকে মৌলবাদী কট্টরপন্থীরা নৃশংশ ভাবে হত্যা করেছিল, তিনি ২০০৩ সাল থেকেই একটা আইন কে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। অবশেষে " The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act 2013 " লাগু হয়। তাছাড়া " The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954", এবং
" The Drugs and Cosmetics Act 1940 " এর মতন বেশ কিছু কঠোর আইনও এই দেশে রয়েছে।

সাংসদ প্রবর্তিত The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954, আইনটি ৩০ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং ১ মে ১৯৫৪ তে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি গেজেটের বিশেষ সংখ্যার দ্বিতীয় অংশের, প্রথম অধ্যায়ের ২৪ নং ক্রমে প্রকাশিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর বাদে ভারতের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য।

The Drugs Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 আইনের সংশোধন হয় ১৯৬৩ তে। এই আইনের ৯(এ) ধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে, এই আইন ভঙ্গকারীদের Cognizable Offence হিসেবে গন্য করা হবে। অর্থাৎ কেউ কেউ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের না করলেও পুলিশ কোনোও ভাবে এই অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে প্রাথমিক জানার ভিত্তিতে কোনো অভিযুক্তকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে (Notwithstanding anything contained in The Code of Criminal Procedure 1898 an Offence Punishable under this Act shall be Cognizable)..

" The Drugs And Cosmetics Act 1940 " Amendment GSR 884 (E)..বিভিন্ন সময়ে এই আইন সংশোধন হয়েছে। যেমন,১৯৫৫,১৯৫৭,১৯৬২,১৯৬৪,১৯৬৪ এবং শেষ এমেন্ডমেন্ট হয় ২০০৯ সালে। ১৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে ভারতের প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ জারি করেছে কেন্দ্রের ' স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর '। এই আইনে এবার থেকে শাস্তির পরিমান আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা।

কয়েকজন মুক্তমনা, যুক্তিবাদী মানুষ এই রাজ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে মহারাষ্ট্রের ধাঁচে একটা জোরালো বা কঠোর আইন প্রণয়ণের দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে সরব। ইতিমধ্যে উনারা আইনের খসড়া জমা দিয়েছেন State Law Commission এর দপ্তরে। এনারা যেই আইনটি আনতে চান তার নাম " The West Bengal Prevention of Superstition and Black Magic Practices Bill ২০১৬। " আপাতত এই আইনটি লাল ফিঁতের ফাঁসে আটকে রয়েছে সরকারের উদাসিনতার কারনে।

আইন আছে কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ নেই। গোদীলোভো কোনো রাজনৈতিক দলই চায়না আন্তরিক হতে, তাই তাঁরা ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই আমজনতার তথাকথিত ধর্মবিশ্বাস কে আঘাত করতে নারাজ। নইলে সরকার চাইলে কড়া হাতে এইসব অমানবিক ও জঘন্য কাজ অনায়াসেই বন্ধ করতে পারে ব্যাপক আকারে সচেতনতার প্রচার ও প্রাসারের মাধ্যমে সঙ্গে ওঝা,জানগুরু ইত্যদিদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ব্যাবস্থা করে। এর সাথেই প্রয়োজন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সু-চিকিৎসার কেন্দ্র গড়ে তোলা। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরে আজও বহু গ্রামগঞ্জে সু-চিকিৎসার কেন্দ্র নেই, নেই পর্যাপ্ত ওষুধ এবং ডাক্তার। তাই তো অজানা রোগ, জলবাহিত রোগ ইত্যাদিকে ডাইনির প্রকোপ আখ্যা দিয়ে স্বার্থলোভী ওঝা,গুণিন, জানগুরুদের প্রতারণা অবাধে চলছে।

ডাইনি বলে বাস্তবে কিছুই নেই ওসব গল্পের বই এবং সিনেমা সিরিয়ালেই সম্ভব। এইধারণা কে মনে গেঁথে নিলে এবং আন্তরিক হলে অবশ্যই বন্ধ করা যাবে এই ডাইনির ঘটনা গুলোকে। এর জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মীদের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে নাটকের মাধ্যমে, কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, প্রচার মাধ্যমে, ব্যাপকভাবে ডাইনির বিরুদ্ধে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নিতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। সঙ্গে প্রশাসনের উচিৎ নজর রাখা কোনো গ্রামে কাউকে ডাইনি ঘোষণা হওয়ার খবর পেলেই দ্রুত ব্যাবস্থা নেওয়া এবং যে বা যারাই কোনো মহিলাকে ডাইনি আখ্যা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে কড়া হাতে ব্যাবস্থা নেওয়া।

পর্ব-২।

গত ৫ জুলাই ২০২১ ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ এ ডাইনি সন্দেহে একজন মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদ এবং অপরাধীদের কড়া শাস্তির দাবী জানিয়ে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবীন পট্টনায়ক কে ইমেল করেছি। খবর পেয়েছি সরকার এখনও নাকি কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। এই সূত্র ধরেই
কথা হচ্ছিল ফ্রিথিংকার এবং সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট মিঃ দিবজ্যোতি সাঁইকিয়ার (Activist Dr Dibyajyoti Saikia) সাথে।
গত ১৪ আগষ্ট ২০১৫ সালে অসম বিধানসভায় পাশ হয়েছে ডাইনি হত্যা প্রতিরোধ আইন। " THE ASSAM WITCH HUNTING (PROHIBITION, PREVENTION AND PROTECTION) ACT 2015 " অসম বিধানসভায় আলোচনার পর বিলটি গৃহীত হয় এবং ২৯ জুন ২০১৮ সালে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। উক্ত আইনে কোনো মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দিলে অভিযুক্তকে ৩

থেকে ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার সুপারিশ করা হয়েছে। ডাইনি অপবাদে কাউকে অত্যাচার করা হলে ৫ থেকে ১০ বছর কারাদণ্ড ও এক থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং ডাইনি বলে অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে জনতা জড়িত থাকলে সকলের কাছ থেকে ৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের বিধান থাকছে। ডাইনি অপবাদে খুন করার অভিযোগে ৩০২ ধারায় বিচার হবে। ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করায় কেউ আত্মহত্যা করলে প্ররোচনার দায়ে ৭ বছর থেকে যাবজ্জীবন সাজা ও এক থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। তদন্তে গাফিলতি হলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ হবে ১০ হাজার টাকা। সরকারের দাবি, অসমের এই আইন বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্রের চেয়েও কড়া হবে। উল্লেখ্য, কিছু সময় আগে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির মাণ্ডরে ডাইনি অপবাদে পাঁচ মহিলাকে পিটিয়ে খুন করা হয়। অন্য রাজ্যগুলির প্রত্যন্ত গ্রামে মাঝেমধ্যেই ডাইনি অপবাদে অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে।
অসমে পাশ হওয়া আইনে ডাইনি অপবাদে অত্যাচার চালানো, একঘরে করা বা হত্যার ঘটনায় তিন বছর থেকে যাবজ্জীবন সাজার সুপারিশ থাকছে। সেই সঙ্গে উক্ত আইনে হাতুড়ে চিকিৎসকদের বেআইনি অনুশীলন ও সালিশি সভা বন্ধেরও কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে ডাইনি অপবাদে একঘরে হওয়া, জখম হওয়া, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মহিলা বা পুরুষকে ক্ষতিপূরণ এবং ডাইনি-শিকারের বলি হওয়া পরিবারের অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করা হবে।

এই আইনটি লাগু করার পেছনে দিবজ্যোতি সাঁইকিয়ার অবদান অনেক।
অসমে গত ৭ বছরে ডাইনি অপবাদে প্রায় ৭০ জনের বেশি খুন করা হয়েছে। এই ঘটনা বেশি ঘটেছে শোণিতপুর, লখিমপুর, মাজুলি, বড়ো ও সাঁওতাল অধ্যুষিত জেলাগুলিতে। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে দেখেছে, অনেক ঘটনার পিছনেই রয়েছে জমি বিবাদ বা ব্যক্তিগত শত্রুতা। রাজ্য পুলিশ ডাইনি হত্যা রোধে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছিল। পাশাপাশি বীরুবালা রাভা ও দিব্যজ্যোতি সাঁইকিয়া ডাইনি হত্যা রোধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু, তার পরও এই সব ঘটনা আটকানো যাচ্ছিল না।
দিব্যজ্যোতিবাবু জানান, প্রায় ছ’বছর ধরে তাঁরা ডাইনি হত্যা রোধে কড়া আইনের জন্য সুপারিশ করছিলেন। অসম সরকার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে খসড়া বিল তৈরি করে। মন্ত্রিসভা তাতে সম্মতি দেয়। তিনি বলেন, “ছ’বছরের চেষ্টায় বিল পাশ হওয়ায় আমরা খুশি। কিন্তু, ওঝাদের রমরমা বন্ধ করতে কোনও দল মুখ খুলল না। এটা খুবই মর্মান্তিক। অসম সরকারের হিসেবে, ২০১১ সালে ২৯ জন, ২০১২ সালে ১১ জন, ২০১৩ সালে ১৬ জন ও ২০১৪ সালে ডাইনি অপবাদে ৯ জনকে খুন করা হয়। ২০১৫ সালে বিধানসভায় এআইইউডিএফ বিধায়ক আবদুল রহিম খান, অপরাধীদের জরিমানার টাকা আরও বাড়ানোর প্রস্তাব দেন। অগপ বিধায়ক কেশব মহন্ত বলেন, “শাস্তি দিয়ে ডাইনি-হত্যার রাশ টানা যাবে না। স্কুলে স্কুলে অন্ধবিশ্বাস রোধে সচেতনতা শিবির ও এই বিষয়টি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।”

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, " নারী সুরক্ষা ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিল-২০১১" নামক এই বিলের ৪ নং সেকশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কোনো মহিলাকে ডাইনি ঘোষণা করে গ্রামের অন্য সদস্যদের উস্কালে বা ডাইনি ঘোষিত মহিলার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে নির্যাতন ও শাস্তি দিলে অপরাধীদের সর্ব্বোচ্চ সাজা সাত বছরের জেল সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা জড়িমানা। এছাড়া ঝাড়খণ্ড সরকার পাশ করিয়েছে " ডাইনি প্রতিরোধ আইন- ২০১১", ছত্তিশগড় সরকার এনেছে " তোনাহি প্রদম্ম নিভারণ আইন- ২০০৫ ", বিহার সরকার এনেছে " ডাইনি প্রতিরোধ আইন- ১৯৯৯"। " অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি " র প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্র দাভলকর এর বিশেষ উদ্যোগে " The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act 2013 " চালু হয়েছে। তাছাড়া " The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954", এবং
" The Drugs and Cosmetics Act 1940 ", এর মতন বেশ কিছু কঠোর আইনও এই দেশে রয়েছে।

ভারতে এতোগুলো আইন থাকা সত্ত্বেও ডাইনি বলে দেগে দিয়ে হত্যার ঘটনা প্রায়শই খবরের কাগজে স্থান পায়। অন্যান্য রাজ্যে আইন রয়েছে অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে না আছে ডাইনি সন্দেহে অত্যাচার কিংবা হত্যার কোনো তথ্য আর না কঠোর আইন প্রণয়নের কোনো উদ্যোগ।

কয়েকজন মুক্তমনা, বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা মহারাষ্ট্রের ধাঁচে এই রাজ্যে একটা কঠোর আইন প্রণয়ণের দাবীতে আইনের খসড়া জমা দিয়েছেন State Law Commission এর দপ্তরে। আইনটির নাম " The West Bengal Prevention of Superstition and Black Magic Practices Bill ২০১৬। " আপাতত এই আইনটি লাল ফিঁতের ফাঁসে আটকে রয়েছে সরকারের উদাসিনতার কারনে।

ডাইনি অপবাদে মাথা কেটে, পুড়িয়ে খুন, গ্রেফতার ১১

অসমের বিভিন্ন জনপদে এখনও রয়ে গিয়েছে ডাইনি সন্দেহে মানুষ খুন করার প্রবণতা। ২০০১ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে অসমে ডাইনি সন্দেহে খুন হয়েছেন ১৯৩ জন। এরমধ্যে ৭৯ জন পুরুষ এবং ১১৪ জন মহিলা।

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: অসমের কার্বি আংলঙে ডাইনি সন্দেহে মাথা কেটে, আগুনে পুড়িয়ে খুন করা হল দু'জনকে, তার মধ্যে একজন মহিলা। রমাবতী হালুয়া এবং বিজয় গৌরের 'কালা জাদু'র জন্য গ্রামের মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার দু'জনকে খুন করেন রোহিমপুর গ্রামের মানুষ। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়েই শুক্রবার ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার দেবজিৎ দেউরি। ধৃতদের মধ্যে দু'জন মহিলা, উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্র। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে কুসংস্কারের বশে এ হেন নৃশংসতা অবাক করছে পুলিশ, প্রশাসনকেও।

দেবজিৎ জানান, গত ২৯ সেপ্টেম্বর রশ্মি গৌর নামে গ্রামের এক কিশোরী অসুস্থ হয়ে মারা যায়। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, রশ্মি মৃত্যুর আগের দিন রমাবতী ও বিজয়ের নাম করে জানিয়েছিল, তাঁদের 'কালা জাদু'র জন্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। রশ্মির মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় গ্রামের আরও এক কিশোরী গ্রামপ্রধানের বাড়ি গিয়ে অসুস্থতার কথা জানায়। তারও দাবি, ওই দু'জনের কালা জাদুতেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে সে।

এর পরই গ্রামবাসীরা চড়াও হয়ে রমাবতী ও বিজয়কে পিটিয়ে মারে বলে অভিযোগ। কাছের পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে, রশ্মির কবরের খুব কাছে তাঁদের মাথা কেটে আগুন ধরিয়ে দেয় গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক এবং এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জিন্টু বোরা। সেখান থেকে পোড়া দেহাংশ ও মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। মামলা দায়ের করে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।

অসমের বিভিন্ন জনপদে এখনও ডাইনি সন্দেহে মানুষ খুন করার প্রবণতা রয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে অসমে ডাইনি সন্দেহে খুন হয়েছেন ১৯৩ জন। এরমধ্যে ৭৯ জন পুরুষ এবং ১১৪ জন মহিলা। গত আগস্ট মাসেও চিরাং জেলায় তিনজনকে ডাইনি সন্দেহে গ্রামবাসীরা পিটিয়ে খুন করার চেষ্টা করে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁরা প্রাণে বাঁচেন। ডাইনি অপবাদে নৃশংস হত্যাকাণ্ড রুখতে রাজ্য সরকার আইন সংশোধন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাও ঘোষণা করেছে। গ্রামবাসীদের সচেতন করতে নেওয়া হয়েছে 'প্রহরী' সামাজিক প্রকল্প। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। তারই ফের প্রমাণ মিলল ডোকমোকায়। উল্লেখ্য, বছর দুয়েক আগে এই ডোকমোকাতেই দুই অসমীয়া যুবককে গ্রামবাসীরা ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে খুন করে।

https://eisamay.com/nation/2-brutally-killed-by-villagers-in-assam-in-suspected-witch-hunting-case/amp_articleshow/78453560.cms

ডাইনি সন্দেহে হত্যার প্রতিবাদ ও কঠোর শাস্তির দাবিতে চিঠি

সম্প্রতি, ডাইনি সন্দেহে এক প্রবীণাকে হত্যা করা হয়েছে ওডিশায়। তাঁর ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। মৃতার নাম যমুনা হাঁসদা (৬২)। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আপাতত দুজনকে আটক করা হয়েছে। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক বন্ধু রথীন মন্ডল সহ অনেকেই ইমেল করেছিল মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক মহাশয় কে। ইমেলের বয়ান-

প্রতি,

নবীন পট্টনায়ক সমীপেষু,

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,

ওড়িশা সরকার।

বিষয় - ডাইনি সন্দেহে হত্যার প্রতিবাদ ও কঠোর শাস্তির দাবি।

মহাশয়,

গতকাল ' TheWire ' পত্রিকার মাধ্যমে পড়লাম, আপনার রাজ্যের ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় "জাদুবিদ্যা" অনুশীলনের অভিযোগ দিয়ে এক মহিলার শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি বলিভোল গ্রামের বাসিন্দা, ৬২ বছর বয়সী যমুনা হংসদা। সূত্র- https://thewire.in/rights/odisha-elderly-tribal-woman-accused-of-witchcraft-beheaded

একজন বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মী হয়ে এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

মহাশয়, এই একুশ শতকেও এমন নিন্দনীয় ঘটনা ভারতের বহু স্থানে প্রায়শই দেখা যায়। National Crime Record Bureau র তথ্য অনুযায়ী, সাল ২০০০ থেকে ২০১৬ র মধ্যে ডাইনি ঘটনায় অত্যাচারিত এবং খুন হয়েছেন ২৫০০ জন মহিলা। যদিও বে-সরকারি মতে সংখ্যাটা অনেক বেশি।

ডাইনি নামক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু কঠিন আইন রয়েছে আমাদের দেশে। যেমন:- " নারী সুরক্ষা ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিল -২০১১ " নামক এই বিলের ৪ নং সেকশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কোনো মহিলাকে ডাইনি ঘোষণা করে গ্রামের অন্য সদস্যদের উস্কালে বা ডাইনি ঘোষিত মহিলার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে নির্যাতন শাস্তি দিলে অপরাধীদের সর্বোচ্চ সাজা সাত বছরের জেল সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা জড়িমানা। এছাড়া ঝাড়খণ্ড সরকার পাশ করিয়েছে " ডাইনি প্রতিরোধ আইন -২০১১ ", ছত্তিশগড় সরকার এনেছে " তোনাহি প্রতদ্ম নিভারণ আইন- ২০০৫ ", বিহার সরকার এনেছে " ডাইনি প্রতিরোধ আইন- ১৯৯৯ "। এছাড়া, রয়েছে, " The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act 2013 "। তাছাড়া " The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 ", এবং " The Drugs and Cosmetics Act 1940 ", IPC 307, IPC 302 এর মতন বেশ কিছু কঠোর আইনও এই দেশে রয়েছে।

আধুনিক সমাজে এমন কুসস্কারাচ্ছন্ন কর্মকাণ্ড মোটেই কাম্য নয়। আমি একজন বিজ্ঞানমনস্ক ও সমাজকর্মী মানুষ হয়ে এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

আশাকরছি আপনি এমন ঘটনার বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া ব্যাবস্থা নেবেন এবং প্রকৃত অপরাধীদের কড়া শাস্তি দিয়ে দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করন।

ধন্যবাদ সহ,

রথীন মণ্ডল,

পশ্চিম বর্ধমান, বাংলা।

প্রসঙ্গ: এনআরসি, এনপিআর, সিএএ

(প্রথম পর্ব)

-সব্যসাচী মুখার্জি

ভূমিকা

এনআরসি, এনপিআর, সিএএ- এই শব্দগুলি সম্ভবত বর্তমান ভারতবর্ষে সবথেকে বেশিবার উচ্চারিত শব্দ। আসামে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি অর্থাৎ এনআরসি তালিকা থেকে ঊনিশ লক্ষেরও বেশি মানুষের নাম বাদ যাওয়ার পরে মানুষের মনে এনআরসি তথা নাগরিকত্ব হরণ নিয়ে প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে গত এগারোই ডিসেম্বর সংসদে পাশ হয়ে যায় সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-২০১৯. এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে গোটা দেশ। ছাত্র, যুব, মহিলাদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে বিরল। এই বিক্ষোভ আন্দোলনের মাঝেই কেন্দ্রীয় সরকার এনপিআর তৈরির ছাড়পত্র দেয়। ফলে শুরু হয় আরেকদফা বিতর্ক। বারবার অভিযোগ উঠতে থাকে যে এই এনপিআর-ই হলো এনআরসি-র প্রথম ধাপ। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন ভোটার কার্ডও নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ফলে মানুষেরই মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়তে থাকে। সঙ্গে ছড়াতে থাকে গুজব, ভুল তথ্য। সে কারণেই চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে সরকারি নথিপত্র সহ সঠিক তথ্য তুলে ধরতে। তারপর ভালো মন্দ বিচারের সিদ্ধান্ত আপনাদের।

পর্ব এক: এনপিআর এবং এনআরসি

এনপিআর, এনআরসি এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব সম্বন্ধে জানতে গেলে সময়রেখা ধরে একটু পিছনের দিকে যাওয়া দরকার। স্বাধীন ভারতের সংসদে ১৯৫৫ সালে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইন বলেই ভারতের মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় নাগরিকত্বের বিষয়ে সমস্ত তথ্য এই আইনে রয়েছে। এই আইন অনুযায়ী পাঁচভাবে ভারতের নাগরিক হওয়া যেতে পারে। বাই বার্থ অর্থাৎ জন্মগত ভাবে, বাই ডিসেন্ট অর্থাৎ বাবা মা ভারতবর্ষের নাগরিক হলে, বাই রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ আবেদনের ভিত্তিতে, বাই ন্যাচারালাইজেশন অর্থাৎ স্বাভাবীকরণের ভিত্তিতে এবং বাই ইনকোরপোরেশন অফ টেরিটরি অর্থাৎ কোনও এলাকা যেটা দেশের সীমানার মধ্যে আগে ছিলো না; পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে- সেই এলাকার প্রত্যেকে ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবে(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4210/1/Citizenship_Act_1955.pdf&ved=2ahUKEwivis37zJnoAhXAyDgGHbHRB9oQFjAYegQIBBAB&usg=AOvVaw0FzIFeLkTmCmbDkBnlGGVC&cshid=1584177656758)। স্বাধীন ভারতের আইন অনুযায়ী ভারতের মাটিতে জন্মানো সব শিশুরা ভারতের নাগরিকত্ব পেতো। যে কোনও আধুনিক, সভ্য রাষ্ট্রে সেটাই হওয়া উচিৎ। ১৯৫৫ সালের এই নাগরিকত্ব আইন বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে। ধীরে ধীরে বারবার সংশোধনী এনে নাগরিকত্ব পাওয়ার রাস্তাকে সংকুচিত করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে সংশোধনী এনে বলা হয় ভারতে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই অবধি। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় ২০০৩ সালে; যখন কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ির নেতৃত্বে এনডিএ-র সরকার(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://164.100.47.4/billstexts/rsbilltexts/AsIntroduced/XXXIX_2003.pdf&ved=2ahUKEwiUs4j20ZnoAhWHzjgGHbNjDR8QFjASegQIAxAB&usg=AOvVaw2B_mzG4kTdFndT0AfduIfh)। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে(চিত্র: ১, চিত্র: ৩৮)। একইসঙ্গে জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়েও বিস্তর পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী এই দেশে জন্মালেই একটি শিশু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নাগরিক হয়ে যেতো; শিশুর বাবা মায়ের নাগরিকত্বের সঙ্গে শিশুটির নাগরিকত্বের কোনও সম্পর্ক ছিলো না। এই সংশোধনীতে বলা হয়- ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের পর থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৩ লাগু হওয়ার তারিখ(অর্থাৎ ২০০৪ সালের ৩ ডিসেম্বর) পর্যন্ত জন্ম হলে প্রমাণ করতে হবে যে বাবা অথবা মায়ের মধ্যে কেউ একজন

ভারতীয় নাগরিক। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৩ লাগু হওয়ার পর জন্মালে প্রমাণ করতে হবে যে বাবা অথবা মায়ের কেউ একজন ভারতীয় নাগরিক এবং অন্যজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নন(চিত্র:২)। একইসঙ্গে এই সংশোধনী ১৯৫৫ সালের সিটিজেনশিপ অ্যাক্টে ১৪এ ধারা যুক্ত করে যা সরকারকে গোটা দেশে এনআরআইসি করবার ক্ষমতা দেয়(চিত্র: ৩)। ১৪এ ধারায় লেখা আছে কেন্দ্র সরকার ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্যতামূলক ভাবে পঞ্জিকরণ করতে পারে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করতে পারে। এই এনআরআইসি হলো ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ ইন্ডিয়ান সিটিজেনস। আসামে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এনআরসি অর্থাৎ ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস তৈরি হয়েছে। দেশব্যাপী নাগরিকপঞ্জি অর্থাৎ এনআরসি হলে তাকেই এনআরআইসি বলা হয়। দুটোর মধ্যে কোনও মূলগত তফাৎ নেই।

২০০৩ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সংসদে সর্বসম্মতিতে পাশ হয়। এই আইনে এনআরসি তৈরির বিষয়টিই কেবল আপত্তিজনক নয়; শিশুর নাগরিকত্বকে তার বাবা মায়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াও অত্যন্ত আপত্তিজনক। যারা অনাথ আশ্রমে বড়ো হয়েছে বা যে সমস্ত মানুষরা "সিঙ্গেল পেরেন্ট"; তাঁদের সন্তানদের নাগরিকত্ব ভয়াবহ বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে। সর্বোপরি ১৯৮৭ সালের পয়লা জুলাই থেকে ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত যারা জন্মেছিলো; তারা জন্মেই নাগরিক হয়ে গেছিলো। এই আইন পাশ করিয়ে পুনরায় তাদের নাগরিকত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলা হলো।

দেশের সংসদে যখন কোনও আইন তৈরি হয়; সেই আইন কীভাবে কার্যকর করা হবে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক একটি নিয়ম বা রুলস তৈরি করে। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পরেও এরকম একটি রুল তৈরি হয়; যার নাম- সিটিজেনশিপ (রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেনস অ্যান্ড ইস্যু অফ ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড) রুলস-২০০৩. এই রুলসেই এনআরআইসি এবং এনপিআর তৈরির বিষয়ে লেখা আছে
(তথ্যসূত্র: https://drive.google.com/file/d/1GRr0YEJ5Ouj03GKJR5ZOR4ie9XoojHTq/view?usp=drivesdk)। ৩১ জুলাই, ২০১৯ এ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এনপিআরের গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়। সেই নোটিফিকেশনে লেখা রয়েছে সিটিজেনশিপ (রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেনস অ্যান্ড ইস্যু অফ ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড) রুলস-২০০৩ এর রুল নম্বর ৩ এর সাব রুল ৪ অনুযায়ী সরকার এনপিআর করতে চাইছে(চিত্র: ৪)। কী লেখা আছে সিটিজেনশিপ (রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেনস অ্যান্ড ইস্যু অফ ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড) রুলস-২০০৩ এর রুল নম্বর ৩ এর সাব রুল ৪ এ? ৩ নম্বর রুল হলো "ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ ইন্ডিয়ান সিটিজেনস"; অর্থাৎ এনআরসি তৈরির রুল(চিত্র:৫)। সেই এনআরআইসি তৈরির রুলের ৪ নম্বর সাব রুলে লেখা রয়েছে- কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করে; তার মধ্যে লোকাল রেজিস্টারের জুরিসডিকশনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করে পপুলেশন রেজিস্টার তৈরি করতে পারে(চিত্র:৬)। ৫ নম্বর সাবরুলে লেখা আছে পপুলেশন রেজিস্টারের প্রত্যেক ব্যক্তির তথ্য যাচাই করে লোকাল রেজিস্টার অফ ইন্ডিয়ান সিটিজেনস তৈরি হবে(চিত্র:৭)।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; এনপিআরের গেজেট নোটিফিকেশনে বলা আছে যে আসামে এনপিআর হবে না। কেন? তার কারণ আসামে এনআরসি হয়ে গেছে। এনআরসি হয়ে গেলে আইনত আর এনপিআর করা যায় না।

সিটিজেনশিপ রুলস ২০০৩ এর ৪ নম্বর রুলের ৩ এবং ৪ নম্বর সাবরুলে লেখা আছে- পপুলেশন রেজিস্টারের প্রত্যেক ব্যক্তির তথ্য লোকাল রেজিস্টার দ্বারা যাচাই করা হবে এবং যাচাই প্রক্রিয়ায় সময়ে যাদের নাগরিকত্ব সন্দেহজনক মনে হবে; লোকাল রেজিস্টার সেই বিষয়টা পপুলেশন রেজিস্টারে উল্লেখ করবেন। সেই বিষয়ে তদন্ত হবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে সেটা জানানো হবে(চিত্র:৮)। এবারের এনপিআরে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আধার নম্বর এবং বাবা মায়ের তথ্য। বাবা, মা কবে কোথায় জন্মেছেন; সেটাও জানাতে হবে; যা অনেকেই জানেন না। ফলে তাঁরা উত্তর দিতে পারবেন না। মুশকিল হলো; সিটিজেনশিপ রুলস-২০০৩ এ কোথাও বলা নেই ঠিক কী কী তথ্য না দিলে সরকারি আধিকারিক কাউকে সন্দেহজনক নাগরিক ঘোষণা করতে পারেন। সবটাই সরকারি আধিকারিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। সর্বোপরি; আধার নম্বর বাধ্যতামূলক করা অন্য একটি বিষয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। আধার কার্ডের ওপর বড়ো করে লেখা আছে। এনপিআর হয় সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট-১৯৫৫ এবং সিটিজেনশিপ রুলস-২০০৩ অনুযায়ী। এনপিআরের কাজ সন্দেহজনক নাগরিক চিহ্নিত করা। তাহলে এনপিআরে আধার নম্বর বাধ্যতামূলক কেন? নাগরিকত্বের সঙ্গে বায়োমেট্রিক্সের সম্পর্কটা কী? এনপিআরের সঙ্গে বায়োমেট্রিক্স যোগের কথা সরকার সরকার সংসদেও স্বীকার করে নিয়েছিল। বলা হয়েছিলো কিছু রাজ্যে বায়োমেট্রিক্স সংগ্রহ করবে এনপিআর, কিছু রাজ্যে

আধার(তথ্যসূত্র:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2014-pdfs/rs-230714/229.pdf&ved=2ahUKEwiwhbLhkZzoAhVNzjgGHWTVCSoQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3qeUa_w6TWIQNSZ8rGL1xE)। এখন সবার আধার কার্ড করিয়ে সেটাকে এনপিআরে সংযুক্ত করার কারণটা কী? ঠিক কোন খিচুড়িটা পাকানো হচ্ছে? আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর, আধারের সঙ্গে প্যান, প্যানের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট; এখন ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার যোগ করতে চাইছে কেন্দ্র। আধারে বায়োমেট্রিক্সের মতো ব্যক্তিগত তথ্য থাকে। তাহলে কি এটা প্রত্যেকটা মানুষকে ২৪*৭ রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে আনার চেষ্টা? পরবর্তীতে তো বিষয়টা এমনও হতে পারে যে আধার ধরে এক একটা মানুষকে জাস্ট নেই করে দেওয়া হবে। বায়োমেট্রিক্সের তথ্য সহ এনপিআর; এই বিশাল তথ্যভান্ডার যে আদৌ সুরক্ষিত থাকবে তার কী গ্যারান্টি আছে? আধারের সঙ্গে নাগরিকত্বকে জুড়ে দেওয়ার পর যদি এই বিপুল তথ্যভান্ডারে একজনের বায়োমেট্রিক্স অন্যজনের বায়োমেট্রিক্সের সঙ্গে মিলেমিশে যায় তখন কী হবে? তখন তো বহু মানুষের নাগরিকত্ব প্রশ্নের মুখে পড়বে। আধারে যে কী ভয়াবহ ভুলত্রুটি এবং গোলমাল হয় আমরা সবাই সেটা দেখেছি। বড়সড় সর্বনাশ হলে দায়টা কে নেবে?

এনপিআর এবং জনগণনা হবে একই সময়ে, একজনই সরকারি আধিকারিক দুটোরই তথ্য নেবেন। ফলে জনগণনা এবং এনপিআর-কে এক বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। জনগণনার আইনি ভিত্তি সেন্সাস অ্যাক্ট-১৯৪৮(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://censusindia.gov.in/2011-Act%26Rules/notifications/Act%2520%26%2520Rules%2520corrected%252029-5-08_doc.pdf&ved=2ahUKEwix04fJ7pzoAhXUxzgGHf4gDikQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2sCgI8TQbbpFFtMavlcTtj) আর এনপিআরের আইনি ভিত্তি সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট-১৯৫৫ এবং সিটিজেনশিপ রুলস-২০০৩. এই দুটো বিষয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং, এই বিষয়ে অন্তত কোনও সন্দেহের অবকাশই থাকে না যে এনপিআর এনআরসি-র প্রথম ধাপ। সঙ্গে যোগ হয়েছে আধার। অনেকে বলবেন এনপিআর তো আগেও হয়েছে। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে আগেও এনপিআর হয়েছে। কিন্তু পূর্বের এনপিআরের সঙ্গে এ বারের এনপিআরের তফাৎ আছে। নতুন অনেক প্রশ্ন যুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি এনআরসি হলে তা ঠিক কতটা ভয়াবহ হতে পারে; সেটা আসাম আমাদের দেখিয়েছে। সেটা থেকে শিক্ষা নিয়েই এনআরসি-র প্রথম ধাপ এনপিআরের বিরোধিতা করা প্রয়োজন।২০১৮~১৯ সালের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্টেও কথা লেখা আছে এনপিআর এনআরআইসি-র প্রথম ধাপ(চিত্র: ৯)। ২০14 সালের ২৩ জুলাই রাজ্যসভাতেও সরকার জানিয়েছিলো যে তারা এনপিআরের তথ্য যাচাই করে এনআরআইসি করতে চায়(চিত্র: ১০)। সুতরাং এনআরসি আটকাতে গেলে এনপিআর আটকাতেই হবে।

আসামের এনআরসি-র একটা অন্য ইতিহাস রয়েছে। আসামে বিদেশীদের তাড়িয়ে দেওয়ার দাবীতে ১৯৭৯ সাল থেকে দীর্ঘকালীন আন্দোলন চলেছে। ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আসাম আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়(তথ্যসূত্র: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Assam_Accord)। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হোম সেক্রেটারি আর.ডি.প্রধান এবং চিফ সেক্রেটারি পি.পি.ত্রিবেদী। আন্দোলনকারীদের তরফে অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সভাপতি পি.কে.মোহন্ত, সাধারণ সম্পাদক পি.কে.ফুকন এবং অল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক বিরাজ শর্মা স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিই আসাম একর্ড নামে পরিচিত(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IN_850815_Assam%2520Accord.pdf&ved=2ahUKEwi5o5LM05noAhU6wzgGHf4qDg0QFjApegQICBAB&usg=AOvVaw2dQQvd-eiMoD13cMaOhXfD&cshid=1584178859564)। এই চুক্তির অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে প্রধান একটি বিষয় ছিলো বিদেশী চিহ্নিতকরণ এবং বিতাড়ন। অর্থাৎ বিদেশীদের চিহ্নিত করে আসাম থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। আসাম একর্ড স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে ১৯৮৫ সালে নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধন করা হয় এবং ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে ৬এ ধারা যুক্ত করা হয়; যা শুধুমাত্র আসামের জন্যই প্রযোজ্য(চিত্র: ১১)। যদিও আসাম একর্ডে এনআরসি তৈরির কথা বলা হয়নি।২০০৯ সালে "আসাম পাবলিক ওয়ার্কস" নামে একটি এনজিও সুপ্রিম কোর্টে এনআরসি আপডেট করার আবেদন জানায়।

২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট এনআরসি আপডেট করার নির্দেশ দেয়(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/amp/s/gulfnews.com/amp/world/asia/india/assam-nrc-timeline-through-the-years-1.66124831)। আসামে এনআরসি-র কাট অফ ডেট ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। অর্থাৎ; এনআরসিতে নাম তোলার জন্য আসামের প্রত্যেক মানুষকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তাঁরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে থেকে ভারতবর্ষে আছেন। এই কাট অফ ডেট ঠিক হয় আসাম একর্ড অনুযায়ী; যার ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে ৬এ ধারা যুক্ত হয়(চিত্র: ১২)। গোটা দেশের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাট অফ ডেট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ভারতের সংবিধানের ৬ নম্বর ধারায় লেখা আছে- যাঁরা ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই থেকে তার পরবর্তীতে যাঁরা ভারতে এসেছেন; তাঁদের প্রত্যেককে আবেদন করে নাগরিকত্ব নিতে হবে(চিত্র: ১৩)। সুতরাং; সংবিধান মেনে ধরে নেওয়া যায় যে গোটা দেশে এনআরসি হলে তার কাট অফ ডেট হবে ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই। কী কী লাগবে এনআরসিতে নাম তুলতে গেলে? আসামের এনআরসিতে নাম তোলার জন্য লিস্ট এ তে উল্লিখিত নিজের অথবা পূর্বপুরুষের ১৪ টি নথিকে গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। সেগুলি হলো-

১৯৫১ সালের এনআরসি, ২৪ মার্চ; ১৯৭১ পর্যন্ত ভোটার লিস্ট, জমির দলিল, সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, রিফিউজি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, এলআইসি, গভর্নমেন্টের ইস্যু করা লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট, গভর্নমেন্ট সার্ভিস/ এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্ক/ পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্ট, বার্থ সার্টিফিকেট, বোর্ড/ ইউনিভার্সিটির এডুকেশনাল সার্টিফিকেট, কোর্ট রেকর্ডস।

যদি লিস্ট এ অর্থাৎ উপরিউক্ত নথিগুলি পূর্বপুরুষের হয়; তাহলে লিস্ট বি তে উল্লিখিত নথিও জমা দিতে হবে। লিস্ট বি তে উল্লিখিত আটটি নথি হলো-

বার্থ সার্টিফিকেট, ল্যান্ড ডকুমেন্ট, বোর্ড/ ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্ক/এলআইসি, পোস্ট অফিস রেকর্ড, সার্কেল অফিসার বা জিপি সেক্রেটারির তরফ থেকে বিবাহিতা মহিলাদের দেওয়া সার্টিফিকেট, ভোটার লিস্ট, রেশন কার্ড অথবা আইনত গ্রাহ্য অন্য কোনও কাগজপত্র। (তথ্যসূত্র: http://www.nrcassam.nic.in/admin-documents.html)

মোদ্দা বিষয় হলো আসামের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে নথিপত্র দিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তিনি বা তাঁর পূর্বপুরুষরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে থেকে আসামের বসবাস করছেন। এই নথিপত্রের তালিকা বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে এনআরসি হলে প্রত্যেককে সম্ভাব্য সাংবিধানিক কাট অফ ডেট অর্থাৎ ১৯ জুলাই, ১৯৪৮ সালের আগে থেকে নিজের অথবা তার পূর্বপুরুষের ভারতবর্ষে বসবাসের প্রমাণ দিতে হবে।

এই পশ্চিমবঙ্গে বহু মানুষ স্বাধীনতার পর ওপার বাংলা থেকে এসেছেন। আসামের এনআরসি তালিকা দেখতে দেখা যাবে; এনআরসি ছুট ঊনিশ লক্ষ্য মানুষের মধ্যে চোদ্দ লক্ষ হিন্দু। সেটাই স্বাভাবিক; কারণ স্বাধীনতার পরে ওপার বাংলা থেকে মূলত হিন্দুরাই ভারতে এসেছেন। তাঁদের অনেকের কাছেই নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। বহু প্রান্তিক, গরীব মানুষের কাছে কাগজপত্র নেই। এই বাংলায় বন্যায় প্রতিবছর ঘরবাড়ি ভেসে যায়। কী করে মানুষজন কাগজপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করবেন নিজের নাগরিকত্ব? আসামের এনআরসি তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। মহিলাদের বিয়ের পরে পদবী পাল্টে যায়, ঠিকানা পাল্টে যায়। ফলে নথিপত্র জমা দিতে গিয়ে তাঁরাই বিপদে পড়েছেন বেশি(তথ্যসূত্র: https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/7/17924/Women-Worst-Victims-of-NRC-Gendered-and-Discriminatory-Nature-of-the-Register-Revealed)। এনআরসি হলে বিপদে পড়বেন বাবা মায়ের পরিচয়হীন ব্যক্তিরা, যৌনকর্মী এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা। কারণ এঁদের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ক থাকে না। আসামে এনআরসি তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ডাক্তার, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী সহ অনেকে। বাদ গিয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের পরিবারও(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/amp/s/www.indiatoday.in/amp/india/story/former-president-fakhruddin-ali-ahmed-family-again-left-out-of-nrc-list-1594188-2019-09-01)। সমস্ত নথি দেখিয়েও বাদ পড়েছেন অনেকে। ১৫ টি নথি দেখিয়েও এক মহিলা প্রমাণ করতে পারেননি যে তিনি ভারতের নাগরিক(তথ্যসূত্র: https://www.ndtv.com/india-news/declared-foreigner-assam-womans-story-predicts-citizenship-list-effect-2182212)। এনআরসি-তে যাঁরা বাদ পড়েছেন; তাঁদের ১২০ দিনের মধ্যে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে

যে তাঁরা ভারতের নাগরিক(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/over-19-lakh-excluded-from-assams-final-nrc/article29307099.ece/amp/)। ফরেনার্স ট্রাইবুনালে যেতে হাজার হাজার টাকাটা লাগে। সবথেকে বেশি বাদ পড়েছেন গরীব মানুষরা। কোর্ট কাছারি করতে করতে আজকে তাঁদের জীবন কার্যত নরকে পরিণত হয়েছে। কী করে প্রমাণ করবেন তাঁরা নিজেদের নাগরিকত্ব? মানুষের এই চূড়ান্ত কষ্ট এবং হয়রানির দায় কে নেবেন? নরেন্দ্র মোদী না অমিত শাহ? বারবার করে বিজেপির তরফে বলে যাওয়া হচ্ছে ভোটার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যামেরার সামনে বলেছেন যে ভোটার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়(তথ্যসূত্র: https://youtu.be/eNd792HSl_A)। অথচ ভারতের সংবিধানের ৩২৬ নম্বর ধারায় পরিষ্কার করে লেখা রয়েছে যে ভারতে কেউ ভোটার হতে গেলে তাকে আঠারো বছরের বেশি বয়স্ক হতে হবে এবং ভারতের নাগরিক হতে হবে(চিত্র: ১৪)। "দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপলস অ্যাক্ট-১৯৫০" এর ১৬(১) ধারায় বলা হয়েছে যে শুধু ভারতের নাগরিকদেরই ভোটার তালিকায় নাম থাকতে পারে(চিত্র: ১৫)। ২৩.০৪.২০১৫ তে সংসদের "Unstarred Question No- 4920" র উত্তরে এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী এফিডেভিট করে জানিয়েছেন যে ২০১৪ সালের ভোটার তালিকায় কোনও বিদেশীর নাম নেই (তথ্যসূত্র: সংসদীয় যৌথ কমিটির রিপোর্ট, পৃষ্ঠা-১১০,১১১; চিত্র ১৬, ১৭)। তাই যাঁরা ভোটার; তাঁরা অবশ্যই ভারতের নাগরিক। সংবিধান সেটাই বলে। আর ভোটার কার্ড যদি বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণ না হয়; তবে অবৈধ নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সরকারও অবৈধ বলে গণ্য হওয়া উচিৎ।

এনআরসি এবং তার প্রথম ধাপ এনপিআর করার কোনও বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তা নেই। যতই মানুষের কানে কানে অবৈধ অনুপ্রবেশের গল্প শোনানো হোক না কেন; জনগণনা থেকে প্রাপ্ত কোনও তথ্য অনুপ্রবেশ তত্ত্বকে সমর্থন করে না। যদি সত্যিই বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে হু হু করে অনুপ্রবেশ ঘটতো; তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি হতো। কিন্তু জনগণনার তথ্য বলছে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক কম; শুধু তাই নয় গুজরাটের মতো রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের থেকে অনেক বেশি(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/amp/s/eisamay.indiatimes.com/editorial/post-editorial/post-editorial-on-citizenship-amendment-act/amp_articleshow/73981400.cms)। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আরা ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ১৭.৬৪%. বিহারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৫.০৭%, ছত্তীসগড়ের ২২.৬০%, রাজস্থানের ২১.৪০%, উত্তরপ্রদেশের ২০.১০%, মধ্যপ্রদেশের ২০.৩০%। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ১৩.৯৩%, আসামে ১৬.৯০%. অর্থাৎ অনুপ্রবেশের তত্ত্ব শুধুই মাত্র হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির ফরওয়ার্ড করা মেসেজ এবং আইটি সেলের ফেসবুক পোস্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর যদি তর্কের খাতিরে এও ধরে নেওয়া হয় যে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ভারতে ঢুকে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে; জনগণনার তথ্য সেই বক্তব্যকেও সমর্থন করে না। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সবথেকে বেশি বাঙালি থাকে পাঁচটি রাজ্যে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক দিল্লী এবং উত্তরপ্রদেশ। এই চারটি রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বাঙালিদের অবদান যথাক্রমে ০.৩৯%, ০.৮৫%,০.৫৬%, ০.২৫% এবং ০.১৭%.(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/amp/s/eisamay.indiatimes.com/editorial/post-editorial/post-editorial-on-infiltration/amp_articleshow/74590772.cms) সর্বোপরি, এক দেশ থেকে অবৈধ ভাবে অন্য দেশে যাওয়া মানুষদের অধিকাংশই পরিযায়ী শ্রমিক। কাজের সন্ধানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যান। অর্থাৎ, অনুপ্রবেশের মূল কারণটা যে অর্থনৈতিক; এটা বুঝে নেওয়া দরকার। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কমেছে অনুপ্রবেশ।

সুতরাং, কোনও অঙ্কতেই বিপুল অনুপ্রবেশের তত্ত্ব মেলানো যায় না। এমনকি বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন কিছু এলাকায় বারবার মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ে প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। বিষয় হলো; যে সমস্ত জেলায় জনসংখ্যার হার বেশি; সেখানে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে জনসংখ্যার হার বেশি; যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম; সেখানে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে কম। (তথ্যসূত্র: https://www.google.com/amp/s/www.anandabazar.com/amp/editorial/%25E0%25A6%2585%25E0%25A6%25A8-%25E0%25A6%25AA-%25E0%25A6%25B0%25E0%25A6%25AC-%25E0%25A6%25B6-%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25A4-%25E0%25A6%25A4-%25E0%25A6%25AC-

%25E0%25A6%2586%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%25B2-%25E0%25A6%25A7-%25E0%25A6%25AA-%25E0%25A6%25AA-%25E0%25A6%25AC-%25E0%25A6%259C-1.205663)। যতটুকু অনুপ্রবেশ হচ্ছে; সেটা আটকানোর জন্য বিএসএফ রয়েছে, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে নিজের দেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য পাসপোর্ট অ্যাক্ট ১৯২০, ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬ এর মতো শক্ত আইন রয়েছে। সেই সব কিছু থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশের ধুয়ো তুলে এনআরসি করতে চাওয়া আসলে মানুষের মূল সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে তাকে নাগরিকত্বের প্রশ্নে ব্যস্ত করে তোলা। ফিসফিস করে আরেকটা প্রচার চলে- মুসলিমরা বেশি অপরাধপ্রবণ হয়। এই কথারও কোনও বাস্তবিক ভিত্তি নেই।

আরও একটি প্রচার চলে। দলে দলে মুসলিমরা ঢুকে সব চাকরি বাকরি খেয়ে নিচ্ছে। অনুপ্রবেশের তত্ত্ব যে কতটা ভুয়ো; সেটা আগেই প্রমাণিত। কিন্তু মুসলিমরা সত্যিই প্রচুর চাকরি পাচ্ছে? ২০০৫ সালে গঠিত হওয়া উচ্চপর্যায়ের সাচার কমিটির রিপোর্ট ঠিক তার উল্টো কথা বলেছিলো(তথ্যসূত্র: https://drive.google.com/file/d/1KlbF64TQ9EfR2uO0LdZbmie_QQ2YBLMp/view?usp=drivesdk)। ওই রিপোর্টে দেখা গিয়েছিলো ভারতে মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এসসি, এসটি-দের থেকেও খারাপ। সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে "রেগুলার ওয়ার্কার"দের মধ্যে জনসংখ্যার শতাংশের ভিত্তিতে মুসলিমদের যোগদান সবথেকে কম(চিত্র: ১৮)। "পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম তোষণ হয়"- এই কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। কী রকম তোষণ হয়? আসুন একটু জেনে নিই। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ২৭% মতো। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সরকারি এবং বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলিমদের যোগদান ২৭% এর আশেপাশে হওয়া উচিৎ। কিন্তু তথ্য কী বলছে? পশ্চিমবঙ্গে ৩৩১২৪৯ জন সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ১৮৯৯১ জন মুসলমান। অর্থাৎ সরকারি কর্মচারী মধ্যে মুসলিমদের যোগদান ৫.৭৩%. সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের যোগদান ছিলো ৪.৭%, গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান ২.১%(তথ্যসূত্র: https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/cities/kolkata/Bengal-records-more-Muslims-in-govt.-jobs/article16439342.ece/amp/)। ভয়াবহ তোষণ হচ্ছে না? হিন্দুরা বিপদে তো এই তোষণের জন্য। এইজন্যই তো এনআরসি দরকার।

অনেকে বলবেন সরকারি কর্মচারীরা অনেকসময় দুর্নীতিপরায়ণ হন। ফলে অনেক সময়েই তাঁরা ঘুষ নিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দিয়ে দেন। সত্যিই যদি তাই হয়; তবে তাঁদের কাছে প্রশ্ন- দেশজুড়ে এনআরসি প্রক্রিয়াটা কারা করবেন? সেই সমস্ত সরকারি কর্মচারীরাই করবেন। সরকারি কর্মচারীদের কথা যখন উঠলোই; তখন আসামের এনআরসি প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন হয়েছে সেটা বলা দরকার। ফরেনার্স ট্রাইবুনালের অ্যাডভোকেট; যাঁদের "মেম্বার" বলা হয়; তাঁদের কাজের মূল্যায়ন হয় তাঁরা কতো মানুষকে বিদেশী ঘোষণা করেছেন তার ওপর। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে "মেম্বার" যত বেশি মানুষকে বিদেশী ঘোষণা করতে পেরেছেন; সেই "মেম্বারে"র কাজ সরকারি নথিতে তত বেশি প্রশংসিত হয়েছে(চিত্র: ১৯, ২০)। অর্থাৎ; বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষকে রাষ্ট্রহীন করলেই কাজের জায়গায় তাঁদের সুনাম। আজ বাদে কাল কাজের জায়গায় সুনামের জন্য আমি বাঁ আপনি যে বাদ পড়ে যাবো না; এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবেন কি?

এবার আসা যাক এনআরসি-র অর্থনৈতিক প্রভাবের দিকে। আসামের মতো একটা মাঝারি মাপের রাজ্যে এনআরসি করতে খরচ হয়েছে ১৬০০ কোটি টাকা। গোটা ভারতে এনআরসি হলে মোটামুটি এর ৪০ গুণ খরচা হবে; অর্থাৎ আনুমানিক ৬৪০০০ কোটি টাকা খরচা হবে। জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ করে জনগণকে বিপদে ফেলার কারণ কী? নাগরিকত্বের অধিকার মূল অধিকার। কেউ নাগরিক হলে তবেই সে বাকি সাংবিধানিক অধিকার পাবে। গোটা দেশে যখন গণতন্ত্রের ওপর আঘাত নেমে আসছে; তখন খুব সচেতন ভাবে নাগরিক অধিকার হরণের লক্ষ্যেই এই এনআরসি, এনপিআরের অবতারণা। মানুষের সমস্ত অধিকার হরণ করে তাদের বিনা পয়সার মজুর বানানোর চক্রান্ত এই এনআরসি, এনপিআর। দেশের শ্রমিক, কৃষকদের ওপর যতই অত্যাচার হোক না কেন; শেষত তাঁরা নাগরিক। ফলে কোথাও গিয়ে রাষ্ট্রের একটা দায়বদ্ধতা থেকে যায়। সেই দায়বদ্ধতা থেকে হাত ধুয়ে ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নাগরিকত্ব বিহীন বিনা পয়সার মজুরে পরিণত করাই এনআরসি-র লক্ষ্য। একইসঙ্গে বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের মেরুকরণের রাজনীতির বিপুল সুবিধা হবে এই এনআরসিতে। একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি ছড়ানো ঘৃণার ওপরেই

দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের রাজনীতি। সেই কারণেই এনপিআর, এনআরসি-র মানুষ মারা পদক্ষেপ গ্রহণ। আর ঠিক এই কারণেই যে কোনও মূল্যে এনপিআর, এনআরসি-কে প্রতিহত করা দরকার।

ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্থানের নাগরিকরা কি স্বাধীন?

-অর্ক ব্যানার্জি

সম্প্রতি কিছু মানুষ দাবি করতে শুরু করেছে যে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলো, অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান পূর্ণ-স্বাধীন। এই বিষয়েই আজকের পোষ্টটি করা।

ভারতের স্বাধীনতা নামধারী ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এসেছিল Indian Independence Act-1947 নামক একটি অ্যাক্টের উপর ভিত্তি করে। এই অ্যাক্টের সাহায্যে ভারতকে দ্বি-খন্ডিতও করা হয়েছিল। ভারত দাবি করে যে তারা নিজেদের সংবিধান প্রণয়ের মাধ্যমে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস থেকে বেরিয়ে গিয়েছে এবং পাকিস্তান দাবি করে যে তারা নিজেদের সংবিধান প্রণয়ের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস থেকে বেরিয়ে গেছে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে বর্তমান বাংলাদেশ যেহেতু পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে প্রতক্ষ্য ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল, তাই বাংলাদেশও প্রকাশ্যে দাবি করে যে ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ তারা পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ের কারণে Indian Independence Act-1947 এর সব ধরনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে ব্রিটিশদের থেকে পূর্ণ-স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, আসলে ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান – কোনোটিই ব্রিটিশ শাসন থেকে পূর্ণ-স্বাধীন হতে পারেনি্ তা তারা যতই নিজেদের পূর্ণ-স্বাধীন বলে দাবি করুক না কেন।

এই দাবির স্বপক্ষে নিচে কিছু যুক্তি এবং প্রমাণ আমি পেশ করছিঃ

১) ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান – এই তিনটি দেশের সাংবিধানিক কাঠামো, আইনকানুন এবং শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান পুলিশ অ্যাক্ট-১৮৬০, ভারত শাসন আইন-১৯৩৫ এর অনুরূপ। এই তিনটি দেশের ৯৫% আইন ব্রিটিশদের শাসনামলে তৈরি করা, যা তৈরি করা হয়েছিল স্বদেশপ্রেমী ভারতীয় এবং বিপ্লবীদের দমন করতে। তিন দেশের সরকারই ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হওয়ার ৭৫ বছর পরও এই অ্যাক্টগুলোর আলোকে দেশ পরিচালনা করছে কেন? যে ব্রিটিশরা ৮ কোটি ভারতীয়কে হ*ত্যা এবং ৪৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার লু_ঠ করেছে অবিভক্ত ভারত থেকে, তাদের তৈরি করা আইনে কেন উপমহাদেশ চলছে বিগত ৭৫ বছর ধরে?

২) ১৯৬৫ সালে লন্ডনের একটি কোর্টে একটি মামলা হয়েছিল। সেই মামলার রায়ে লন্ডনের কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট লিখিতভাবে স্পষ্ট আদেশ জানিয়েছিলেন – "ভারত যুক্তরাজ্যের বাইরে অবস্থিত মহারানী সাম্রাজ্ঞীর ডোমেনিয়নগুলোর একটি অংশমাত্র"? এই আদেশের কথা অমৃতবাজার পত্রিকার ১৯৬৫ সালের ১৫ই আগস্টের সংস্করণের ১০ নং পাতার ৩-৪ নং কলামে উল্লেখ রয়েছে।

৩) ট্রান্সফার অফ পাওয়ার সংক্রান্ত ৯৫% ডকুমেন্ট ক্ল্যাসিফায়েড। ক্ষমতা হস্তান্তরের ৭৫ বছর পরেও ব্রিটেন কেন সেগুলো প্রকাশ না করে প্রকাশ না করার মেয়ার বাড়িয়ে যাচ্ছে? কেন ব্রিটেন বলছে যে এই নথিগুলো প্রকাশিত হলে ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সাথে ব্রিটেনের সম্পর্কের অবনতি হতে পারে?

৪) লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেনের সাথে নেহেরুর চালাচালি হওয়া চিঠিগুলোকে গোপন রাখতে ব্রিটিশ সরকার প্রতিবছর প্রায় ১০,০০০ ব্রিটিশ পাউন্ডের মতো খরচ করে চলেছে। এই চিঠিগুলোর ক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে সেই একই কথা – প্রকাশ্যে এলে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের অবনতি হবে। কেন?

এই চারটি প্রশ্নের উত্তর কী নিজেকে স্বাধীন দেশের নাগরিক বলে মনে করা কোনো ভারতীয়, কোনো বাংলাদেশী বা কোনো পাকিস্তানী নিজের স্বপক্ষে দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে যে এই তিনটি দেশ সত্যিই স্বাধীন? বা এই পৃথিবীর কেউ?

পশুবলি ও অ্যানিমেল প্রটেকশান ল

-অভিষেক দে।

"জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর " - এটা কী শুধুই একটা বাণী না পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলে শুধু পড়তে হয়? আমরা কালি পূজা,দূর্গা পূজা ও মনসা পূজা উপলক্ষে হাজার হাজার পাঠা, মোষ, হাস বলি দি প্রতি বছর। কুরবানীর ঈদে গরু,মোষ,দুম্বা,উট কুরবান দি নির্বিকার চিত্তে। শিশু বৃদ্ধ সবার চোখের সামনে ধারালো অস্ত্রের কোপে ধড় থেকে নিরিহ, অবলা প্রানীদের মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেটা নৃসংশতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ থেকে প্রানী হত্যা যা খুশি করা যায়।কেউ প্রতিবাদ তো করবেই না উলটে এই কাজ পূন্যের মনে করেন অনেকেই।আর কেউ যদি বাধা দেয় তাকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে উম্মত্ত একদল অমানুষ এর দ্বারা। যে দেশে মানুষই হৃদয়বিদারক অবস্থায় বসবাস করছে, সে দেশের প্রাণিদের দুর্দশার কথা চিন্তা করা কঠিন।

কিন্তু আমরা কিছু সময়ের জন্য আপনাদের এটাই বিবেচনা করার অনুরোধ করছি যে, উৎসর্গ হবার জন্য যে সমস্ত উট, ভেড়া, ছাগল,গরু রা অবলা প্রানী বলেই কি ইচ্ছা মত যা খুশি করা যায় তাদের সাথে??

ধর্মের ধ্বজাধারীরা প্রচার করে থাকেন, ধর্মীয় কারনে পশুবলি দিলে মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। তারা যুক্তি রূপে টেনে আনেন তন্ত্রের বা কুরবানির কথা। অথচ পুজোর বা কুরবানির নামে এই নৃশংস প্রথা কোনো ভাবেই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করেনা বরং দুর্বল এবং অবলা প্রানীদের যে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় এতে খুনী মানসিকতার জন্ম নেয়। বিশেষত শিশুমনে বলিপ্রথার কু প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ থেকে মানসিক রোগ, ভীতি, হিংস্রতা বৃদ্ধি, নিদ্রাহীনতা হতে পারে। সারা পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের এমনটাই অভিমত।

ধর্মীয় কারনে পশুবলির বিরুদ্ধে আমাদের দেশের আইন কি বলছে?

১) The prevention of cruelty to animals act, 1960 অনুসারে, প্রকাশ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ। কোন প্রত্যক্ষদর্শী ওই বলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানালে মন্দিরের পূরোহিত সমেত পুজো কমিটির কর্মকর্তা ও বলি দানে অংশগ্রহনকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

২) Wild life protection act অনুসারে যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী প্রানী হত্যা দন্ডণীয় অপরাধ। জেল এবং জরিমানা দুটোই হতে পারে।

৩) Public nuisance act অনুসারে কোনো ব্যক্তির চোখের সামনে বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।

৪) Arms Act অনুসারে লাইসেন্স ছাড়া বলি দেওয়ার অস্ত্র যেমন, খাঁড়া, চপার, কাটারি ইত্যাদি জিনিস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মজুদ রাখা বেআইনি এবং শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

৫) Cow Protection Act অনুসারে ধর্মের নামে পশুহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে। হাইকোর্টের নিষিদ্ধকরণের সাথে সুপ্রিম কোর্টও এই রায়ে অভিমত দেয়, বকরি ইদের সময় গরু কুরবানি দেওয়া মুসলিম ধর্মে প্রয়োজনীয় নয় এবং কুরবানি আইনত নিষিদ্ধ। এটিকে জনস্বার্থে নিষিদ্ধ করা উচিত। (মহম্মদ হানিফ কুরেশি বনাম বিহার সরকার, এ.আই.আর ১৯৮৫, এস.সি ৭৩১)

এছাড়াও পশু প্লেস নিবারণী আইন, দৃশ্য দূষণ আইন ইত্যাদি সবগুলি প্রযোয্য।

প্রসঙ্গত জানাই, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং ভারতের মানবতাবাদী সমিতি, বহুদিন ধরেই ধর্মের নামে প্রকাশ্যে এই পশুহত্যার বিরোধিতা করে আসছে। ২০০৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিকাশ শ্রীধর শিরপুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ যে শুধু রায় দিয়েছে, কালীঘাট মন্দিরে প্রকাশ্যে বলি দেওয়া যাবে না। প্রকাশ্যে বলি দেওয়া বেআইনি

ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্ধমানের জেলা শাসক সৌমিত্র মোহন মহাশয় সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পশুবলি বন্ধ করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায় সেটি বন্ধ করা গেছে। সম্প্রতি, ধর্মের নামে নির্বিচারে পশুবলি রুখতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির জনস্বার্থ মামলা আদালতে গৃহীত হয়েছে।

সূত্র- https://kolkata24x7.com/to-stop-thousands-of-animals-kill-in-the-name-of-sacrifice-in-several-mandir-in-purulia-pil-filed-calcutta-high-court.html

https://kolkata24x7.com/to-stop-thousands-of-animals-kill-in-the-name-of-sacrifice-in-several-mandir-in-purulia-pil-filed-calcutta-high-court.html

ভাবলে অবাক হতে হয়, পশুবলির বিরুদ্ধে এতগুলি জোরালো আইন থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত আমাদের দেশে দুর্গা, কালি, মনসাপুজো, ইদের কুরবানীর সময় কত কত পাঁঠা, ভেড়া, গরু, উঁট নির্বিচারে বলি দেওয়া হচ্ছে। আর দেশের নির্লজ্জ সরকার এবং প্রশাসন ধর্মের দোহায় দিয়ে এইসব বে-আইনী প্রথাকে পশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে ভারতীয় আইন ব্যবস্থাকে কদর্য রূপে প্রকাশ করছে। বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গা বাদে (যেমন হিমাচল প্রদেশ, ঝারখণ্ড ইত্যাদি) সব জায়গাতেই প্রশাসন সূত্রে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়না।

কবিগুরুও তো বলিপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। 'বিসর্জন' ও 'রাজর্ষি' নামক দুটি উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে একশো বছর আগে 'বলি'র বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধুমাত্র ২৫ বৈশাখ আর ২২ শ্রাবনে গদগদ ভঙ্গিতে কবিতা পাঠেই তাঁকে সম্মান জানানোতে শেষ হয়ে যায়? তাঁর চিন্তা ধারাকে সম্মান জানাতে আমরা এটুকু করতে পারিনা? আমরা কী মানবিক হতে পারি না? যাই হোক একটা কবিগানের কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে, একজন ফকিরী সাধক বলছিলেন-

''কুরবানি করিতে হুকুম প্রাণপ্রিয় ধন,
গরু-ছাগল হইল কি তোর এতোই প্রিয়জন?
নিজের থেইক্যা প্রিয় বস্তু আর যে কিছু নাই,
আত্মত্যাগই আসল কুরবান জেনে নিও ভাই।
দশ ইন্দ্রিয়, ছয়টি রিপু পারলে দমন কর গো,
প্রেম রাখিও অন্তরের ভিতর.....''

সংযোজন: "কুরবানির ঈদ"। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে এই দিনটির গুরুত্বই আলাদা। তারা তাঁদের আল্লাহতালার উদ্দেশ্যে কুরবানি দেয় অবলা প্রানী দের। উঠ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি কুরবানির তালিকায়। যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষই ধর্মের নামে প্রানী হত্যার বিপক্ষে। অনেকেই উদ্ভট দাবী করে খাদ্যর সাথে পশুবলি কে এক করে দেন। আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে, খাদ্যর প্রয়োজনে একটা দুটো প্রানী কে হত্য করা এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে নির্বিচারে অবলা প্রানী দের হত্যা এক বিষয় নয়। ব্যাপার টা এভাবে ভাবুন যে, স্নানের জন্য বাথরুমে উলঙ্গ হওয়া এবং প্রকাশ্যে উলঙ্গ হয়ে স্নান করার ভেতর যথেষ্ট পার্থক্য আছে।
সরকার চাইলেই ধর্মের নামে প্রানী হত্যা কে বন্ধ করতেই পারে কঠোর ভাবে। কিন্তু মাজা ভাঙ্গা খাঁজা সরকার এই উদ্যোগ নিতে চায়না অসংখ্য কুযুক্তি দেখিয়ে। আসলে ভোট ব্যাঙ্ক বড় বালাই। তাই ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে সরকার আন্তরিক হয়না এই জঘন্য প্রথা কে বন্ধ করতে।
প্রানীরা অবলা তাই ধর্মের নামে যা খুশী তাই করা যায় তাদের সাথে। আর প্রতিবাদ করার মতন বুকেরপাটা ক'জনের থাকে মশাই।

নীরিশ্বরবাদ দর্শন " চার্বাক" এ একটা অসম্ভব সত্যি কথা বলা হয়েছে যে- ভণ্ডরা চায় খেতে পশুর, মাংস তাই তারা দিয়েছে বলির বিধান।

দেশের আইন কি মাকড়সা জলের মতো??

-জামাল আনসারী

বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয় মাকড়সা জাল দেখেছো। কি সুন্দর বুনন! তাই না। কিন্তু এই জাল হল ছোট ছোট পোকা- মাকড় ধরার ফাঁদ। জালের সংস্পর্শে কোনো ছোট পোকা এলেই সেই জালে জড়িয়ে পড়ে। আর যদি একবার জালে আটকে যায়, তাহলে পোকার চৌদ্দ গুষ্টির সাধ্য নেই, সেই অতিসূক্ষ জালের তীব্র আকর্ষণ ছিন্ন করে,পালিয়ে বাঁচে। তবে মজার ব্যাপার হলো এই যে, মাকড়সা জালে কখনও কোনো হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, আটকে পড়ে না। কারন তাঁরা তাদের পেশী শক্তি দ্বারা অতি সহজেই জালের বন্ধন ছিন্ন করে,অবাধে,নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে।

দেশের আইন হচ্ছে অনেকটা মাকড়সার জালের মতো।ছোট্ট কিছু পড়লে আটকে যায়, কিন্তু বড়ো কিছু জালে পড়লে জাল ছিঁড়ে ঠিকই বেরিয়ে আসে।তাই দেশের আইন দিয়ে খেটে খাওয়া, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত,গরীব মানুষ গুলোকে বিনা বিচারে, বিচারের নামে প্রহসনে দিনের পর দিন কারাগারে আটকে রাখা যায়।কিন্তু ললিত মোদি, নীরব মোদি,বিজয় মালিয়ার মতো মহান দেশপ্রেমিক(!) মানুষরা সেই আইনের জাল ছিঁড়ে অনায়াসে বেরিয়ে বিদেশে চলে যেতে পারে। দেশের আইন, আদালত, বিচার ব্যবস্থা,CBI সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করেও পালিয়ে যাওয়া ধনকুবের, শিল্পপতিদের টিকি পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেন না। কেন??একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই সহজেই বুঝতে পারবে, নেতা, মন্ত্রীরা হাজার অন্যায়- অত্যাচার, দুর্নীতি, খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি করলেও পেশী শক্তি দ্বারা ওই আইন নামক মাকড়সা জাল ছিঁড়ে ঠিকই বেরিয়ে যায়।

এক বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা নির্বাচনের আগে একশো ত্রিশ কোটি মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সরকার গঠন করলে, বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা দেশে নিয়ে এসে দেশের কোটি মানুষের উন্নয়ন করবে। কিন্তু দেশের অর্থনীতি যে ক্রমশ রসাতলে যেতে বসেছে, তবুও বিদেশের একটিও কালো টাকা কি দেশে এসে পৌঁচেছে। না পৌঁছে নি। আর কোনোদিনই ঐ কালো টাকা দেশে আনার কোনো ব্যবস্থায় নেওয়া হবে না। কারন সেই কালো টাকার মালিক তো আর গরিব নয়। সব ধনকুবের, শিল্পপতি, নেতা, মন্ত্রীদের টাকা। সে হোক না কালো টাকা। তাতে কি! ঐ যে আগেই বলেছি।দেশের আইন নামক মাকড়সা জালে তারা কোনোদিনই আটকে পড়ে না। তারা আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

দেশের আইন তাদের জন্য নয়। দেশের আইন গরিব মানুষের জন্য...গরিব মানুষদের মারার জন্য...
মিলিয়ে দেখবে কোনো গরিব চাষি ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া মাত্র হাজার দশের টাকা ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্য জেল খাটতে বাধ্য হয়।কিন্তু ললিত মোদি, নীরব মোদি, বিজয় মালিয়া... এদের কত হাজার কোটি টাকা ভারতীয় ব্যাঙ্কে ঋণ আছে!! এখনও সেই টাকা কেউ পরিশোধ করে নি।তবুও তাদের জেল হয় না। কেন??
যারা হাজার কোটি টাকা চুরি করে আছে তাদের জেল হয় না, কিন্তু কোনো মানুষ না খেতে পেয়ে দোকানে সামান্য রুটি চুরি করার অপধধে জেল হয়।
আবার সবাই বলে দেশের আইন নাকি সবার জন্য সমান ! কোন মানদণ্ডে দেশের আইন সবার জন্য সমান তা আজও আমার মাথায় ঢোকে নি।
(বিঃ দ্র: আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর আমার পূর্ন আস্থা আছে)

মেনে নিলাম

- মধুসূদন মাহাতো

মিঁত্রো - - -
এক দেশ এক আইন মেনে নিলাম।

তর্কের খাতিরে—
এক দেশ এক ভাষা (হিন্দি) মেনে নিলাম!
এক দেশ এক ধর্ম (হিন্দু) মেনে নিলাম!
এক দেশ এক পোশাক(গেরুয়া) মেনে নিলাম!
এক দেশ এক খাদ্যও (নিরামিষ) মেনে নিলাম!
এক দেশ এক নাম হিন্দুস্তান (ভারত,ঈন্ডিয়া বাদ) মেনে নিলাম!
যেহেতু কাশ্মীরে এক দেশ এক আইন বলবৎ হচ্ছে, অতএব মহারাষ্ট্র, গুজরাট, আসাম, মনিপুর, অন্ধ্র, সিকিম, অরুণাচল, মিজোরাম থেকেও ৩৭১ ধারার উচ্ছেদ মেনে নিলাম!

এসটি/এসসি'দের সংরক্ষণ তুলে দেওয়া মেনে নিলাম!
ওদের জমি যে কেউ কিনতে পারে, মেনে নিলাম!
এই সবগুলি মেনে নেওয়ার পর ভারতের ৮০কোটি গরীবের কি কল্যাণ হবে?

আপনাকে বলতে হবে—
এক দেশ এক আইন, অথচ দেশটায় ধনী গরিব থাকবে কেন?
এক দেশ এক আইন, অথচ দেশের ৫১% সম্পদের মালিক কেন আম্বানি আদানীরা হবে?
এক দেশ এক আইন, অথচ ১শতাংশ ধনীর প্রতিদিনের আয় কেন ২২০০কোটি টাকা হবে?

মিঁত্রো—
দেশের আইন সবার জন্য সমান করতে পারছেন। ভালো কথা।

পারবেন- - আপনার ঐ আইনে দেশের সব জমি গুলি দেশের সব মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিতে?

পারবেন- - আপনার ঐ আইনে দেশের সব সম্পদগুলি দেশের সব মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিতে?

হাঃ হাঃ মিঁত্রো!
আইন সকলের জন্য সমান করলেই হবে না, সম্পদ সকলের জন্য সমান করতে হবে। আর যেটা আপনি পারবেন না। কারণ আপনার টিকিটা তো বাঁধা আছে ঐ পুঁজিপতিদের কাছেই!

পুরুলিয়া,
০৫/০৮/২০১৯

বিশেষ বিবাহ আইন (Special Marriage Act- 1954)

-ঈশান

ফি রোববার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমরা প্রায়শই দেখে থাকি পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে তাদের ধর্ম,জাত ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। কিন্তু যারা কোনোরকম প্রতিষ্ঠানিক ধর্মে (Religion) বিশ্বাসী নন অর্থাৎ আমরা যাদেরকে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক বলে অবহিত করে থাকি, তারা বিশেষ বিবাহ আইনের মাধ্যমে বিয়ে করতে পারেন। ১৮৭২ সালের এই আইন নতুনভাবে ৯ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে ভারতীয় সাংসদে পাশ হয় এবং ১ জানুয়ারী ১৯৫৫ সালে সমগ্র ভারতে লাগু হয়। [The Special Marriage act was passed in 9th October 1954. It was passed with an intention to regulate marriage between two individuals (of the opposite sex) irrespective of their caste or religion. It applies to the whole of India except for the states of Jammu and Kashmir.]

১৮ মে, ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন (Hindu Marriage Act - 1955) অনুসারে পাত্র-পাত্রী উভয়কেই হিন্দু হতে হয় নতুবা সেই বিয়ে অবৈধ ঘোষনা করা হয়। প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো, ভারতীয় সংসদের আইন দ্বারা গঠিত এই আইনে হিন্দু কোড বিলের (Hindu Code Bill - 1950) অংশ হিসাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়েছিল। যেমন- হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (hindu inheritance act- 1956), হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন (The Hindu Minority and Guardianship Act of 1956), হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ আইন (The Hindu Adoptions and Maintenance Act - 1956)।

অন্যদিকে, মুসলিম বিবাহ আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম পাত্র কোনোও অমুসলিম পাত্রীকে বিয়ে বা নিকাহ করতে পারেন না (ব্যতিক্রম, সুন্নি মুসলমান পুরুষ একজন খ্রিস্টান বা ইহুদি নারীকে বিয়ে করতে পারেন) আবার বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে এই আইন অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। বিবাহ সম্পন্নের ৩০ দিনের মধ্যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করার পরও যদি কেউ এই আইন অমান্য করে তবে সেই ক্ষেত্রে দুই বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ৩০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড দিতে হতে পারে। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অন্য ধর্মের কোনো ব্যক্তিকে মুসলিম আইন অনুযায়ীই বিয়ে করতে পারেন।

বিয়ে যেহেতু দুটি হৃদয়ের বন্ধন তাই, বিশেষ বিবাহ আইনে পাত্র-পাত্রী ভিন ধর্মের বা অধার্মিক হলেও কোনো সমস্যা নেই। বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে করতে হলে পাত্র-পাত্রীকে অবিবাহিত থাকতে হবে। বিয়ের সময় বিয়ের উভয় পক্ষগণের মধ্যে কারোরই কোনো জীবিত স্বামী বা স্ত্রী থাকা চলবে না। পাত্রের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর এবং পাত্রীকে ১৮ বছর হতে হবে (গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ এ, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে বেড়ে ২১ করার জন্য একটি বিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পাশ হয়েছে। এর অর্থ ২১ বছরের নীচে মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে)।

এই বিয়েতে প্রথমত পাত্রপাত্রী উভয়কেই (কোনো শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষকে) বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করে আদালত অথবা ম্যারেজ রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে, ম্যারেজ রেজেস্ট্রি অফিসারের কাছে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পুরন করতে হবে এক মাসের নোটিশ দিয়েই। নোটিশের একমাস কাল উত্তির্ণ হওয়ার পর পাত্রপাত্রী উভয়কেই আদালত অথবা ম্যারেজ রেজিস্টার অফিসে সরাসরি হাজির হয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসারের কাছে শপথগ্রহণ করে নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে সাক্ষর করতে হবে। বিশেষ বিয়েতে নোটিশ প্রসঙ্গে একটি খবর জানিয়ে রাখা ভালো-

বিশেষ বিবাহ আইনে নোটিশ প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের

বিশেষ বিবাহ আইন নিয়ে বড়সড় রায় ঘোষণা করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বুধবার রায় দিয়েছে যে বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে বিবাহের নোটিশ প্রকাশের প্রয়োজন বাধ্যতামূলক হবে না, বরং তা দম্পতির পছন্দ সাপেক্ষে হবে।

এই রায় দেওয়া হয় একজন হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনের ভিত্তিতে। আবেদনে বলা হয়েছে যে অন্য ধর্মের প্রেমিককে বিয়ে করার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে আটক করা হয়। ওই যুগল হাইকোর্টকে জানিয়েছেন যে ৩০ দিনের এই বাধ্যতামূলক নোটিশ তাঁদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ ও বিবাহ সম্পর্কিত স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেয়। হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক চৌধুরি জানিয়েছেন যে এই ধরনের নোটিশ প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার ফলে তা স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে। একজন ব্যক্তি তাঁর গোটা জীবন কার সঙ্গে কাটাতে চান এটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা। এছাড়াও আদালত জানিয়েছে যে বিয়ে করতে ইচ্ছুক যুগল বিবাহ আধিকারিককে ৩০ দিনের নোটিশ প্রকাশ করতে বা না করার অনুরোধ লিখিতভাবে জানাতে পারেন।

হাইকোর্ট এও জানিয়েছে যে যদি কোনও যুগল নোটিশ প্রকাশ করতে না চান তবে বিবাহ আধিকারিক নোটিশ প্রকাশ করবেন না এবং অন্য কারোর হস্তক্ষেপও তিনি বরদাস্ত করবেন না। তার বদলে বিয়ের অন্যান্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে এগিয়ে যাবেন।

উত্তরপ্রদেশে লাভ জিহাদ বিরোধী আইন চালু হওয়ার পর থেকে বেশি করে এ ধরনের মামলা আদালতে আসছে। ২৮ নভেম্বর রাজ্যে লাভ জিহাদ বিরোধী আইন চালু হওয়ার পর থেকে ১৬টি মামলা পুলিশ দায়ের করেছে।
খবরটির লিংক- https://bengali.oneindia.com/news/india/the-notice-were-not-mandatory-under-the-special-marriage-act-said-allahabad-highcourt-121410.html

বিশেষ বিবাহ আইনে সাক্ষী হিসেবে তিনজন (যাদের একজন অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে) উপস্থিত থাকতে হবে এবং পাত্রপাত্রীর মতন তাদেরও পাসপোর্ট সাইজ ছবি, বয়সের এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র যেমন- আধার / ভোটার আইডি / প্যান ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে যা প্রয়োজন পরবে বিয়ের সময়ে।

ভারত কিংবা বাংলাদেশের কোনো হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, পারসি, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ইত্যাদি নন বা তাদের একজন যেকোনো একটি বা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হলে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীন উপযুক্ত বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্ম ত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। দুই পক্ষই ধর্ম ত্যাগ না করলে বিয়েটি বাতিল বলে গণ্য হবে।
এই আইনের বিধানে যেকোনো ধরনের মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবেদনকারী যদি বাস্তবে ধর্ম ত্যাগ না করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে ধরা হবে যে, তিনি মিথ্যা বর্ণনা দিয়েছেন।

যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তকরা জন্মসূত্রে পাওয়া প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম (Religion) ত্যাগ করে মানবতাবাদী (Humanist / Humanism) ঘোষণা পত্র পেতে নোটারি পাবলিক কর্তৃক 'নোটরাইজড' করানো এফিডেফিট সংগ্রহে রাখুন বিশেষ বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ডক্যুমেন্ট যা ম্যারেজ রেজেস্ট্রি অফিসে প্রয়োজন হবেই।

লক্ষ্যনীয় বিষয় এটাই যে, বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে এবং নবদম্পতির সন্তান বেড়ে উঠছে একটি অন্যরকম পরিবেশে যেখানে কোনোরকম ধর্মাচরণ বা ধর্মপালন হয়না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয় বহনও করছে না। এই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আবার কেউ কেউ একটি ধর্ম বেছে নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের জন্য কোনো আইন নেই।

'বিয়ের জন্য ধর্ম পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়, বলল ইলাহাবাদ হাইকোর্ট'

কেবলমাত্র বিয়ের জন্য ধর্ম পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। একটি মামলার প্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে শনিবার এ কথা জানাল ইলাহাবাদ হাইকোর্ট। বিয়ের তিন মাস পর পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক দম্পতি। আদালত সেই আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে।

জন্মসূত্রে এক মুসলিম মহিলা বিয়ের জন্য হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। আবেদনে ওই দম্পতি জানিয়েছেন যে তাঁরা চলতি বছরের জুলাই মাসেই বিয়ে করেন। এও অভিযোগ করেন, বিয়ের পরেও পাত্রীর বাবা তাঁদের জীবনে হস্তক্ষেপ করছেন। তার প্রেক্ষিতেই বিচারপতি মহেশ চন্দ্র ত্রিপাঠী এ দিন বলেন, “ওই মহিলা ২০২০ সালের ২৯ জুন নিজের ধর্ম পরিবর্তন করেন এবং ৩১ জুলাই বিয়ে করেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বিয়ের উদ্দেশ্যেই এই ধর্ম পরিবর্তন”।

বিচারপতি এও জানিয়েছেন, আদালত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি নয়। এর আগে ২০১৪ সালে নূর জাহান বেগমের একটি আবেদনের ভিত্তিতেও একই রায় দিয়েছিল ইলাহাবাদ হাইকোর্ট। এ দিন ওই রায়ের কথাও উল্লেখ করেছে আদালত।

খবরটির লিংক- https://www.anandabazar.com/india/conversion-for-the-sake-of-marriage-is-not-acceptable-said-allahabad-high-court-dgtl-1.1222498

বিশেষ বিবাহ আইনের কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য-

১) আবেদনকারী পাত্রপাত্রীকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসারের কাছে জমা দেওয়া যাবতীয় তথ্য (যেমন- বয়সের প্রমাণপত্র, নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র, প্রতিষ্ঠানিক ধর্মহীনতার প্রমাণপত্র, ঠিকানার প্রমাণপত্র ইত্যাদি) সঠিক দিতে হবে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসারের সেইসব কাগজপত্র দেখে যদি সন্দেহজনক মনে হয় কিংবা অফিসার যদি তথ্যবিকৃতি পান তাহলে তিনি বিবাহ বাতিল করে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

২) বিশেষ বিবাহ আইনে পাত্রপাত্রীর মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে (যেমন মামাতো, কাকাতো ভাই বোন, দাদা বোন, ভাই দাদা কিংবা কাকা ভাইঝি, অথবা বিবাহবিচ্ছেদ না করে গোপনে কোনো পুরুষের সাথে নারীর বিয়ে) তাহলে এই বিয়ে অবৈধ ঘোষনা করা হয়।

৩) পাত্র কিংবা পাত্রীর মধ্যে কোনো একজন মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী অথবা ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক বিয়েও এই আইনে অবৈধ।

৪) কোনোরকম সমস্যাজনিত কারনে বিবাহবিচ্ছেদের প্রয়োজনে নূন্যতম বিয়ের তিন বছরের আগে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করা যাবেনা। এবং বিবাহবিচ্ছেদের একবছর পূর্ণ না হলে নতুন বিয়ে গ্রাহ্য হবে না।

৫) বিশেষ বিবাহ আইন- ১৯৫৪ এবং হিন্দু বিবাহ আইন- ১৯৫৫ অনুযায়ী স্ত্রী বর্তমানে থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ না হলে পাত্র তার প্রাক্তন স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে বর্তমানে বিবাহ করলেও এই বিয়ে আইনত অবৈধ। আইনের ফাঁক গলে যদি এই বিয়ে হয়েও যায় তাহলে বর্তমান স্ত্রী, বর্তমান ই থাকবেন। পত্নীর স্বীকৃতি পাবেন না এবং সেই প্রাক্তন স্ত্রী তার স্বামীর বর্তমান বিয়ের অভিযোগ নিয়ে আইনের দারস্থ হলে স্বামীর হাজতবাস সঙ্গে মোটা অঙ্কের জরিমানার বিধান রয়েছে আইনে।

৬) বিবাহবিচ্ছেদ না হয়েও যদি বিশেষ আইনে কেউ বিয়ে করেন তথ্যগোপন রেখে তাহলে বর্তমান স্ত্রী সাথে তার স্বামীর দৈহিক মিলনে জন্মনেওয়া সন্তানকে অবশ্য বৈধ ধরা হবে এবং তার জন্মদাত্রী সন্তানের ভরণপোষণ এর জন্য স্বামীর কাছে আর্থিক সাহায্যও পাবেন। তাছাড়া ভবিষ্যতে এই সন্তান (প্রাক্তন স্ত্রীর নয়, বর্তমান স্ত্রীর) তার জন্মদাতার সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আদালতে মামলা করত পারবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর জানিয়ে লেখাটির ইতি টানা যাক-

বিয়ের নামে ধর্মান্তরণ রুখতে অধ্যাদেশ যোগী সরকারের, ‘প্রমাণ’ হলে ১০ বছরের জেল ধর্ম পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিবাহের অভিযোগ প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে।

বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে ‘লভ জিহাদ’-এর বিরুদ্ধে আইন আনার প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সর্বত্র। তার মধ্যেই বিবাহের নামে ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে অধ্যাদেশ জারি করল উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। তাতে বলা হয়েছে, ছল-চাতুরি করে ধর্ম পরিবর্তন করানোর অভিযোগ প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সাজা হবে।

মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অধ্যাদেশ জারি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যোগী নিজে এই বেআইনি ধর্মান্তরণ প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০২০-এ অনুমোদন দেন বলে জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সিদ্ধার্থনাথ সিংহ। ওই অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ধর্মান্তকরণের উদ্দেশে যদি কোনও মহিলাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হয়, তা হলে আইনের চোখে সেই বিবাহ বৈধ নয়। তা বাতিল বলে ধরা হবে।

শুধু তাই নয়, নিজের ইচ্ছেয় যদি কোনও মহিলা ধর্ম পরিবর্তন করতে চান, সে ক্ষেত্রে বিয়ের ২ মাস আগে জেলাশাসকের কাছে সেই মর্মে আবেদন জমা দিতে হবে। অন্যথায় ৪ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে। সেই সঙ্গে জরিমানা দিতে হতে পারে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকার।

জোর করে ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে ১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত সাজা এবং ১৫ হাজার টাকা জরিমানার কথা বলা রয়েছে ওই অধ্যাদেশে। তবে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের কোনও মহিলা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কের ধর্ম পরিবর্তন করা হলে, সে ক্ষেত্রে ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে। জরিমানা দিতে হতে পারে ২৫ হাজার টাকা।

হিন্দু মেয়ে এবং মুসলিম ছেলের বিবাহকেই ‘লভ জিহাদ’ আখ্যা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। তাদের অভিযোগ, ধর্ম পরিবর্তনের লক্ষ্যেই হিন্দু মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে মুসলিম ছেলেরা। বিজেপি নেতাদের মধ্যে এ নিয়ে শুরু থেকে যোগী আদিত্যনাথই সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন। সম্প্রতি এই ‘লভ জিহাদ’-এর বিরুদ্ধে আইন আনার চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানায় মধ্যপ্রদেশ এবং হরিয়ানা সরকার। তার পর উত্তরপ্রদেশে এ নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে এ নিয়ে আইন মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। শেষমেশ এ দিন অধ্যাদেশ জারি করে যোগী সরকার।

গেরুয়া শিবিরে ‘লভ জিহাদ’-এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এর বিরুদ্ধে খুব শীঘ্র রাজ্যে আইন চালু হবে বলে শুক্রবারই জানিয়েছে সেখানকার স্বরাষ্ট্র দফতর। হরিয়ানা এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারও একই পথে হাঁটছে। তবে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলিম যুবকের বিয়েতেই যাবতীয় আপত্তি তাদের। মুসলিম মেয়ের হিন্দু পরিবারে বিয়েতে কোনও আপত্তি তোলেনি তারা।

তবে বিজেপি এবং গেরুয়া শিবিরের এই ‘লভ জিহাদ’ তত্ত্বের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বিরোধী নেতারা। সাম্প্রদায়িক সংহতি নষ্ট করাই তাদের মূল লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন অশোক গহলৌতের মতো অনেকেই। সোমবার একটি মামলার রায়ে ইলাহাবাদ হাইকোর্টও জানিয়ে দেয়, নিজের পছন্দ মতো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

খবরটির লিংক- https://www.anandabazar.com/india/uttar-pradesh-government-brings-ordinance-against-unlawful-religious-conversion-dgtl-1.1233735

বিদ্রঃ ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে প্রত্যাহার হয়েছিল ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ এ। মনে করা হচ্ছে এবারে জম্মু এবং কাশ্মীরের কোনো স্থায়ী নাগরিক বিশেক বিবাহ আইনে নিজদের দাম্পত্যজীবন শুরু করতে পারেন।

ঋণ স্বীকার: সদ্যপ্রয়াত আইনজীবি শ্রী গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আইনজীবী প্রবাল মিত্র।

পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুভোজ নিবারণ আইন প্রণয়ণের দাবী

গত ২৮ জুলাই ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গে "মৃত্যুভোজ (Death Feast) নিবারণ আইন" প্রণয়নের আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, আইন মন্ত্রী সহ সমস্ত বিধায়ক দের ইমেল করেছেন "ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি"র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি এবং পুরুলিয়া শাখা সম্পাদক, মধুসূদন মাহাতো।

এখানে প্রশ্ন উঠবে কেন এই আইন প্রণয়ণের দাবী? মধুসূদন মাহাতো জানাচ্ছেন, কারও আত্মীয় মারা গেলে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দ্যেশ্যে আয়োজিত শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে আমন্ত্রিত ব্যক্তি (বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ইত্যাদি) এবং আত্মীয় এবং ব্রাহ্মণদের যে ভোজ (Feast) খাওয়ানো হয়, সেটাই মৃত্যুভোজ (Death Feast)।

অভিধানে আধ্যাত্মবাদ শব্দের অর্থ, আত্মা সম্পর্কিত বা সম্বন্ধীয় মতবাদ। বিজ্ঞান কিন্তু গডেশ্বরাল্লহ, আত্মা, অলৌকিক ইত্যাদির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কারন, বিজ্ঞানের দরবারে কোনো কিছু তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সেটা বিজ্ঞানের- পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত এই তিন সহজ সরল ধাপে উপনিত হয় বা সাফল্য (পাশ) লাভ করে। এমনটা আগেও হয়েছে কল্পিত প্রস্তাবনা বা হাইপোথিসিস। অর্থাৎ কোনো ঘটে যাওয়া ঘটনা দেখে যদি মনে হয় (সন্দেহ জনক কিছু রয়েছে) গবেষণা চালানো প্রয়োজন, তাকেই বলা হয় হাইপোথিসিস। এখান থেকেই বিজ্ঞানের ঘরে প্রবেশ করার পক্রিয়া শুরু হয়।

আত্মা নামক বিষয়টি এখনও পর্যন্ত হাইপোথিসিস এ নিজের পা টাই রাখতে পারেনি, বাকি তিন ধাপ তো অনেক দুরের কথা। এখনও পর্যন্ত এমন কিছু ঘটনা ঘটেনি যা ইঙ্গিত করে আত্মার অস্তিত্বকে। এখনও সেই রকম কিছু ঘটেনি যার জন্য বিজ্ঞান পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখবে,তারপর আসবে একটা সিদ্ধান্তে। আত্মার কোনো কার্যপ্রলাপ এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান কে প্রভাবিত করতেই পারেনি তাই বিজ্ঞান আজও মাথা ঘামায়নি যে আত্মার অস্তিত্ব আদৌ আছে, নাকি নেই। আত্মা শুধুমাত্র আমাদের মনোজগৎ এর কল্পনা ছাড়া অন্য কিছুই নয় যেখানে জ্ঞানের আলো জ্বালালেই তেঁনারা ভ্যানিশ।

যুক্তিবাদী সাজবার ভণ্ডামো হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো শাখায় কেউ পড়াশোনা করলে কিন্ত বিজ্ঞানমনষ্ক, যুক্তিবাদী হয়ে যায়না। এটা একটা হয়ে ওঠার ব্যাপার যেটা সবাই পারে না। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা এবং জিজ্ঞাসু মন। তাই কোনো নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী অথবা কোনো ধর্মগুরুরা যতই প্রচার করুক, যতই তত্ত্বকথা শোনাক -"বিজ্ঞান, গডেশ্বরাল্লহ, অলৌকিক, আত্মার অস্তিত্ব কে স্বীকার করে নিয়েছে" তবুও কোনোদিনই এসব প্রমাণিত হবে না বিজ্ঞানের দরবারে।

দেখা গেছে, অনেকসময় গ্রামবাসীদের একাংশের চাপে পরে মৃতের পরিবার এই ভোজের আয়োজন করতে গিয়ে নিজেদের জমানো সম্পদ খুইয়ে কিংবা ফসলি জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায়। এই অহেতুক খরচের ফলে পরিবারগুলি তাদের সদস্যদের সঠিক মতন চিকিৎসা ও সন্তানদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে পারেন না এমনকি তাদের বাড়িঘরও তৈরি করতে ব্যর্থ হন। তাই এই কুরীতি বা কুপ্রথা বন্ধ হওয়া একান্তই প্রয়োজন এবং এরজন্য সারাদেশে আইন আনা ভীষণ জরুরী।

ভারতে প্রথম মৃত্যুভোজ নিবারণে আইন এনেছে রাজস্থান রাজ্য। আইনটির নাম - "রাজস্থান প্রিভেনশন অফ মৃত্যুভোজ অ্যাক্ট - ১৯৬০" { (Rajasthan Prevention of Mrityu Bhoj Act, 1960)। Notification No. F(25)/LJ/A/59 dated .8.2.1960 (Published in Rajasthan Gazette Extraordinary Part 4 A Dated 10.2.1960) [Received the assent of the President on the 3rd day of February 1960] An act to provide for the prevention of Mrityu Bhoj }

এই আইনে মৃত্যুভোজ নিবারণে জেলা প্রশাসনকে অত্যাবশ্যক কার্যকরী ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে। এই আইন অনুসারে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

১) উক্ত আইনের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে - কেউ মৃত্যুভোজ আয়োজন করতে পারবে না এবং কেউ এই ভোজে যোগদানও করতে পারবে না। এই নিষেধ অমান্য করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

২) এই আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি মৃত্যুভোজে উৎসাহ দিলে বা কোনরূপ সহযোগিতা করলে ১ বছর কারাদন্ড অথবা ১০০০ টাকা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

৩) ধারা ৫ অনুসারে, এলাকার জনপ্রতিনিরা মৃত্যুভোজের খবর জানলে তা নিকটবর্তী প্রশাসক বা পুলিশ আধিকারিক জানাবে এবং সেই অনুযায়ী প্রশাসক ও পুলিশ মৃত্যুভোজের আয়োজন বন্ধ করবে এবং আয়োজনের সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করবে। তারপরও যদি মৃত্যুভোজ করে থাকে, তবে ধারা ৬ অনুসারে ১ বছর কারাবাস অথবা ১০০০টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডই দিতে পারে।

৪) ধারা ৭ অনুসারে, কোন জনপ্রতিনিধি যদি মৃত্যুভোজের খবর জেনেও তা নিকটবর্তী প্রশাসক বা পুলিশ আধিকারিককে না জানিয়ে গোপণ করার চেষ্টা করে, তবে তাদেরও তিনমাস কারাদন্ড অথবা ১০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডই হতে পারে।

৫) ধারা ৮ অনুসারে, কোন ব্যবসায়ী বা দোকানদার, মহাজন বা কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুভোজ করতে টাকা বা জিনিসপত্র ঋণ বা ধার দেয়, তবে আইন অনুসারে তা ফেরতযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য হবে না। এমনকি তাদেরও ১ বছর কারাদন্ড অথবা ১০০০ টাকা জরিমানা হবে।

উক্ত আইনে কয়েকটি ফাঁকফোকর, স্ববিরোধীতা (যেমন জরিমানার অঙ্ক এবং শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা সহ কয়েকটি বিষয়) থাকলেও আইনটির অনেক গুরুত্ব রয়েছে। মধুসূদন মাহাতো আরো জানিয়েছেন- আত্মা-পরমাত্মা যেহেতু সব অলীক কল্পনা তাই, মৃত ব্যাক্তির কাল্পনিক আত্মার উদ্দ্যেশ্যে শ্রাদ্ধ একটি কুসংস্কার মাত্র। শ্রাদ্ধ হচ্ছে ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁদের যজমান দের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার দারুন কুবুদ্ধি। সম্ভব হলে অঙ্গদান করার অঙ্গিকার করুন। শ্রাদ্ধের নামে ভুরিভোজ এ অর্থের অপচয় বন্ধ করে সেই টাকায় কোনো গরিবের বাড়িতে সারা মাসের রেশন টা পাঠিয়ে দিন। এতে আপনার পুণ্য জাতীয় কিছু হবে কিনা জানা নেই, তবে মনে একটা অনাবিল শান্তি পাবেন। একটা ভালো কাজ করার শান্তি, যা টাকা দিয়ে কিন্তু কেনা যায় না।

সংবিধান, ধর্মীয় অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে

-বাবাই

ভারতবর্ষের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি থেকে চালু হয়। বাবাসাহেব ডঃ বি.আর.আম্বেদকর সংবিধান কিন্তু একা লেখেননি। সর্বপ্রথমে উনি বেশকয়েকটি দেশবিদেশের সংবিধানগ্রন্থ ও আইনি বইপত্র ভালোকরে পড়ে তারপরে সেখান থেকে নির্যাস নিয়ে, দীর্ঘ আলোচনার পরে ২৯৯ জনের মিলিত মতামতে জন্ম সংবিধানের।

সময়ের সাথে যেমন বিভিন্ন বইপত্র সংশোধন,পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের প্রয়োজন হয় তেমনই ভারতীয় সংবিধানও হয়েছে। ১১ আগষ্ট ২০২১ এ পার্লামেন্ট পাশ হয়েছে ১২৭ তম সংবিধান সংশোধনী বিল। এতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ মহাশয় স্বাক্ষর করায় সেটি পরিণত হয়েছে ১০৫ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে। প্রসঙ্গত জানাই, এই সংশোধনীর ফলে রাজ্যগুলি নিজেরাই নিজস্ব ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তার জন্য ন্যাশনাল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস -এর অনুমতি লাগবে না। এর জন্য ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২-এ এবং ৩৪২ এ (৩) ধারা সংশোধন করা হয়েছে।

সংবিধানের শুরুতে সেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'Secular' শব্দটি ছিলোনা। মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭৬ সালে ১১ নভেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট অনুমোদিত এবং ১৮ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রপতির ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' (কোনোরকম সংজ্ঞা ছাড়াই) শব্দদুটি যুক্ত করা হয়। মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদে 'ধর্মনিরপেক্ষ ' (Secular) শব্দটি ব্যবহার করার পরে যেখানে লেখা হয়েছে -" We The People Of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens;"(অর্থাৎ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হল সংবিধানের মৌলিক নীতি)।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে, দেশের নাগরিকদের ছয়টি (৬) মৌলিক অধিকার দেওয়া দিয়েছে (সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)। যেমন - (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় অধিকার, (৫)সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, এবং (৬) শাষনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

ধর্মনিরপেক্ষতা' বা 'Secularism' শব্দটা নিয়ে আমজনতার মধ্যেই রয়েছে প্রচুর বিভ্রান্তি, সঙ্গে তথ্যবিকৃতিও করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির উৎপত্তি ইউরোপে। ' Secularism' এর আভিধানিক অর্থ - "An ism does not related with religion and non-entity to any supernatural existence"। অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্কিত নয় এমন একটি মতবাদ হল ধর্মনিরপেক্ষতা। নিরপেক্ষ শব্দের অর্থ কোনো অথবা কারোর পক্ষেই নয় থাকা নয়।তাই ধর্মনিরপেক্ষ মানে মোটেই সর্বধর্মসমন্বয় নয়, এর অর্থ 'রাষ্ট্র' ('রাষ্ট্র' অর্থে এখানে একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, সাংসদ বিধায়ক, সরকারি আমলা থেকে পাড়ার কাউন্সিলর ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে) কোনো ধর্মের পক্ষেই থাকবেনা, সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই থাকবে নিরপেক্ষ বা সম্পর্ক বর্জিত। ঠিক যেমনটা একজন রেফারী ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের মধ্যে ফুটবল খেলায় অথবা ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় আম্পেয়ার নিরপেক্ষ থেকে খেলা পরিচালনা করেন।

নির্বাচনে দাঁড়ানো ডান-বাম-ওপর-নীচ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো উক্ত প্রস্তাবনাকে সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকারে "The Representation of the People Act 1951" (Amendment 1989) এর 29(A) ধারায় দায়বদ্ধ। অবশ্য, কার্যক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের "ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়" এর অবস্থা হতে পারে। এমনকি নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে অনেক।

আইনের প্রয়োগ এবং সদিচ্ছার অভাবে ভারতে গোদীলোভী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির অপব্যখ্যা ও অপপ্রচার করে, তথ্য বিকৃতি ঘটিয়েছে অনেক আগেই।

এইখানে একটি বিশেষ খবর জানিয়ে রাখা উচিত হবে যে, গত ৩রা জানুয়ারি ২০১৭ তে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে ভোট চাওয়া বা ভোট না দিতে প্ররোচিত করাকে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ বলেই রায় দিয়েছিল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির বেঞ্চে চার জন বিচারপতি এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, কেবল প্রার্থী নয়, ভোটারদের ধর্ম-বর্ণের ধুয়ো তুলেও ভোটের প্রচার করা যাবে না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৩(৩) ধারায় ধর্ম, জাতি, ভাষা, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া অবশ্য এমনিতেই নিষিদ্ধ। শীর্ষ আদালত বলেছে— কেবল প্রার্থী নয়, প্রচারে আনা যাবে না ভোটারদের ধর্ম, জাতি, ভাষার কথাও। এমনকী প্রার্থীর এজেন্টের সামাজিক পরিচয়ের জোরেও ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা যাবে না। এখন প্রশ্ন এটাই, শীর্ষ আদালতের এই রায় কার্যকর করা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দিহান অনেক রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ধর্ম- জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট চাইলে প্রার্থিপদ বাতিল করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। তারা বড়জোর আদালতে যেতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে হলে আইন করে কমিশনকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু তা করতে ভয় পায় সব দলই। কারণ ধর্ম, জাতপাতের অঙ্ককে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাদের নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্মীয় মেরুকরণ এবং অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্রর ঝাঁঝালো বক্তব্য রেখেই কিন্তু ২০১৩ সালে একটি রাজনৈতিক দল ভারতে কেন্দ্রসরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল।

ভারতীয় সংবিধানে ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় আমজনতার ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি রয়েছে, যা আবেগের নয় বরং যুক্তিপূর্ণ আলোচনার বিষয়।ভারতীয় সংবিধান আমজনতাকে দিয়েছে ধর্মপালন বা ধর্মাচারণ করার স্বাধীনতা, কিন্তু সেটা কখনওই প্রকাশ্যে নয় বরং একান্তে, ব্যাক্তিগত ভাবে। অন্যদিকে, ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের কথাও সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন, প্রতি ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্কতা, মনুষ্যত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সাধনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো। "It shall duty of every citizen of India to develop the scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform.{Article 51A(h)Part iv A}"।

ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় অধিকার বা ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আমজনতার মধ্যে রয়ে গেছে নানানরকম বিভ্রান্তি। অন্যদিকে বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মীদের উচিৎ খুব ঠান্ডা মাথায় ভারতীয় সংবিধান এবং ভারতীয় আইনের বইপত্র ভালোকরে পড়ে দেখা। আমাদের সংবিধানে এমন বেশকিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো পরস্পরবিরোধী যার সংশোধনের প্রয়োজন আবশ্যক। আবার এমনও কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগাতে বাধ্য।

যেমন -১) সংবিধানে বর্ণিত একটি Secular, Democratic, Republic Country ভারতে লাগু রয়েছে শরীয়া আইন (The Muslim Personal Law (Sharia) Application Act, 1937)। ভারতে এটি শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মূলতঃ বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক, অভিভাবকত্ব এর মত বিষয় গুলি শরিয়া আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এখানে শরীয়া আইন কার্যকরী নয়। মূলতঃ এই আইন দ্বারা ভারতীয় মুসলিম মহিলারা নিষ্পেষিত ও শোষিত।

২) ব্লাসফেমি অ্যাক্ট। কোনো বিশেষ ধর্মের বিষয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করাকে 'ব্লাসফেমি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের 'Commission on International Religious Freedom' এর ২০১৭ সালের রিপোর্টে ৭১টি দেশের তালিকা উঠে আসে যেখানে ব্লাসফেমি আইন রয়েছে। এই আইনের অধীনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বহুর মধ্যে একটা মর্মান্তিক শোনা যাক। সম্ভবত আগষ্ট ২০২১ এর ঘটনা, ধর্ম অবমাননার দায়ে পাকিস্তানে আটক একটি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী পরিবারের ৮ বছরের ছেলে মৃত্যদন্ডে দণ্ডিত। যে বয়সের শিশুরা জানেই না ধর্ম নামক জিনিসটা খায়, নাকি মাথায় মাখে সেই বয়সের একটি শিশু কিভাবে ধর্ম অবমাননা করতে পারে? সে কিভাবেই বা অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করতে পারে?

দন্ডবিধি ১৮৬০, অনুচ্ছেদ ১৫র ২৯৫ ধারা থেকে ২৯৮ ধারা (IPC-295-298) পর্যন্ত সংশোধন করা প্রয়োজন এবং এর মধ্যে ২৯৫-ক (IPC-295A) ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা খুবই প্রয়োজন। সংবিধান প্রতিশ্রুত নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী এই আইন। আলোচনা, সমালোচনা, মতপ্রকাশ এবং উস্কানি, বিদ্বেষ, ঘৃণাবাদ এক নয় অন্যদিকে, দন্ডবিধি-১৮৬০ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২৯৫-ক ধারাটিতে আলোচনা, সমালোচনা, বাক্ স্বাধীনতা তথা মতপ্রকাশের অধিকার হরণ করা হয়েছে।

৩) ভারতীয় সংবিধানের ২৮(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.'অর্থাৎ, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনোরকম ধর্মীয় নির্দেশ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা যাবেনা। আবার, ২৮(২) নং ধারায় লেখা হয়েছে- 'Nothing in clause 28(1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.' ফলে কনভেন্ট স্কুল বা মিশনারি স্কুল কিংবা বৈদিক বিদ্যালয় অথবা মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এই স্ব-বিরোধীতা সংশোধনের বিশেষ প্রয়োজন।

One way Rationalism, One way Humanism

-সন্তোষ শর্মা

২০১৯ সালের ৩ জুন " ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি"র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি এবং পুরুলিয়া শাখার সম্পাদক মধুসূদন মাহাতো, সিধু কানু বিরষা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Sidhu-kanho-Birsha University) ভাইস চ্যান্সেলর এবং রেজিস্টারকে তাদের বিভিন্ন ফর্ম (Form)-এ ধর্মীয় (Religion) কলামে মানবতাবাদ বা মানবধর্ম রাখার আবেদন জানান।

স্বাভাবিক ভাবেই অনেকে হয়তো ভাববেন, বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে ৪২০০টি প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম (Religion) থাকতে হটাৎ মানবধর্ম কেন বা কি প্রয়োজনে? অথবা, এই মানবধর্ম বিষয়টি আদতে ঠিক কি?

দেখা যাচ্ছে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানিক ধর্মেই নিজেদের কে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানায়। মানবতা এবং পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার লোকদেখানো প্রচারও করে থাকে কিন্ত সেটাই যদি সত্য হতো তাহলে ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে হিংসা, বিদ্বেষ, রক্তপাতের খবর শোনাই যেতো না। 'ধর্ম মানবতা শেখায়' কথাটা আসলে সোনার পাথরবাটির মতন ব্যপার। এটি সর্বৈব মিথ্যে এবং অপপ্রচার।

প্রথম মানবধর্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে নিউইয়র্কে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অধিকার ঘোষণার অনেক আগে। এই মানবধর্মীরা তখন ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ১৯২৯ সালে পাশ্চাত্যে "Humanism" নামে যে নতুন Ism বা মতবাদের জন্ম হয়েছিল সেটা ছিল ইহুদি- খ্রিস্টান কট্টর পন্থীদের অবিরাম সংঘর্ষের একটা ফলস্বরূপ। তখনকার গণ্যমান্যরাই ছিলেন এই দলে। এঁরা মানবধর্মকে অন্য সমস্ত প্রচলিত ধর্মের বিকল্প হিসেবে চেয়েছিলেন। এদের উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন Albert Einstein, Will Durant, Thomas Mann, Julian Huxley ইত্যাদি জ্ঞানী গুণী যোদ্ধারা। এদের পথপ্রদর্শক ছিল আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান। তাদের আস্থা ছিল, প্রত্যয় ছিল কিন্তু ছিল না অন্ধবিশ্বাস। তাদের আস্থা ছিল গণতন্ত্রে, বিজ্ঞানে, সব মানুষের সমান অধিকারে।

এখন এই ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগে অনেক বিশ্বাস বা Cult যা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে উঠে এসেছে, তাঁরা আলাদা স্বীকৃতি চাইছেন। যেমন রামকৃষ্ণের ভক্তরা "Ramkrishnaite" হিসেবে আলাদা ধর্মীয় স্বীকৃতি চাইছিলেন বেশ কিছু বছর ধরেই। কিন্তু তাঁরা মূলত হিন্দু বলেই তাঁদের এই আবেদন বাতিল করে দেয় সরকার। অবাক লেগেছিল যখন একজন সফল আবেদনকারীর চাকরিতে ঢোকা নাকচ হয়ে যায় শুধুমাত্র "Religion" কলামে "মানবতাবাদ" লেখার জন্য। যেন মানবিক হওয়াটা খুব গর্হিত অপরাধ।

সেটা ১৯৯২-৯৩ সাল। যুক্তিবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এই বাংলার ছেলে মেয়েরা সরকারি, বে-সরকারি সমস্ত আবেদনপত্রে "ধর্ম" কলাম তুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। "ধর্মপালন বা ধর্মাচরণ কারোর ব্যক্তিগত ব্যপার, একটি ধর্মনিরপক্ষে রাষ্ট্রে ধর্মীয় পরিচয় জানানো জরুরি নয়। যাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম মানেন না তাঁদের form বাতিল করা হচ্ছে অসম্পূর্ণ বলে। এই সময় এগিয়ে আসে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সিস্টার কনসার্ন "Humanists Association of India" বা " ভারতের মানবতাবাদী সমিতি" এবং সক্রিয় হয় মানবতাকে ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় রাষ্ট্রসংঘের অফিসে। উত্তরও আসে দেরি না করেই। UNO তাদের Human Rights এবং Religious Rights সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, '১৯৮১-র জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে প্রতিটি মানুষের যে কোনো ধর্মমত গ্রহণ করার ও চর্চা করার স্বাধীন অধিকার আছে।' তারপরই এই আইনি লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে মানবতাবাদী সমিতি ও যুক্তিবাদী সমিতি। একটা চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সাংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশি দূতাবাসেও। তারপর মানবতাবাদী সমিতি'র সহায়তায় কোর্টে গিয়ে Affidavit করে দলে দলে ছেলেমেয়ে Humanism-কে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৯৩ সালে ১০ ডিসেম্বর। ১৯৯৩ সালে ১০ ডিসেম্বর "বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে" প্রথম ৫৪ জন সদস্য-সদস্যা আইনিভাবে Humanist হন।

এই কঠিন লড়াইটা জেতার পর এখন আর কোন বাধা নেই– যে কোন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশে এই একই ভাবে যে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে HUMANIST ঘোষণা করতে পারেন সগর্বে।

প্রসঙ্গত জানাই, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে বোম্বে হাইকোর্ট একটি রায়ে স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে, রাষ্ট্র কাউকে তার ধর্ম জানাতে বাধ্য করতে পারবে না। তিনি কোনও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নন বা কোনও ধর্ম পালন করেন না -- এই দাবী করার সাংবিধানিক

অধিকার আছে প্রত্যেক নাগরিকের। (State can compel none to declare or specify his/her religion. Citizens have Constitutional Right to belong to 'No Religion'.----- Bombey H C Ruling.
এটি পড়ুন –

No person in India can be compelled to declare his religion: HIGH COURTS

Bombay High Court: In a landmark judgment, a bench comprising of A.S. Oka and A.S. Chandurkar, JJ declared that by virtue of Article 25 of the Constitution, every individual has the right to claim that he does not practice or profess any religion and thereby directed the state that they cannot compel any individual to declare or specify his religion in any form or in any declaration.

In the present case the petitioners were members of a registered organization "Full Gospel Church of God". Though they believed in the existence of Lord Jesus Christ but they did not believe in any religion, much less Christianity. According to their belief, Lord Jesus Christ desired to have a kingdom of heaven and not to form any religion. Therefore, they wanted a gazette notification to be issued recording that they were not Christians and that they belong to 'no religion'. This application was rejected by Government Printing Press against which they filed a public interest litigation in Court.

The Court took into consideration various judgments including Commissioner of Police v. Acharya Jagadishwarananda Avadhuta (2004) 12 SCC 770 where it was stated that 'man's relation to his God is no concern of the State'. The Bench also observed that Article 25 (1); of the Constitution is in two parts. The first part confers fundamental right to freedom of conscience whereas the second part confers a right on a citizen to freely profess, practice or propagate any religion. The Court clarified that as freedom of conscience confers a fundamental right to entertain a religious belief, it also confers a right on an individual to express an opinion that he does not belong to any religion. Therefore, no authority which is a state within the meaning of Article 12 or any of its agency or instrumentality can infringe the fundamental right to freedom of conscience and thereby, the Court set aside the order of the Government Printing Press. Dr. Ranjeet Suryakant Mohite vs. Union of India, Public Interest Litigation No. 139 of 2010, decided on 23.09.2014
News Link: https://www.scconline.com/blog/post/2014/09/26/no-person-in-india-can-be-compelled-to-declare-his-religion/
এখানে আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর তুলে ধরলাম।

"ইচ্ছামতো ধর্ম গ্রহণ ভারতে।"
ইনকিলাব ডেস্ক। প্রকাশের সময়: ১১ এপ্রিল, ২০২১
১৮ বছরের বেশি বয়সী যে কোনো নাগরিক তার ইচ্ছামতো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে বলে সংবিধানে অধিকার দেয়া রয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার ভারতের উচ্চ আদালতে অশ্বিন উপাধ্যায় নামে আইনজীবীর আবেদনের প্রতিউত্তরে এমন মন্তব্য করেছেন। এছাড়া এ বিষয়ে 'এরকম ক্ষতিকর' পিটিশন করার জন্য নিন্দাও জানিয়েছে আদালত। অশ্বিনের আবেদন ছিল, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মান্তরকরণ বন্ধের জন্য সর্বোচ্চ আদালত কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোকে যেন নির্দেশ দেয়। সংবিধান বিরোধী এমন আবেদন করায় অশ্বিনের আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণকে নিন্দা জানিয়েছেন বিচারপতি আর এফ নরিম্যান, বি

আর গাভাই ও ঋষিকেশ রায়কে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ। বিচারপতিরা বলেন, একজন সিনিয়র আইনজীবী হওয়ার পরও সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারের বিষয়ে জানা নেই আপনার। যদি না জানেন তাহলে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব করার আগে তা জেনে নিতে পারেন। এভাবে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য আমরা আপনার এবং আপনার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারি। সূত্র- দ্য হিন্দু।

খবরটির লিংক -

https://m.dailyinqilab.com/article/372707/%E0%A6%87%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87

আমজনতার বৃহৎ অংশ 'ধর্ম' বলতে উপাসনা / প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ বলতে উপাসনাধর্ম বিষয়ক বই-পত্র কেই বোঝেন। অভিধানে ‘ধর্ম’ বা ‘ রিলিজিয়ন’ (Religion) শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে - (১) ধর্ম মানে - সাম্প্রদায়িক, ঈশ্বর উপাসনা, রীতি-নীতি, ঈশ্বর এবং পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস। যেমন -হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম ইত্যাদি ৪২০০ প্রকার। (২) Religion [রিলি'জন]n. ধর্ম: human recognition of a personal God entitled to obedience.. আবার, (৩) ধর্ম মানে - গুণ (Property) বৈশিষ্ট (Characteristic)। যেমন - আগুনের ধর্ম বা গুণ দহন, জলের ধর্ম বা গুণ তরলতা, তরোয়াল এর ধর্ম বা গুণ তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি। ধর্মবিশ্বাস ; any system of faith and worship বোঝায়।

বহু ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটিও তোলেন যে, কি এই মানবতাবাদ অথবা HUMANISM? কেন মেনে নেবো একে? এর উত্তরটি বেশ সহজ। HUMANISM কে ভাঙ্গলে আমরা কি পাই দেখা যাক। HUMAN অর্থাৎ ‘মানব’ বা মানুষ এবং ism হচ্ছে ‘মতবাদ’। দুয়ে মিলে দাঁড়ায়, মানবের মতবাদ কিংবা একজন মানুষের নিজস্ব মতবাদ এবং একজন মানুষের নিজস্ব মতবাদ কখনওই জন্মসূত্রে পাওয়া প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম (Religion) যেমন- হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি পরিচয় হতে পারে না। কারন, একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন সে জানেই না তার ধর্মচিহ্ন বা ধর্মবিশ্বাস ঠিক কি। শিশুটি জানেই না, জাতপাত, ধর্মীয় আচার আচরণ, ধর্মীয় বিদ্বেষ কাকে বলে। শিশুটি শুধু জানে প্রাণখুলে খেলতে, আনন্দে বাঁচতে। একটি শিশুর মস্তিষ্ক মাটির তালের ন্যায়। কুমোর যেমন চরকায় মাটির তাল ফেলে ইচ্ছেমত আকার দেয় তেমনই পরিবারের শিশুদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন তাদের অভিভাবকেরা। কেউ, ছোট থেকেই শিশুদের ধর্মহীন, জাতপাতহীন মুক্তমনা গড়তে চেষ্টা করেন তো কেউ আবার ধার্মিক। মানবতাবাদ=নাস্তিকতাবাদ + মানবিক গুণ।

তাই যিনি নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী নন তিনি মানবতাবাদী হতে পারেননা, তিনি মানবিক গুনসম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারেন কিন্তু মানবতাবাদী নন।

উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে, “বর্তমান যুগে যারা শুধু বিজ্ঞান ও বিবর্তনকে বিশ্বাস করে তারা মানবধর্ম পালন করে। তারা স্বাধীন।তারা আধুনিক বিজ্ঞানকে আর্দশ মনে করে। মানব ধর্মে বিশ্বাসীগণ নাস্তিক নামেও পরিচিত,কারণ তারা আদিমকালের কোন ধর্মই বিশ্বাস করে না, পালন করে না। ৭৭১.৫০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মানবধর্মে বিশ্বাসী পুরো পৃথিবীতে ২০ কোটি প্রায়। মানব ধর্মের উল্লেখ, কবি ‘লালন শার্হ’ তার কবিতায় বলেছেন। তিনি চেয়েছেন ধর্ম, জাত, বর্ণের কোন ভেদাভেদ না রেখে সবাই মানবধর্মে মনোযোগ দেই, মানবধর্ম পালনে বিশ্বাসী হই।”

এই প্রসঙ্গে জানাতে চাই, Humanitarianism আর Humanism এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। Humanism বা মানববাদ মানুষের বৌদ্ধিক চেতনা নিয়ে কথা বলে। অপরদিক Humanitarianism মানুষের মানবিক গুণাবলী যেমন প্রেম ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদির কথা বলে।

আজ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার বিচারে নাস্তিক /অধার্মিক / যুক্তিবাদীরা তৃতীয় স্থানে (সূত্র- মনোরমা ইয়ারবুক ২০১৯। যাকে মান্যতা দেয় ওয়ার্ল্ড অ্যালম্যানাকও)। ২০১২ সালের ‘উইন গ্যালপ গ্লোবাল ইনডেক্স অফ রিলিজিয়ন রিপোর্ট’ অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশ ছিল ঘোষিত নাস্তিক। এই হিসেবে ১৩০ কোটির দেশ ভারতে নাস্তিকদের সংখ্যা ছিল ৩

কোটি ৯০ লক্ষ। অন্যদিকে, অনেকে দেশে এখন নাস্তিকরাই সংখ্যাগুরু, এ তথ্য ছাপা হয়েছে শারিয়াপন্থী দলগুলোর সমর্থক দৈনিক 'আমার দেশ' এ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনাল জরিপ।

ইউরোপের অনেকে দেশে এখন নাস্তিকরাই সংখ্যাগুরু। চীনে ৬১ শতাংশ সরাসরি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। সুইডেনে ৮ শতাংশ উপাসনালয়ে ধর্মচর্চা করে, ৭৬ শতাংশ নাস্তিক।

চেক প্রজাতন্ত্রে ১২ শতাংশ গির্জায় ধর্মচর্চা করে, ৭৫ শতাংশ নাস্তিক। ব্রিটেনের ৫৩ শতাংশের ধর্মবিশ্বাস নেই। হংকংএর নাগরিকদের ৬২ শতাংশে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয়। জাপানে নাস্তিকের সংখ্যা ৬২ শতাংশ। জার্মানিতে ৫৯ শতাংশ নাস্তিক। স্পেনের নাগরিকদের বড় একটা অংশই নাস্তিক। অস্ট্রিয়ার নাগরিকদেরও বড় অংশ নাস্তিক। ফ্রান্সের নাগরিকদের বৃহত্তর অংশ নাস্তিক।

এসব তথ্য এটাই কি প্রমাণ করে না যে, নাস্তিক / অধার্মিক / যুক্তিবাদী / মানবতাবাদীদের বিশ্বজয় নিশ্চিত। যতই কট্টরপন্থী, মৌলবাদীরা অস্ত্রের প্রয়োগে মুক্তচিন্তকদের হত্যা করুক তবুও তাদের দুর্বার গতিকে আটকানোর নেই সাধ্য কারোরই। রইলো আরেকটি মন ভালোকরে দেওয়া খবর-

"কলেজে ভর্তির ফর্মে সবার উপরে মানবধর্ম"

ধর্মের নাম মানবতা। পড়ুয়াদের ভর্তির ফর্মে এ বার চাইলে এমনটাও লিখতে পারেন কোনও আবেদনকারী। এ বছর ভর্তির জন্য অনলাইনে ফর্মে পড়ুয়াদের জন্য এই সুযোগ করে দিচ্ছে কলকাতার বেথুন কলেজ এবং মেদিনীপুর কলেজ।

গত সোমবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে সেই রাত থেকেই অনলাইনে বিভিন্ন কলেজের ফর্ম পূরণ শুরু হয়েছে। আর সেখানেই বেথুন ও মেদিনীপুর কলেজের জন্য ফর্ম ভর্তি করতে গিয়ে আবেদনকারী ছাত্রীরা দেখতে পাচ্ছেন, ধর্মের কলামে তালিকার প্রথমেই রয়েছে মানবধর্ম। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট বা অন্য যে কোনও ধর্মকে বাদ দিয়ে মানবতাকে নিজের ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ পাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।

কেন এই উদ্যোগ? বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা মমতা রায় জানাচ্ছেন, গত বছরও কলেজে ভর্তির অনলাইন ফর্ম থাকলেও তাতে মানবতাকে নিজের ধর্ম বলে বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। তিনি বলেন, "অনেক আবেদনকারী হয়তো কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করেন না। তিনি হয়তো শুধু মানবধর্মে বিশ্বাসী। এই আবেদনকারীরা ওই কলামে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান-সহ নানা ধর্মের মধ্যে 'অন্যান্য' বলে যেখানে উল্লেখ থাকত তা বেছে নিতেন। অনেকে আবার লিখে দিতেন 'নন বিলিভার'। এবার থেকে তাঁরা নিজের মত আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারবেন।" অধ্যক্ষার মতে, মানবতা ছাড়া যে কোনও ধর্মই হয় না, সেই বার্তাও এর মাধ্যমে নবীন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে। আর মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র বেরা বলছেন, "মানুষের প্রথম পরিচয় সে মানুষ। মানবতাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই কলামটি এমন রাখা হয়েছে।"

বেথুনের অধ্যক্ষা অবশ্য জানাচ্ছেন, সুষ্ঠু ভাবে ভর্তির মেধা-তালিকা বার করাটাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। তবে তার মধ্যেই ছোট ছোট বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এ বার অনলাইনে ভর্তির আবেদনপত্র প্রকাশের আগে কলেজে অ্যাডমিশন কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এ বারের আবেদনপত্রে ধর্মের তালিকায় স্থান পাবে মানবধর্ম।

বেথুন ও মেদিনীপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন আবেদনকারী ছাত্রী থেকে শুরু করে তাঁদের অভিভাবকদের অনেকেই। তাঁদের একাংশের মতে, এর ফলে অনেকেই নিজের মত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন।

তবে শুধু কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেই নয়। চাকরির আবেদন থেকে শুরু করে নানা জায়গায় ফর্ম ভর্তি করার সময়ে ধর্মের নাম লেখার একটি জায়গা থাকে, যা আবেদনকারীকে লিখতেই হয়। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের নামের সঙ্গে সঙ্গে 'অন্যান্য' বলেও লেখা থাকে। বেথুন কলেজের মতো এ বার সেই সব জায়গায় ধর্মের কলামে মানবতাকে রাখা যেতেই পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মনে করছেন, সব ধর্মেরই মূল কথা মানবতা। এখন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক সময়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়। আসলে ধর্মে ধর্মে কিন্তু কোনও বিভেদ নেই। শীর্ষেন্দুবাবুর কথায়, "আজকাল অনেকেই ধর্মীয় পরিচয় দিতে চান না বা দিতে লজ্জা পান। সে ক্ষেত্রে মানবতাকে বেছে নেওয়ার এই সুযোগ থাকাটা ভাল। তাতে আবেদনকারীকে একটা স্বাধীনতাও দেওয়া হল।" সমাজতত্ত্বের শিক্ষক অভিজিৎ মিত্র এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "এই উদ্যোগ অনুসরণযোগ্য।"
https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/bethune-college-and-midnapore-college-included-humanities-in-their-religion-section-1.999637

জন্মসূত্রে পাওয়া প্রতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় ছেড়ে (যেমন- হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান ইত্যাদি) নিজেকে মানবতাবাদী বা Humanist ঘোষণা করতে চাইলে সেই ব্যক্তিকে এফিডেফিট (Affidavit) করাতে হবে নোটারী দ্বারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষর সহ পাকাপোক্ত একটি এফিডেফিট এর জন্য যাতে ভবিষ্যতে কোনোরকম সমস্যা না এসে দাঁড়ায় (In order to have that, a Religion Change affidavit has to be prepared mandatorily. The affidavit is a legal document that contains details like name, the new religion, old religion, and address. It must be made on stamp paper and notarized by a notary public.) আমি, সন্তোষ শর্মা একজন সাংবাদিক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সংযুক্ত সম্পাদক এবং ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সদস্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ –এ ব্যারাকপুর নোটারী থেকে এস দত্ত মারফৎ ১৬ জন মুক্তচিন্তকদের সাথে এফিডেফিট করিয়ে Religion কলামে Humanism লেখার আইনত অধিকার লাভ করেছি। এফিডেফিট এর বয়ানটি তুলে ধরলাম -
"We, members of Humanist Association feel and sincerely believe that the greatest religion of Man is 'Humanism' which is most suitable for the protection and achievement of human rights and for the fullest expression of human talents. We therefore declare 'Humanism' as our religion. This is in accordance to the declaration of the General Assembly of UNO, November, 1981.
The religion of 'Humanism' is a way of life separate and different from any other like Hinduism, Islam, Christianity, Judaism etc. 'Humanism' has its separate organization and separate philosophy aiming at the total well-being of mankind where coercion and repression hardly exist."
ভারতে কোনো শিশুর জন্মনেওয়ার পরে পৌরসভা থেকে যে জন্মসংশাপত্র বা Birth certificate প্রদান করা হয় তাতে (form 5) কিন্তু Religion column বলে কিছু নেই, ব্যতিক্রমী কিছু যায়গা ছাড়া। অনেকেই অভিন্ন দেওয়ান বিধি অর্থাৎ Uniform Civil Code চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছেন। কিন্তু যতদিন না Uniform Civil Code তৈরি হচ্ছে, আইনের চোখে আবার ধর্ম থাকাটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে Criminal Law আবার ধর্মের ধার ধারে না কিন্তু Personal Law (যেমন- Property, Marriage, Divorce, Inheritance ইত্যাদি) লাগু করতে হলে আমাদের দেশে এখনও ধর্ম ছাড়া গতি নেই। এমনকি কেউ যদি বিশেষ বিবাহ আইন বা Special Marriage Act এ বিয়ে করেও থাকেন, সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে গোলমাল বাধলে তার নিষ্পত্তি কোনও না কোনও ধর্মের Personal Law অনুযায়ী হবে। তবে, উইকিপিডিয়ার একটি তথ্য জানাচ্ছে-

Q: What is all about religion change in India?

Ans: As per Article 15 of the Indian Constitution, freedom of religion is one of the fundamental rights in India. India is a secular country and every Indian citizen has the right to practice and promote their own religion peacefully. This means changing religion (due to self-belief, marriage, or divorce) is legal in India provided the same is in good faith and not because of any coercion or application of

force. অন্যদিকে, জনৈক দুর্গাদাস বাবু জানিয়েছেন – "আমার মেয়ের বয়স এখন 22, ওর Birth certificate এ কোনো পদবী বা টাইটেল নেই, এবং ধর্ম হিসাবে Humanism লিখেছিলাম। প্রথমে একটু ঝামেলা করলেও দমদম মিউনিসিপ্যালিটি থেকে Birth certificate বের করতে পেরেছিলাম। ধর্ম এবং পদবী ছাড়াই আমার মেয়ের সমস্ত রকম কার্ড, পাসপোর্ট, PAN, Aadhar, Driving license, Ration card, Voter card আছে।"

প্রিয় পাঠকবন্ধু, আপনি কি স্নেহা পার্থিবরাজকে চেনেন? উনি তামিলনাড়ুর তিরুপাত্তুর-এর বাসিন্দা এবং পেশায় আইনজীবি। কিছুসময় আগে তিনি একটি ব্যতিক্রমী কাণ্ড বা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছেন তাও আবার ভারতের মতো ধর্ম ও বর্ণে শতবিভক্ত একটি দেশে। তিনিই ভারতের সেই প্রথম মহিলা যাঁর কোনো ধর্ম নেই এবং বর্ণও নেই (No Religion, No casts) এই স্বীকৃতি তিনি আদায় করেছেন দীর্ঘ লড়াইয়ের পর খোদ তামিলনাড়ু সরকারের কাছ থেকে। স্কুল জীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজ পত্তরে ধর্ম ও বর্ণের যায়গাটি ফাঁকা রাখতেন। ২০১০ সাল নাগাদ তিনি এর জন্যে আইনি লড়াই শুরু করেন। পাশে পেয়ে যান তাঁর জীবনসঙ্গী পার্থিবরাজকেও। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মিলছে স্বীকৃতি। স্বয়ং তামিলনাড়ু সরকার, স্নেহা পার্থিবরাজকে সনদ পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন, এবার থেকে স্নেহা নিজেকে ধর্মহীন এবং বর্ণহীন মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে। সরকার একই সঙ্গে জানিয়ে দেয়, এখন থেকে স্নেহার একমাত্র পরিচয়,তিনি ভারতীয়।

স্নেহা পেরেছেন। কিন্তু বাকিরা? আরে মশাই আর কতদিন? আর কতদিন জন্মসূত্রে পাওয়া প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম কে আঁকড়ে ধরে বাঁচবেন? যুক্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস ছেড়ে বের হয়ে আসুন। আনন্দ পাবেন। এমন এক অনাবিল আনন্দ যা টাকাপয়সা দিয়ে কেনা যায়না। অন্তত আগামীপ্রজন্মর স্বার্থেই এগিয়ে আসুন। গর্ব করে প্রচার করুন হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান ইত্যাদি নয়, মানুষের একমাত্র ধর্ম হচ্ছে "HUMANISM"।

স্নেহা পার্থিবরাজ। আপনাকে কুর্নিশ। লেখাটি শেষ করবো একটি অন্যরকম খবর জানিয়ে।



হিংসা দেখে বিতৃষ্ণায় ফর্মে ধর্মের উল্লেখ করেনি সোনালি

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়
মহম্মদবাজার, ২ এপ্রিল

ধর্মে বিতৃষ্ণা। সেজন্যই স্কুলের ফর্মে নিজের কোনও ধর্মের উল্লেখ করেনি। সাফ জানাল বীরভূমের মহম্মদবাজারের গিরিপুর-পুরানোগ্রাম বৈকুণ্ঠনাথ হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী সোনালি হেমব্রম।
রামনবমীকে ঘিরে পাশের জেলা পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল-রানিগঞ্জ এলাকার হিংসার ছবি তাকে রীতিমতো নাড়া দিয়েছে। টিভি-র খবরে সেই হানাহানির ছবি দেখে ধর্মের প্রতি তার মনে এতটাই বিতৃষ্ণা জন্মেছে যে, নিজের স্কুলের ওই ফর্ম ফাঁকাই জমা দিয়েছে মহম্মদবাজার থানার প্রত্যন্ত গ্রাম রানিপুরের আদিবাসী দিনমজুর পরিবারের এই স্কুল-ছাত্রী। সোনালির কথায়, 'আমি চাই ধর্ম নিয়ে এই হানাহানি বন্ধ হোক। আমি মনে করি, সবার এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসা দরকার।'
ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে বছর পনেরোর তরুণীটি বেছে নিয়েছে তার স্কুলের একটি ফর্ম। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-সহ 'ডেটাবেস আপডেট' করার জন্য ফি-বছর একটি ফর্ম ছাত্রছাত্রীদের পূরণ করতে বলা হয়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবিউল হক জানান, 'শনিবার ফর্মে ধর্মের ঘরটি ফাঁকা দেখে সোনালিকে যখন সেটি পূরণ করতে বলা হয়, সে জানায়, ধর্মে তার কোনও আগ্রহ নেই, তাই ইচ্ছা করেই সে নিজের কোনও ধর্মের কথা না উল্লেখ করে ওই ঘরটি ফাঁকাই রেখেছে। ধর্ম উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক নয়, তাই এ নিয়ে তাকে আর জোর করা হয়নি।'
সোমবার সে একেবারে স্বাভাবিক ভাবেই স্কুল করেছে বলে জানালেন শিক্ষক ও তার সহপাঠীরা। রানিপুর গ্রামে ক্যানেলের পাড়ে কুঁড়েঘরে থাকে সোনালির পরিবার। বাবা মারা গেছেন। মা, দাদা, বউদিকে নিয়ে অভাবের সংসার। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে ডিসেম্বর মাসে মায়ের সঙ্গে মুম্বই গিয়েছিল সোনালি। ২ মার্চ ফিরে এসেই ফের স্কুলে আসা শুরু করেছে। স্কুলের শিক্ষকেরা জানালেন, পড়াশোনায় সাধারণ হলেও সোনালি বরাবরই প্রতিবাদী। সোনালি এদিন জানায়, 'ধর্মের পরিচয় বাদ দিয়েই আমি পড়াশোনা করে বড় হতে চাই।'

সোনালি হেমব্রম। ছবিঃ শান্তনু দাস

"চাকরির নথিতে 'নাস্তিক' লেখার দাবি, শিক্ষা দফতরে চিঠি শিক্ষিকার তা-ও যদি না-হয়, তবে ফর্মে ধর্মের জায়গা পূরণ 'ঐচ্ছিক' করতে হবে।"

পদবি ওঁর কাছে 'ধর্মচিহ্ন' ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মেয়ের নামের সঙ্গে পদবি জোড়েননি দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তির শেরপুর রামচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শর্মিলা ঘোষ। এ বার তিনি শিক্ষা দফতরে চিঠি পাঠিয়ে তিনি দাবি করেছেন, চাকরি সংক্রান্ত সমস্ত নথিতে ধর্মের জায়গায় 'নো রিলিজিয়ন' বা 'না-ধার্মিক' লেখার সুযোগ তাঁকে দিতে হবে। একান্তই তা সম্ভব না-হলে, ফর্মের ওই জায়গায় 'নাস্তিক' অথবা 'মানবিকতা' লেখার সংস্থান থাকতে হবে নথিতে। আর তা-ও যদি না-হয়, তবে ফর্মে ধর্মের জায়গা পূরণ 'ঐচ্ছিক' করতে হবে।

শর্মিলা বলেন, "এখন চাকরি সংক্রান্ত সমস্ত নথি এবং ফর্মে ধর্মের জায়গায় আমাকে হিন্দু অথবা 'আদার্স' লিখতে হয়। এই 'আদার্স'-এর অর্থও কোনও না কোনও ধর্ম। কিন্তু আমি কোনও ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ নই। তাই ফর্মের ওই জায়গায় আমাকে না-ধার্মিক, মানবিকতা অথবা নাস্তিক লেখার সুযোগ দিতে হবে। তা সম্ভব না হলে, ধর্মের জায়গা পূরণ করার বিষয়টি ঐচ্ছিক করতে হবে।" সঙ্গে যোগ করেন: "বছরের পরে বছর ধরে ওই ফর্মগুলিতে ধর্মের জায়গায় আমাকে হিন্দু অথবা আদার্স লিখে যেতে হচ্ছে। অথচ আমি প্রাতিষ্ঠানিক কোনও ধর্মপালন করি না। আমি আপাদমস্তক নাস্তিক এবং না-ধার্মিক।"

শর্মিলা ওই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছেন শিক্ষা দফতরের কমিশনার, দফতরের সচিব, এবং জেলা স্কুল পরিদর্শককে। চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং নিজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক রফিউদ্দিন আহমেদকে। ঘটনাচক্রে রফিউদ্দিন আবার শর্মিলার স্বামী। রফিউদ্দিন বলেন, "উনি ধর্মাচরণ করেন না। আমিও করি না। ওঁর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত।

শিক্ষা দফতরে একই আবেদন আমিও জানাব বলে ভাবছি।''জেলা স্কুল পরিদর্শক প্রদ্যোৎ সরকারের বক্তব্য, ''আমি ওই শিক্ষিকার আবেদনপত্র ই-মেল মারফত পেয়েছি। কিন্তু এই বিষয়টি আমার এক্তিয়ারে পড়ে না। তাই আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। এটি রাজ্য সরকারের বিষয়। যদি কিছু করার থাকে, রাজ্য সরকার বা শিক্ষা দফতর করতে পারে।''

শর্মিলা বলেন, ''বেতন-সহ নানা বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হয়। ফর্ম ছাড়াও শিক্ষা দফতরের পোর্টালেও চাকরি সংক্রান্ত অনেক বিষয় পাঠাতে হয়। সর্বত্রই ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে ধর্মের জায়গাটি পূরণ করতে হয়। অথচ আমি বাড়িতে বা অন্য কোথাও ধর্মাচরণ করি না। ধর্মীয় কোনও রীতিও মানি না। সেই কারণেই আমি ওই দাবির কথা জানিয়েছি দফতরকে।''

নামের পাশে পদবির উল্লেখ নিয়েও তাঁর অবস্থান পরিষ্কার। শর্মিলার সংযোজন: ''কেউ মানুক বা না-মানুক, এটা বাস্তব যে, পদবি দেখে মানুষের ধর্ম চেনা যায়। পদবিকে তাই আমি ধর্মচিহ্ন বলেই মনে করি। এই কারণে আমি মেয়ের নামের পাশে কোনও পদবির উল্লেখ করিনি।'' শর্মিলার মেয়ের নাম 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। স্কুল-সহ সব নথিতে এটাই তার নাম।

খবরটির লিংক- https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/woman-wrote-letter-to-education-department-to-permit-her-to-write-atheist-on-religion-coloumn-1.1193102

তথ্যসহায়তায়: সুমিত্রা পদ্মনাভন (প্রাক্তন সভাপতি, ভারতের মানবতাবাদী সমিতি) সদ্যপ্রয়াত আইনজীবী শ্রী গীতানাথ গাঙ্গুলী এবং নোটারী অফিসার দেবদুলাল সাহা।

অতিরিক্ত সংযোজন:

কিছুসময় আগে একজন বন্ধু জানতে চেয়েছিলেন, কলেজে ফর্ম ফিলাপের সময় এখনো Religion এর জায়গায় আমার অভিভাবকের ধর্ম (Religion) লিখতে হয়েছিল।

আমি একজন উকিল মারফৎ এফিডেফিড করার আবেদন করেছিলাম No Religion, No Cast এর জন্যে। কিন্তু সেই সার্টিফিকেট বাতিল হয়েছে। তাছাড়া, এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত সরকারি কিংবা বে-সরকারি চাকরির ফর্ম বের হয় সেখানে কোথাও Humanity বা Humanism বলে আলাদা কিছুর উল্লেখই থাকেনা। আমার একজন বন্ধু এমনই একটি ফর্মে Humanism লেখায় সেটি বাতিল করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়?

উত্তর - আমি সন্তোষ শর্মা, উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে যোগাযোগ করেছিলাম,কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবীর সাথে। ওনারা জানিয়েছেন- ''ভারতীয় নাগরিকদের জন্যে সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২-৩৫ নং ধারায় ৬ টি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে যার একটি হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। সংবিধানের ২৫ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে, ''প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেক এবং বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোন ধর্মমত গ্রহন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন ও নিজধর্ম প্রচার করতে পারবেন।''

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তে বোম্বে হাইকোর্ট তাদের একটি রায়ে স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্র কাওকে তার ধর্ম জানাতে বাধ্য করতে পারবে না। তিনি কোনও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নন বা কোনও ধর্ম পালন করেন না এই দাবী করার সাংবিধানিক অধিকার আছে প্রত্যেক নাগরিকের। অন্যদিকে, এপ্রিল ২০২১ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর এফ নরিম্যান, বি আর গাভাই এবং ঋষিকেশ রায়কে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছেন, ১৮ বছরের বেশি বয়সী যে কোনো ভারতীয় নাগরিক তার ইচ্ছামতো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন কারন সংবিধানে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে।''

তাই জন্মসূত্রে পাওয়া Religion চিহ্ন ছেড়ে যেকেউ নোটারী পাবলিক ও ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এফিডেফিট করিয়ে No Religion বা HUMANISM সার্টিফিকেট বানাতে পারেন। তামিলনাড়ুর বাসিন্দা স্নেহা পার্থিবরাজ ভারতের প্রথম সেই মহিলা যিনি এমন সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। তাছাড়া ২০১৯ সালে হরিয়ানার বাসিন্দা রবি কুমার, No Casts, No, Religion, No God সার্টিফিকেট পেয়েছে যাতে সরকারি সীলমোহরও রয়েছে। কোনো নাগরিক সরকারি অথবা বে-সরকারি কোনোরকম ফর্মের Religion কলামে HUMANISM, ATHEISM অথবা No Religion ইত্যাদি লিখলে সেই ফর্ম বাতিল করা বে-আইনি। প্রয়োজনে আবেদনকারী এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতের দারস্থও হতে পারেন নির্দিধায়।

‘চেতনার অন্বেষণে’ পত্রিকার জন্য লেখা পাঠান yuktibadira@gmail.com এ। যুক্তির পথে আমরা।